মাঘ—১৩৬৭

সম্পাদক

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ,

কলিকাতা-

মূল্য—এক টাকা

সহঃ সম্পাদক——শ্রীকল্যাণ রায়

শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতাস্থিত, ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।
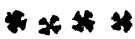
BHRINGOL
MAHA BHRINGARAJ OIL
মস্তিষ্ক শীতল রাখে ও
সুনিদ্রার সহায়তা করে
ভৃঙ্গল শুধু যে কেশের পক্ষেই বিশেষ উপকারী তাহা নহে,
ইহা মস্তিষ্ক সুস্থ ও শীতল রাখে এবং সুনিদ্রার সহায়তা করে।
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

॥ এই সংখ্যায় ॥

মিডিয়াম সেকসান মিল রুল ভাঙাবার চুল্লী এবং মিল পরিবহন টেবল

দুর্গাপুর ষ্টীল কারখানায় নির্মাণ কাজ ও উৎপাদন

একই সাথে চলছে

ইস্কন-এর মিডিয়াম সেক্‌সন এবং মারচেন্ট মিল প্ল্যান্টের শেষ পর্যায়—এখন দ্রুত সমাপ্তির পথে। গত বছরের গোড়ার দিকে ইস্কনকে তিনটি মিল নির্মাণের ভার দেওয়া হয়েছিল এবং সে তিনটি এখন উৎপাদনের কাজে লেগে গেছে। আরও দুটো নতুন মিল দুর্গাপুরের উৎপাদন শক্তিকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ওয়ার্কস কন্‌স্ট্রাকসন কোঃ লিমিটেড

ডেভি এ্যাণ্ড ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড। হেড রাইটসন এ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। সাইমন কারভস লিমিটেড। দি ওয়েলম্যান স্মীথ ওয়েন ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন লিমিটেড। দি সিমেন্টেশন কোম্পানী লিমিটেড। এ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিকাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (রাগবী) লিমিটেড। দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানী লিমিটেড। দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী লিমিটেড। এ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিকাল ইণ্ডাস্ট্রিজ (ম্যানচেষ্টার) লিমিটেড। স্যার উইলিয়াম এ্যারল এ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড। ক্লীভল্যাণ্ড ব্রীজ এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড। ডরম্যান লঙ (ব্রীজ এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) লিমিটেড। জোসেফ পার্কস এ্যাণ্ড সন লিমিটেড। ব্রিটিশ কেব্‌লস গ্রুপ (সিমেন্স এডিসন সোয়ান লিমিটেড এবং পিরেলি জেনারেল কেব্‌ল ওয়ার্কস লিমিটেড)।

ব্রিটেনের এই কোম্পানীগুলি ভারতে কাজ করছেন

PMC 31

এই সংখ্যায়

এবারের প্রচ্ছদপট শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসুর একখানি বিখ্যাত ছবি-

আসুন ... বসন্ত মেলায়
বসন্তের পথে শুরু
পায়ে হাওয়া খেলিয়ে চলা।
শীতকালে যেমন আঁটসাট,
এখন তা আর সইবে না। এখন আরাম
খোলামেলায়। চলাফেরায়
যেমন চপ্পল। বাটার চপ্পলের
বৈশিষ্ট্য অনেক।
নকশায় অসীম বৈচিত্র্য, তেমনি
মনোহর বিবিধ উপাদানে।
প্রসিদ্ধ সুঠাম গঠনে।
Bata
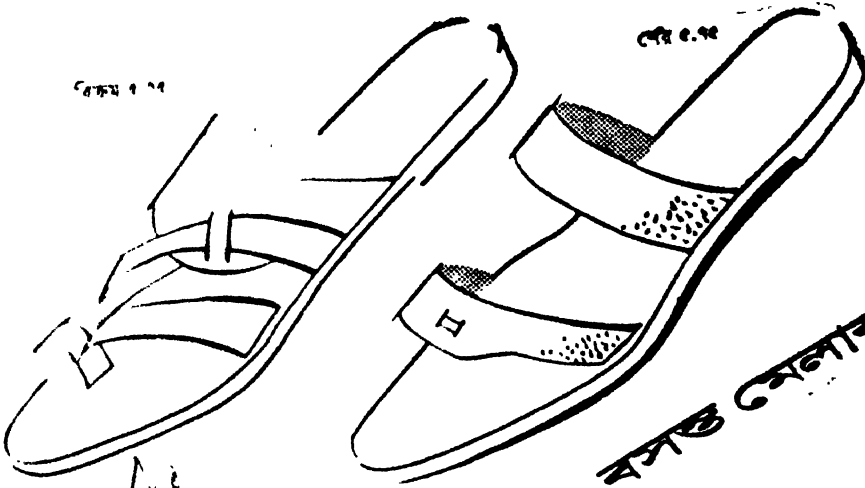
একটু সানলাইটেই
অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেনা
SUNLIGHT
SOAP
SUNLIGHT
SOAP
না দেখলে বিশ্বাসই হতনা : শঙ্কর সীতার পরিষ্কার করা ধবধবে সাদা সার্টটা দেখে দারুণ খুসী। আর শুধু কি একটা সার্ট দেখুন না জামাকাপড়, বিছানার, চাদর আর তোয়ালের স্তূপ—সবই কিরকম সাদা ও উজ্জ্বল এসবই কাচা হয়েছে অল্প একটু সানলাইটে! সানলাইটের কার্যকরী ও অফুরন্ত ফেণা কাপড়কে পরিপাটী করে পরিষ্কার এবং কোথাও এক কুচিও ময়লা থাকতে পারেনা! আপনি নিজেই পরীক্ষা করে দেখুনা না কেন...আজই!
সানলাইটে জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড কর্তৃক
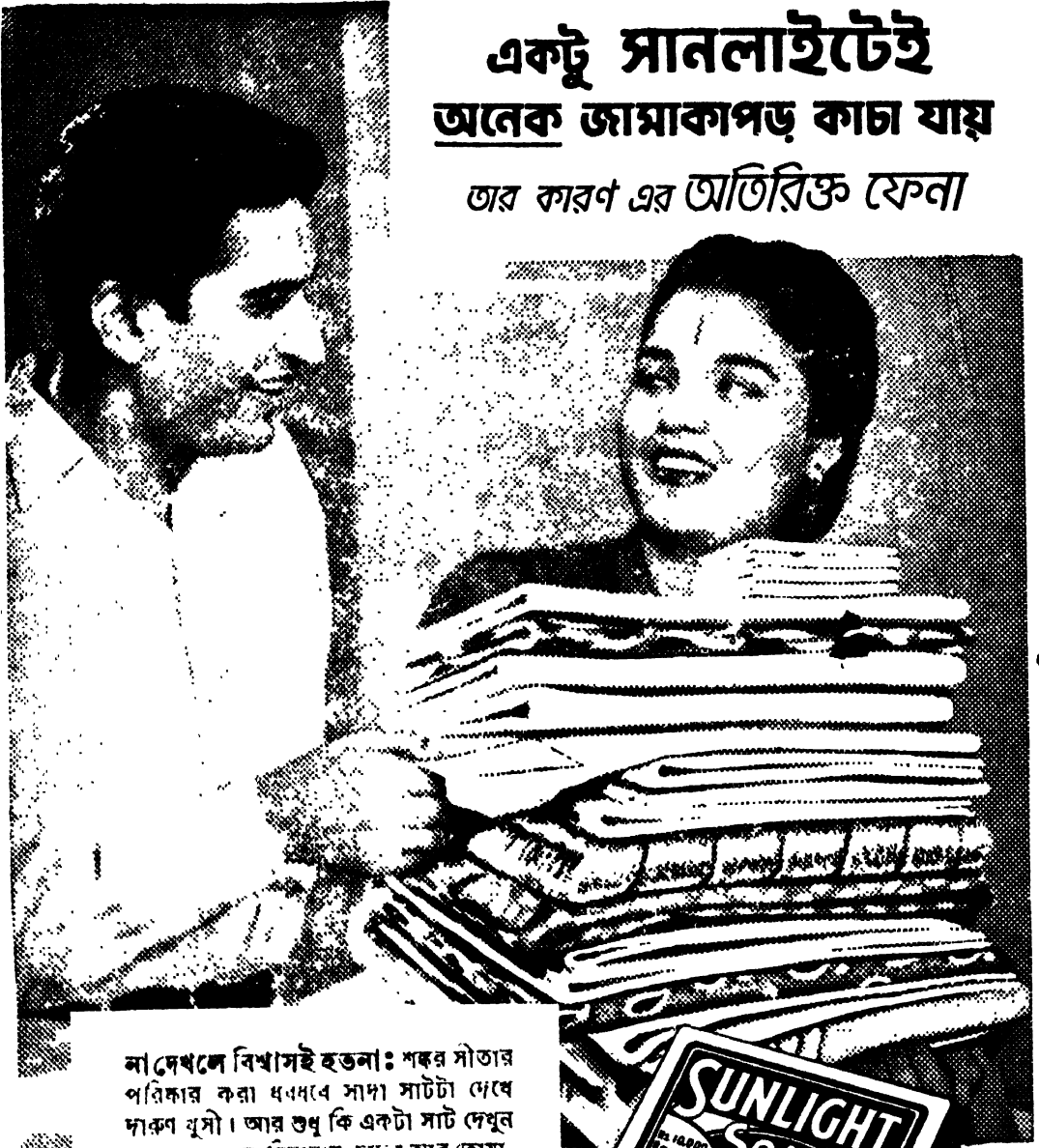
যাহা চাওয়া যায়
তাহা পাওয়া যায়না
ধন-ঐশ্বর্য্য
কিন্তু
আপনি ইচ্ছামত একটী সর্বাঙ্গ সম্পন্ন কেশতৈল অনায়াসে পাইতে পারেন। আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত 'হিমকল্যাণ'ই আপনার কেশতৈল নির্বাচন-সমস্যা সমাধানে সক্ষম। ইহার কল্যাণ স্পর্শে যাবতীয় কেশরোগ নিবারণ ও মস্তিষ্ক শীতল হয়। দীর্ঘদিন নিয়মিত ব্যবহারেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়।
কবিরাজ নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
আয়ুর্বেদীয় হিমস্নিগ্ধ সুরভিত কেশতৈল।
অন্যান্য প্রসাধনী
পামিকোকো
সুরভিত নারিকেল তৈল
হিমকল্যাণ
ক্যাষ্টর অয়েল
সুরভিত কেশতৈল
ভৃঙ্গামলা মহোপকারী কেশতৈল
সোহাগ সুরভি নির্য্যাস
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস, লিঃ
কলিকাতা

ষোড়শ বর্ষ

অষ্টম সংখ্যা

গল্প-ভারতী

মাঘ

১৩৬৭

//সম্পাদকীয়//

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প-ভারতীর সঙ্গে উপেনদার স্মৃতি চিরদিন জড়িত থাকবে। তাঁকে এক বছর হল (৩০শে জানুয়ারী ১৯৬০) আমরা হারিয়েছি। কিন্তু বন্ধুবর শ্রীসত্যেন্দ্রলালের সঙ্গে আমরা ভূতপূর্ব সম্পাদক ও আমাদের একান্ত প্রিয় উপেনদাকে সর্বদা স্মরণ করি। গল্প-ভারতীর সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ একান্ত ও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর মহাপ্রয়াণ দিবসে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মাহুতি

এবার ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে গিয়ে মনে পড়ল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ১৯৪০ সালে এই আম্রকুঞ্জে গান্ধীজী ও কস্তুরবাঈকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন। দুজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষ ছবিখানি শতাব্দী উৎসবে দেখাবার মত। ১৯১৫ সালের বসন্তে তাঁরা ছাত্র, ছাত্রী ও বৃহৎ পরিবার নিয়ে গুরুদেবের আশ্রমে আশ্রয় নেন সেকথা গান্ধীজী সর্বদা স্মরণ করতেন এবং প্রাণস্পর্শী ভাষায় Golden Book of Tagore গ্রন্থের উদ্বোধনী লিপিতে সে কথা উল্লেখ করেন। বিশ্বভারতীর অর্থসঙ্কট যে গান্ধীশিষ্য পণ্ডিত নেহেরু সক্রিয়ভাবে দূর করার জন্য চেষ্টা করছেন তার মূলেও গুরুদেবের প্রতি গান্ধীজীর নিষ্ঠা।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে।
একলা চল একলা চল একলা চলরে।"

গান্ধীজীর অতিপ্রিয় এই রবীন্দ্র সঙ্গীত যেন বাঙলা থেকে গুজরাট পর্যন্ত সর্বত্র ছেলেমেয়েদের শেখান হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের ৯৯ তম জন্মদিবস

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লিখে দেখিয়েছি তিনি একদিকে রবীন্দ্রনাথের আজীবন সমজদার ও নরেন্দ্রদত্ত (বিবেকানন্দের) সহপাঠী। তখন হেদুয়া পুকুরের ধারে ছিল Duff সাহেবের গির্জা (যেখানে নির্ভীক রামমোহন Bible ক্লাশ খুলতে উৎসাহ দেন (১৮৩০) এবং General Assembly কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়।

এই কলেজের অধ্যাপক দার্শনিক Dr. Hastic তাঁর মনীষী ছাত্র নরেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রকে সমাধির তাৎপর্য বোঝাতে প্রথম সন্ধান দেন দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণদেবের। ১৮৮০-১৮৮৪ এই চার বছর দুটি বন্ধু ওখানে পড়েন। নরেন্দ্র ১৮৬৩ ও ব্রজেন্দ্র ১৮৬৪ সালে জন্মান অর্থাৎ কলেজে B. A. পরীক্ষা শেষ করেন—একজন ২১ আর অন্যজন ২০ বছর বয়সে। তখনই তাঁরা কি উদার চিন্তাধারা ও পাঠক্রম গড়েছেন তার সন্ধান এখনও সুরু হয়নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের পরই এঁদের শতাব্দী উৎসবও আমাদেরই করতে হবে।

১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসভা (কংগ্রেসের) জন্ম ও ১৮৮৬ সালে (কেশব সেনের মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তিরোভাব।

১৮৯৩ সালে যখন স্বামী বিবেকানন্দরূপে নরেন্দ্রনাথ দত্ত শিকাগো পার্লামেণ্ট অফ রিলিজিয়ান্স ধর্মমহাসম্মেলনে ভারতের চিরন্তন বাণী—অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করেছেন তখন তাঁর সতীর্থ অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিরাট পাশ্চাত্য দর্শন শেষ করে ভারতীয় দর্শন মূল সংস্কৃতাদি ভাষা পাঠ সুরু করেন। পরবর্ত্তীকালে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তুলনামূলক দর্শনের (Comparative Philosophy) প্রবর্তক হয়ে ওঠেন। ১৮৯৯ সালে যখন বিবেকানন্দ শেষ বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন—তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা। কুচবিহার রাজের আনুকূল্যে বিবেকানন্দ রোমে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনে 'বৈষ্ণব ও খৃষ্ট ধর্মের' তুলনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করে সবাইকে চমৎকৃত করেন। এই সময় রোম, প্যারিস ও ফ্লোরেন্স নগরী দেখে ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যে গভীর ও তথ্যপূর্ণ আলোচনার খসড়া Dawn পত্রিকায় ছাপেন ডাঃ শীলের সেই বিস্মৃতপ্রায় অথচ বহুমূল্য রচনা আমার Greater India গ্রন্থে ছেপেছি।

দীর্ঘ তিন বৎসর আমেরিকা ও ইউরোপে বেদান্ত তথা ভারত সংস্কৃতি প্রচারের পর স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাইদের আনন্দ ও উৎসাহে জন্মস্থান কলকাতায় ফিরে আসেন। সেই সময় হেদুয়ার কাছে তাঁর পৈত্রিক বাসভূমিতে তাঁর দুই ভ্রাতা মহেন্দ্র ও ভূপেন্দ্র দত্ত বাস করছেন। তিনি যেমন তাঁদের বিলাত ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন সেই রকম দক্ষিণেশ্বরে গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে "মিশন" কেন্দ্র গড়ে তোলেন। ১৮৯৭ সালে বেলুড়ে যে বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের পত্তন করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বামীজী মাত্র ৩৯ বছরেই নরদেহ ত্যাগ করে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই অমরধামে গমন করেন। শেষবার বিশ্বভ্রমণের পর যখন বাঙ্গালী যুব দল ভক্তিভরে তাঁর গাড়ীর ঘোড়া খুলে রিপণ কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভবনে বিবেকানন্দ সম্বর্দ্ধনা করেন, সেই ঘটনার সাক্ষ্য দেবার মত দু'চার জন এখনও জীবিত আছেন। শ্রদ্ধেয় সাংবাদিকপ্রবর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁদের অন্যতম। শ্রীকুমুদবন্ধু সেন তথা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের কাশীপুরে ও বিবেকানন্দের বেলুড়ে দেহত্যাগের কথা আমরা শুনেছি—তাই মহেন্দ্র গুপ্তের "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" ও সারদানন্দের "লীলা প্রসঙ্গ" থেকে সুরু করে, ভগ্নী নিবেদিতার গ্রন্থ "My Master As I saw Him" গ্রন্থাদির ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিক টীকাভাষ্য বর্ণনায় যুবদলকে অগ্রণী হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাত্র ৫০।৬০ বছর আগে এই বাংলাদেশে বিবেকানন্দের আবির্ভাব হয়েছিল, সেজন্য আমরা ধন্য। অদ্বৈতাশ্রম প্রকাশিত Collected Works ছাড়া আরও অনুসন্ধান ও আবিষ্কার আছে তার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন শিষ্যা Sistar Christine (ভগ্নী নিবেদিতার সহকর্মিনী) ও শ্রীমতী বার্ক (যিনি অখ্যাত মার্কিন কাগজপত্র ঘেঁটে এক বিরাট গ্রন্থ লিখে আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন)। প্রামাণ্য

তথ্যসহ সেই অধ্যাত্মসম্পদ মণ্ডিত ইতিহাস ও গল্প কেউ পাঠালে আমরা গল্প ভারতীতে তা ছাপাতে চেষ্টা করব। সাহিত্যিক বিবেকানন্দ, দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ, ১৮৯২-১৯০২ এই শেষ দশ বছরের বিবরণ সংগ্রহ করে পূর্ব ও পশ্চিমের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ বহু পরিশ্রমে বিবেকানন্দ রচনাবলী প্রকাশ করিয়েছেন কিন্তু এখনও (বাংলায় অনূদিত হয়নি এমন বহু জ্ঞাতব্য তথ্য) বহু রচনা অপ্রকাশিত আছে। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ অর্থাৎ নিবেদিতার জন্ম শতাব্দী কাল পর্যন্ত এক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আভাষ দিয়ে সাধারণ নরনারীদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এ বিষয়ে পূর্বে কিছু লিখেছি। আজ গল্প-ভারতীর মাধ্যমে একান্ত অনুরোধ জানালাম।

নেতাজী সুভাষ স্মরণে—

সুভাষচন্দ্রের কন্যা কল্যাণীয়া অনীতা শুধু মুখশ্রীতে নয় অন্তরের দীপ্তিতে তার পিতৃভূমি এই বাঙলার মেয়ে হয়ে গেছে। শুধু সভাসমিতিতে নয় ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে মেলার ভিড়ে তাকে বাঙালী মেয়ের মত লুটোপুটি করতে দেখেছি। আবার গড়িয়া গ্রামে সাধারণের মধ্যেও তাকে সহজভাবেই মিশতে দেখলাম। কটকে সুভাষ যে গৃহে জন্মান—সেখানে গিয়েও অনীতা পিতাকে স্মরণ করেছে; তাকে দেশবাসীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশাকরি সরকারী সহযোগিতায় অনীতা ইম্ফল থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত স্মরণীয় ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করতে পারবে।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নেতাজীর জীবনী এখনো লেখা হয়নি, কিন্তু সে অসমাপ্ত কাজ বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদেরই শেষ করতে হবে। ১৯৪২'এর বিপ্লবে ও ভারত-ছাড় (Quit India) আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মাজী ও দেশের প্রায় সব নেতারাই বন্দী হলেন। সেই সময় বীর সুভাষচন্দ্র কি ভাবে তার মধ্যে আফগান ও রুশদেশ পেরিয়ে জার্মানী পৌঁছলেন Axis সাবমেরিনে চেপে ইতালীয় বন্ধুদের সাহায্যে মালয়ে নামলেন—আজাদ হিন্দ ফৌজ সেখানে গঠন করলেন—এ সবই যেন রূপকথার মত শোনায়। যুদ্ধের পরে জাপানে গিয়ে নেতাজীর বিষয়ে দেখাশোনা করেছি ও ফেরার পথে ইন্দোনেশিয়া ও মালয় প্রবাসী বহু ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে (১৯৪২-৪৫ সালে) নেতাজীর অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও নেতৃত্বের প্রত্যক্ষদর্শী।

বাংলার কৃতী ছাত্র তিনি, I. C. S. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রেরণায়—চাকুরী পরিত্যাগ করে দেশসেবার মহানব্রত গ্রহণ করেন। বহুবার কারাবরণের ফলে সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হলেও সুভাষচন্দ্র অবিচলিত নিষ্ঠা ও অনন্যসাধারণ কর্মশক্তির সাহায্যে দেশের স্বাধীনতার সাধনা করে গেছেন—দু'দুবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে নিখিল ভারতীয় সম্মান লাভ করেছেন। পরিশেষে কংগ্রেসকর্মীদের প্রতিকূলতা ও ইংরেজের কোপদৃষ্টি এড়িয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে যে সব অসাধ্যসাধন তিনি করেছেন সেজন্য তিনিই একমাত্র নেতাজী নামে বন্দিত হয়েছেন; সে শুধু বাঙালীর নয় ভারতেরই গৌরব। সবার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর শুভ জন্মদিনে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম বিশেষ করে কাশ্মীর ও হিমালয় সীমান্ত যখন বিপন্ন তখন তাঁর কথা বিশেষভাবে মনে হয়।

তাই স্বাভাবিকভাবেই ইচ্ছা করি যে এই সঙ্কট মুহূর্তে নেতাজীর আদর্শে তরুণ দল এক বিরাট দেশরক্ষা পরিষদ—Netaji Academy গড়ে তুলুক।

সত্যজিৎ

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

প্রতি বছর নভেম্বর মাসে একটি ঘোষণার জন্যে সারা বিশ্বের বিদগ্ধসমাজ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকেন। সেই বিশেষ ঘোষণাটি হচ্ছে, সাহিত্য বিজ্ঞান ও শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শান্তি কার্যে অনন্যসাধারণ অবদানের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কাররূপে নোবেল পুরস্কার সমগ্র বিশ্বে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১০ই ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কারের জনক আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের তিরোভাব দিবসে এই পুরস্কার বিতরণ করা হয় সুইডেনের রাজধানী স্টকহোলমের কনসার্ট হল-এ।

ডিনামাইট আবিষ্কারক আলফ্রেড নোবেল তাঁর ব্যবসায়সঞ্চিত প্রভূত সম্পত্তি উইল করে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে দান করে যান। এই সম্পত্তির সুদ থেকে প্রতি বছর সাহিত্য, পদার্থ বিদ্যা রসায়ন-বিদ্যা, শারীর ও ভেষজ বিদ্যা এবং শান্তির জন্যে পাঁচটি পুরস্কার দেওয়া হয়। পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানে পুরস্কার ঘোষণার অধিকার আছে ষ্টকহোলমের রয়াল অ্যাকাদেমি অফ সায়েন্স-এর এবং সাহিত্যে সুইডেনের অ্যাকাদেমি অফ লেটার্স-এর, শরীর ও ভেষজ বিজ্ঞানে ষ্টকহোলমের ক্যারোলিন্‌কা ইন্‌ষ্টিটিউট-এর এবং শান্তির পুরস্কার ঘোষণার অধিকার নরওয়ে পার্লামেন্টের একটি কমিটির। জাতিধর্মনির্বিশেষে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর পাঁচটি বিষয়ে এই পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য শান্তির পুরস্কার কোন কোন বছর দেওয়া হয় না (যেমন এই বছর শান্তির জন্যে কাউকে পুরস্কার দেওয়া হয় নি)। বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অনেক ক্ষেত্রেই একাধিক বিজ্ঞানীকে যুক্তভাবে দেওয়া হয়, তবে কোন ক্ষেত্রেই তিনজনের বেশী লোকের মধ্যে এই পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হয় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা অনুসন্ধানের সাফল্য একক প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে একাধিক বিজ্ঞানীর যৌথ প্রচেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া, বিভিন্ন গবেষণাগারে একাধিক বিজ্ঞানী যে গবেষণায় ব্যাপৃত তার মধ্যে অনেক সময় একটা সহধর্মিতা ও পরস্পর নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিবেচনায় বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার অনেক সময় যৌথভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। এ বছরও (১৯৬০) শরীর ও ভেষজ বিজ্ঞানের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যুক্তভাবে দুজন বিজ্ঞানীকে।

বিজ্ঞানে যে দেশের লোক যতবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে সেই দেশ বিজ্ঞান গবেষণায় তত উন্নত বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। নোবেল পুরস্কারের তালিকায় জার্মানী এবং বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। এশিয়ার মাত্র চারজন বিজ্ঞানী এই দুর্লভ পুরস্কারলাভ করেছেন—ভারতের অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন, জাপানের অধ্যাপক হিদেকী য়ুকাওয়া এবং চীনের ডঃ সুং দাও লী ও চেন নিং ইয়াং (যদিও তাঁরা মার্কিন প্রবাসী তবু আমরা তাঁদের জাপানী ও চীনা পদার্থবিদ বলেই জানি)।

নোবেল পুরস্কারের ইতিহাসে মাদাম কুরীর নাম অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করে আছে। কারণ শুধু তিনি এবং তাঁর স্বামী পিয়েব কুরী এই পুরস্কার লাভ করেন নি, তাঁর কন্যা আইরিন জোলিও কুরী এবং জামাতা ফ্রেডারিক জোলিও কুরীও এই পুরস্কার লাভ করেন। বংশপরম্পরায় নোবেল পুরস্কার লাভের এমন নজীর আজ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার আর স্থাপিত হয় নি।

এবারের নোবেল পুরস্কার

এবার (১৯৬০) পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে শাখার ৩৪ বছর বয়স্ক তরুণ গবেষক ডক্টর ডোনাল্ড এ গ্ল্যাসারকে। পরমাণুর সক্রিয়রূপ পরিলক্ষণের অভিনব যন্ত্র 'বাবল্ চেম্বার' উদ্ভাবনের জন্যে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেছেন।

বাবল্ চেম্বার-এর সম্মুখে ডঃ গ্ল্যাসার

বাবল্ চেম্বার সংক্রান্ত এই গবেষণা ডঃ গ্ল্যাসার ১০ বছর আগে ৫ ডলার মূল্যের যন্ত্রপাতি আর ৬ বোতল বীয়ার নিয়ে শুরু করেছিলেন। বীয়ার বোতলের ছিপি খোলামাত্র বোতলের মুখ ফেনায় ভরে যায়। এটা লক্ষ্য করে তাঁর ধারণা হয় আবহাওয়ার কোন পদার্থের কণাসমূহের সংযোগে অথবা বোতলেই কোন তাপের জন্যে এই ফেনার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এরপর তিনি বীয়ার ও তরল হাইড্রোজেন সহ অন্যান্য বহু তরল পদার্থের পরমাণু ভাঙার কাজে ব্রতী হন। মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেনিক্স প্রোজেক্ট থেকে তাঁকে এজন্যে দেড় হাজার ডলার দিয়ে সাহায্য করা হয় এবং তিনি এই অর্থের সাহায্যে বাবল্ চেম্বার গঠন করেন।

এই বাবল্ চেম্বারের সাহায্যে ডঃ গ্ল্যাসার পরমাণুর কেন্দ্রীন 'নিউক্লিয়াস'-এর স্বরূপ এবং পরমাণুর অপরাংশ ইলেকট্রনের সঙ্গে কেন্দ্রীন পদার্থকে যে শক্তি ধরে রাখে তার সন্ধান দেন। তিনি এ সম্পর্কে আলোকচিত্রও গ্রহণ করেন (ইলেকট্রন সাধারণত দৃষ্টিগোচর নয়)। এর ফলে বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রনের স্বরূপ সম্পর্কেও পর্যালোচনার আর একটি নতুন পথের সন্ধান পেয়েছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নসহ পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্রসমূহে এই বাবল চেম্বার সংক্রান্ত গবেষণায় বছরে তিন কোটি ডলারেরও অধিক ব্যয় করা হয়ে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ২৫টি প্রতিষ্ঠানে বাবল্ চেম্বারের সাহায্যে গবেষণা হচ্ছে।

ডোনাল্ড গ্ল্যাসার ১৯২৬ সালে ক্লিভল্যাণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মা বাবা দুজনেই জাতিতে রুশ। ১৯৪৬ সালে তিনি ক্লিভল্যাণ্ডের কেস ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে স্নাতক হন এবং ১৯৫০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন। প্রায় ১০ বছর তিনি

মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। বর্তমান বছরে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বিভাগের বার্কলে শাখায় যোগদান করেছেন।

এ বছর রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লস এঞ্জেলস্ শাখার অধ্যাপক ডক্টর উইলার্ড এফ লিবীকে। 'অ্যাটমিক টাইম ক্লক' যন্ত্রের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাণ নিরূপণ করে প্রত্নতাত্ত্বিক পদার্থসমূহের বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত অভিনব কার্যের জন্যে ডঃ লিবী এই পুরস্কার অর্জন করেছেন।

ডঃ উইলার্ড লিবী

'অ্যাটমিক টাইম ক্লক" যন্ত্রে কার্বন-১৪ নামে মৌলিক পদার্থের তেজস্ক্রিয় পরমাণুর সাহায্যে ৩০ হাজার বছরেরও পুরাতন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের সঠিক সন তারিখ নির্ধারণ করা যায়। জীবন্ত প্রাণী, মানুষ ও উদ্ভিদেরা মহাশূন্য থেকে আগত কার্বন-১৪ কার্বন ডাই-অক্সাইড হিসাবে গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু মৃত্যুর পর আর সেটা গ্রহণ করতে পারে না। তখন এই কার্বন নষ্ট হয়ে যায়। প্রতি গ্র্যাম কার্বন প্রতি মিনিটে কি হারে নষ্ট হয়ে থাকে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপণ করে ডঃ লিবী ফসিল ও অন্যান্য জিনিসের বয়স নির্ধারণ করেছেন।

কার্বন-১৪ কেবলমাত্র প্রত্নতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও ভূগোলের ক্ষেত্রেই বহু নতুন তথ্যের সন্ধান দেয় নি, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বহু নতুন তথ্যের সন্ধান দিয়েছে।

ডঃ লিবী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩১ সালে স্নাতক উপাধি এবং ১৯৩৩ সালে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি ওখানেই অধ্যাপনা করেন এবং তারপর পরমাণু শক্তি কমিশনের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে ওই পদে ইস্তাফা দিয়ে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ডঃ লিবী পরমাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন আইসোটোপ ট্রিটিয়ামের আবিষ্কর্তা তিনি।

শরীর ও ভেষজবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার এবার যৌথভাবে দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ ভেষজ গবেষণা বিজ্ঞানী অধ্যাপক পিটার ব্রায়ান মেডাওয়ার এবং অস্ট্রেলিয়ার সার ফ্রাঙ্ক ম্যাকফারলেন বার্নেট-কে। চর্ম ও অন্যান্য টিস্যুর গ্রাফটিং সংক্রান্ত সমস্যাবলী সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সহনশীলতা সম্পর্কে গবেষণাকার্যের জন্যে তাঁরা এই পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁদের আবিষ্কার পরীক্ষামূলক জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সূচনা করেছে।

৪৫ বছর বয়স্ক অধ্যাপক মেডাওয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধ বিজ্ঞানে একজন বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাত। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রাণিবিদ্যা ও তুলনামূলক শরীরতত্ত্বের প্রধান অধ্যাপক। এই বছর তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর অধিকর্তা নিযুক্ত হয়েছেন। ৩৪ বছর বয়সে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন, তিনিই রয়েল সোসাইটির কনিষ্ঠতম ফেলো। মার্লবরো কলেজে ও অক্সফোর্ডের ম্যাগডালেন কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন।

ডঃ বার্নেট বর্তমানে মেলবোর্ন-এর ওয়াল্টার অ্যাণ্ড এলিজা হল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল রিসার্চ-এর অধিকর্তা।

'শান্তির জন্যে পরমাণু' পুরস্কার

বর্তমান বছরের (১৯৬১) 'শান্তির জন্যে পরমাণু' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে প্রখ্যাত ব্রিটিশ পরমাণু বিজ্ঞানী সার জন ককক্রফটকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিশ্রুত ব্যবসায়ী হেনরী ফোর্ডের স্মৃতিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। শান্তিপূর্ণ কাজে পরমাণু শক্তি ব্যবহার-কল্পে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার জন্যে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের আবেদনে হেনরী ফোর্ডের পুত্র এডসেন এই পুরস্কার প্রবর্তন করেন।

সার জন ককক্রফট্

পরমাণু শক্তিকে মানুষের শান্তিপূর্ণ কাজে প্রয়োগের প্রথম প্রচেষ্টাকাল থেকেই সার ককক্রফট্ এই বিষয়ে ব্যাপৃত রয়েছেন এবং মূলত তাঁরই চেষ্টায় ইংলণ্ডে পরমাণু শক্তি থেকে ব্যাপক ভাবে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গবেষণা ও চিকিৎসা কাজে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বিতরণে এবং জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান সংস্কৃতি সংস্থার উদ্যোগে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন সংগঠনে সার ককক্রফট্ অগ্রণী ছিলেন।

সার জন ককক্রফটকে ১৯৫১ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গৃহনির্মাণে সাহায্যের জন্য আবেদন—

বিজ্ঞান-অনুশীলনের ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করে মানুষ আজ সভ্যতার সু-উন্নত সোপানে আরোহণ করেছে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া কোন দেশেরই বৈষয়িক উন্নতি বা জাতীয় অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা তেমন ভাবে প্রসার লাভ করেনি। দেশের জনসাধারণের এই বিজ্ঞানবিমুখতা দূর করে জনচিত্তে বিজ্ঞানের প্রতি একটা সহজ অনুরাগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গত ১৯৪৮ সালে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে ও প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৩ বছর যাবৎ এই উদ্দেশ্য ও আদর্শ সাধনের জন্য পরিষদ নানা কর্মপ্রয়াস করে আসছে। কিন্তু পরিষদের নিজস্ব গৃহ না থাকায় কর্মপ্রচেষ্টা বিশেষভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ কারণে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাছ থেকে গোয়াবাগানে এক খণ্ড জমি কিনে গৃহ নির্মাণের চেষ্টা হচ্ছে। এই জমি ও গৃহ-নির্মাণের জন্যে অবিলম্বে কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অধ্যাপক বসু এজন্যে দেশের জনসাধারণ শিল্পপতিগণ ও সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। পরিষদের এই তহবিলে প্রদত্ত দান সরকারী নির্দেশে আয়করমুক্ত বলে গণ্য হবে। যে কোন প্রকার দান নিম্নের ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হবে—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯।

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

সব ধর্মই সত্য অতএব বিদ্বেষ ভাল নয়। আন্তরিক হলে সকল ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তেরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে, আবার মুসলমান খ্রীষ্টানরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে।

বৈষ্ণব বলে—আমাদের কৃষ্ণকে না ভজলে কিছু হবে না, শাক্তরা বলে—আমাদের ভগবতী একমাত্র উদ্ধারকর্তা—তাঁকে না ভজলে কিছুই হবে না। খ্রীষ্টানরা বলে—আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম না মানলে কিছুই হবে না। এসব মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্মই ঠিক, আমি যা বলছি তাই সত্য, আর সকলের মত মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ।

*　　　　*　　　　*

সকল ধর্মাবলম্বীই এক ঈশ্বরেরই উপাসনা করছে, কেউ তাঁকে ডাকছে—ঈশ্বর জগৎপিতা বলে, কেউ রাম বলে, কেউ কৃষ্ণ বা হরিনাম বলে, কেউ বা আল্লা বলে, কেউ মা-কালী, শিব, দুর্গা ইত্যাদি নামে। নাম ভিন্ন; কিন্তু ঈশ্বর এক।

*　　　　*　　　　*

ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জীব জগৎ, ঘর বাড়ী দ্বার, ছেলে পিলে—এসব বাজীকরের ভেল্কী। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ ভেল্কী, লাগ! ঢাকা খুলে দেখ, কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল। কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য, এই আছে, এই নাই।

*　　　　*　　　　*

বাজীকর আর বাজীকরের খেলা। বাজীকরই সত্য। তাঁর খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত। যখন চণ্ডী শুনতাম, তখন ঐটি বোধ হয়েছিল। এই শুম্ভ, নিশুম্ভের জন্ম হল। আবার কিছুক্ষণ পরে শুনলাম, বিনাশ হয়ে গেল।

কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী আছেন কাছে। এমন সময় একটা ভারী শব্দ হল।
নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর এ কিসের শব্দ?
শিব বললেন, রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই এ শব্দ।
খানিক পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হল।
নন্দী জিজ্ঞেস করলে, ঠাকুর, এবার কিসের শব্দ?
শিব হেসে বললেন, এবার রাবণ বধ হল।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

মালা যেখানে গেছে সেখান থেকে শুধু হাতে ফিরে আসার জন্যে যায়নি। গেছে মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী আনতে। মাসীমা এ কথা জানতেন না। তাই দিন কয়েক যেতে না যেতেই অধীর হলেন। বলতে লাগলেন, "ওর ফিরতে অত দেরী হচ্ছে কেন? আমি তো ভেবেছিলুম যাবে আর আসবে। দেখবার কী আছে ওই বাঙাল দেশের অজ পাড়াগাঁয়ে? নোয়াখালী যে কোথায় তাই আমি জানিনে।"

আমিও কি জানি! ঢাকার কাছাকাছি কোথাও হবে। বোধহয় আসামের দিকে। পাহাড় আছে নিশ্চয়। নইলে মালা কেন যায় মায়াপাহাড়ের খোঁজে? একটু রহস্যময় করে বলি, "দেখবার কিছু আছে বইকি। সাধে কি অত লোক ওখানে ছুটেছে! ভারতের সব অঞ্চল থেকে যাত্রীর ভিড়। যেন রূপকথার রাজপুত্রের মিছিল। রাজপুত্রের ছদ্মবেশে রাজকন্যাও।"

বলতে ভুলে গেছি মনোরমা ও মালা দু'জনেরই পরণে ছিল সালোয়ার কামিজ!

সোমনাথ বলে সেই যে সোনার চাঁদ ছেলেটি সে সত্যি অনেক দিন অপেক্ষা করেছিল। শেষে হতাশ হয়ে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে দেশান্তরী হলো। মাসীমা আক্ষেপ করে বলেন, "এ দুঃখ ভোলবার নয়।"

কেমন করে তাঁকে বলি যে তাঁর কাছে যেটা দুঃখ আমার কাছে সেইটেই সুখ! মালা যদি বিয়ে করত, যদি বিলেত চলে যেত, যদি ও দেশে বসবাস করত আমি তাকে সব রকমে হারাতুম। সোমনাথ এমন কিছু হারায়নি। সে বৌ চেয়েছিল বৌ পেয়েছে। মালার বদলে দীপা কিছু মন্দ মনোনয়ন নয়।

বিয়েতে আমিও যোগ দিয়েছিলাম। দীপাকে আমার ভালোই লেগেছিল। সোমনাথকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছিলুম। তার মাকেও বলেছিলুম, "আপনি কেবল রত্নগর্ভা নন, রত্নশ্বশ্রূ। সোমনাথের সঙ্গে খাসা মানিয়েছে। রতনে রতন চেনে।"

মালা পৌঁছনোর খবর দিয়ে তার করেছিল। চিঠিও লিখেছিল। মাসিমা আমাকে দেখতে দিয়েছিলেন। চিঠিতে ছিল, "মা মণি, তোমার মালা যেখানেই থাকুক তোমার কোলেই আছে। আর তার বাবার চোখের তলেই। আমার জন্যে ভেবো না। আমাকে পরের জন্যে ভাবতে দাও। পরকে যাতে আমি আপন করতে পারি।"

আমাকেও তার মনে ছিল। আশ্চর্য! আমার নামেও একদিন একখানা চিঠি এলো। পড়ে দেখি লিখেছে, "বিচারের সময় পরে। এখন ভালবাসার সময়। ভালোবাসলে নির্বিচারে ভালোবাসতে হবে। পাপীকেও। অপরাধীকেও। রাক্ষসকেও। তা যদি না পারি তবে আমরাই ফেল। যাদের পাপী ভাবছি, অপরাধী ভাবছি, রাক্ষস ভাবছি তারাও তো মানুষ। তাদেরও তো মা বোন আছে। মা বোনের ইজ্জত তাদের কাছেও তো দামী। তাদেরও তো বাপ দাদা আছে। বাপ দাদার প্রাণ তাদের কাছেও তো দামী। তারা স্বভাবদুর্বৃত্ত নয়। সৎ চাষী। সৎ কারিগর, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খায়।

ঈশ্বরকে ভয় করে। মানুষের সঙ্গে রকমারি সম্পর্ক পাতায়। কেন তবে পাগল হলো? এক এক জন এক এক উত্তর দেন। আমি শুনে যাই। সরল কথাটা হলো, মানুষে মানুষে ভেদ নেই। ভেদবুদ্ধিটাই সবচেয়ে দোষের। তার থেকেই যাবতীয় দোষের উৎপত্তি।"

আমার তখন ক্রোধে অন্তরাত্মা জলছে। এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা এসে আমাকে আরো রাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, মুসলমানরা নাকি আমাদের ব্রাদার্স'। তা শুনে আমি ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দিয়েছি, "হুঁ। ব্রাদার্স'-ইন-ল।" তখন খেয়াল হয়নি যে কথাটা দুধারে কাটে। পরে খেয়াল হলে জলে পুড়ে মরি। বিদেশিনী ছবি কিনে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। নইলে বুঝিয়ে বলতুম ব্রাদার্স'-ইন-ল কোন অর্থে।

মালার সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছা ছিল। করতে সাহস হলো না। সে কি এইজন্যেই নোয়াখালী গেছে যে বর্বরকেও, বন্যকেও নির্বিচারে ভালোবাসতে হবে? তা হলে নাটশীদেরও ভালোবাসতে হয়। অসম্ভব। ওর চেয়ে সাপকেও ভালোবাসা সহজ। গান্ধীজীর অহিংসামন্ত্রে কালসাপও বশ মানতে পারে কিন্তু নোয়াখালীর ওইসব নারীধর্ষক! অবিশ্বাস্য। ওদের জন্যে চাই মার্শাল ল। কোর্ট মার্শাল। সরাসরি ফাঁসী।

মালাকে এসব কথা লিখিনে। লিখি, "ভুলে যেয়ো না যে তুমি আনতে গেছ মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী। গান্ধীজীকে ছেড়ে দাও গান্ধীজীর কাজ। তাঁর কাজ তাঁর। তোমার কাজ তোমার।"

আমার মুসলমান সুহৃদদের সঙ্গে আমার ব্যবধান প্রতিদিন বেড়ে চলেছিল। তখন খেয়াল হয়নি যে ব্যবধান যদি বাড়তে বাড়তে অলঙ্ঘনীয় হয় তবে পায়ের তলার মাটি ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যায়, মাঝখানে দেখা দেয় ভাদ্রমাসের পদ্মা। পনেরোই আগষ্ট এলো। আমার শিল্পীবন্ধুদের একদলকে বসিয়ে দিল, কলকাতায়, একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঢাকায়। তার পর থেকে অবিরল চোখের জল ফেলছি। কিন্তু সে কথা পরে। ডিসেম্বর মাসে কে জানত আগষ্ট মাসে কী আসছে!

মালা সেই যে আমাকে চিঠি লিখল তার পর একেবারে নীরব। বোধ হয় আমার চিঠির সুর তার ভালো লাগেনি।

প্যারিসে গিয়ে আধুনিকতম চিত্রকরদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নেবার জন্যে আমার প্রাণ কবে থেকে আকুল। যাইনি, তার কারণ প্রধানতঃ মালাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কর্তব্যবোধ। আরো কারণ ছিল। আমি একান্তভাবে চেষ্টা করছিলুম আমার ভারতীয় পূর্বসূরীদের সঙ্গেও পা মিলিয়ে নিতে। এ এক দুঃসাধ্য কসরৎ। এক পা মেলাতে হবে ইউরোপীয় আধুনিকের সঙ্গে। আরেক পা মেলাতে হবে ভারতীয় অতীতের সঙ্গে। এ যেন দুই নৌকায় পা রেখে টাল সামলে চলা।

এখন মালা নেই। কবে ফিরবে কে জানে! ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে প্যারিস ঘুরে আসা যায়। ওই সোমনাথের সঙ্গেই এক জাহাজে ভাসতে পারা যেতো। ইচ্ছাটাকে দমন করতে হলো। ভারতেরই খাতিরে। দাঙ্গাহাঙ্গামার দ্বারা নির্ণীত হয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা। অনেকের বিশ্বাস ভারতবর্ষ মুসলমানদের দেশ নয়, যেমন ইংরেজের দেশ নয়। তার ঐতিহ্য মুসলমানের নয়, যেমন ইংরেজের নয়। এরা মেঘের মতো উড়ে এসেছে, জল বর্ষণ করেছে, ফুরিয়ে গেছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এদের গুরুত্ব আছে ও থাকবে। অর্থনীতি ক্ষেত্রেও। কিন্তু জাতীয় সত্তায় বা জাতীয় চেতনায় এদের ধারা বহমান নয়। আমরা যদি সত্যিকার মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গ চাই ইরানে যাব, সীরিয়ায় যাব। যদি সত্যিকার ইউরোপীয়

সংস্কৃতির সংসর্গ চাই প্যারিসে যাব, রোমে যাব। কিন্তু এদেশের মুসলমান বা ইউরোপীয়ের কাছে যাওয়া বৃথা। এরা ফুরিয়ে গেছে।

আমার নিজের বিশ্বাস অবশ্য ঠিক তা নয়। আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যেরই অবক্ষয় উপস্থিত হয়েছিল। তাই মুসলমানকে তার প্রয়োজন ছিল যৌবনের জন্যে। যবন নিয়ে এলো যৌবন। আগেও একবার এনেছিল মুসলমানরূপে নয়, গ্রীকরূপে। পরেও আবার নিয়ে এলো ইংরেজ রূপে। যৌবন বার বার এসেছে। অবক্ষয় বার বার প্রতিহত হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অস্থিমজ্জা ভারতবর্ষেরই। একে হিন্দু বললে অবক্ষয়কেই সনাতন বলা হয়। কারণ অবক্ষয়ের পূর্বে এর নাম হিন্দু ছিল না। এর রূপও হিন্দু ছিল না। অজন্তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? যা সনাতন তা হিন্দু নয়। যা হিন্দু তা সনাতন নয়। হিন্দু মুসলমানের লড়াইটা ভূতের সঙ্গে ভূতের লড়াই। হিন্দুর মতো মুসলানেরও অতীত আছে, ভবিষ্যৎ নেই। থাকলে নিতান্তই স্থূল অর্থে! স্থূলের দ্বারা সূক্ষ্ম সৃষ্টি হয় না। আর্ট হচ্ছে সৃষ্টি। কিন্তু ভবিষ্যৎ আছে ভারত আত্মার। যদি তার সংস্কারমুক্তি ঘটে। যদি সে দশভূজার মতো দশদিকে দশ হাত বাড়ায়। পূর্ব পশ্চিম ভেদজ্ঞান না রাখে। হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি না পোষে।

মেসোমশায়ও ভিতরে ভিতরে ছটফট করছিলেন। বাইরে যদিও শান্ত সমাহিত। মালার জন্যে অবশ্য। তবে শুধু মালার জন্যে নয়। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, "পঞ্চাশ বছর বয়সের পর মানুষ বাঁচে তার কাজের জন্যে। তার কাজ থেকে তাকে বঞ্চিত কর। দেখবে সে বেঁচে নেই। বেঁচে আছে তার শরীরটা।"

বাস্তবিক কী নিয়ে তিনি থাকবেন। চাকরি তো করবেন না। নিজের বাড়ীতে বসে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা? তারও তো প্রবাহ রুদ্ধ। কবে দেশের সুদিন ফিরবে! পার্ক সার্কাসে ফিরে যাবেন তিনি। স্থানটি কত কাছে অথচ কত দূরে! দিনটিও কত কাছে অথচ কত দূরে!

বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেই মাসিমা বলে ওঠেন, "ক্ষেপেছ? ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়? শান্তিপ্রতিষ্ঠা হোক আগে। করবে ইংরেজ। যদি রাজত্ব রাখতে চায়।"

আমি কণ্ঠক্ষেপ করি। "আর যদি রাজত্ব না রাখতে চায়?"

"সে কী!" মাসিমার চমক লাগে। "এমন সোনার রাজত্ব কাকে দিয়ে যাবে! তুমিও যেমন। এ জিনিস কি প্রাণ ধরে কেউ কাউকে দেয়? ওরা দিয়ে যাবে না। আমরাই গায়ের জোরে কেড়ে নেব। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? হবে, সুভাষ যেদিন আসবে।"

মাসিমাকে শোনাই লাটভবনের কানাঘুষা। সেখানে মাঝে মাঝে যেতে হয় আমাকে। ইংরেজরা আগের চেয়ে অনেক বেশী দিলখোলা হয়েছে। ব্যবহারও তাদের অনেক বেশী ভদ্র। সমস্কন্ধের মতো। এই তো সেদিন শুনে এলুম, "ক্ষতিপূরণের বহর নিয়ে আপনাদের নেতাদের সঙ্গে দর কষাকষি চলছে। ইজিপ্টের ওরা আমাদের অফিসারদের খুশি করে দিয়েছিলেন। ইণ্ডিয়ার এঁরাও যদি খুশি করে দেন তা হলে আমরা কালকেই জাহাজ ধরতে রাজী। ঢের হয়েছে রাজাগিরি। হাতে রাখব সওদাগরি।"

অরাজকতার প্রশ্ন তুললে ইংরেজ আলাপীরা বলেন, "এসব দাঙ্গাহাঙ্গামার আসল কারণ তো এই যে ইণ্ডিয়ানরা ভাগ না দিয়ে ভোগ করতে চায়। নিজেদের মধ্যে ইণ্ডিয়ার লোক যা হয় একটা মীমাংসা করুক। যে মীমাংসা তারা করবে সেই মীমাংসাই আমরা মেনে নেব। কোনো পক্ষের উপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে যাব না।"

ইংরেজদের ধন্যবাদ যে তাদের ভাষায় আমরা সবাই ইণ্ডিয়ান। আর আমাদের সকলের দেশ ইণ্ডিয়া। কায়দে আজম কিন্তু সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি ইণ্ডিয়ান নন। তাঁর স্বদেশের নাম পাকিস্তান। এই যদি হয়ে থাকে তাঁর দলবলের মনের কথা তবে মীমাংসা হতে পারে না। মীমাংসার ভিত্তিই নেই। এটা হৃদয়ঙ্গম করে গান্ধীজী দিল্লী ছেড়ে নোয়াখালী চলে গেছেন সরাসরি আবেদন করতে দেশের ইসলামপন্থী জনগণের দরবারে। তারা যদি কবুল করে যে তারা ইণ্ডিয়ান তা হলে মীমাংসা হবে নেতায় নেতায় নয়, পার্টিতে পার্টিতে নয়, জনতায় জনতায়। কিন্তু তারাও যদি কায়দে আজমের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করে তবে মীমাংসার শেষ ভরসাটুকুও লুপ্ত হবে। নোয়াখালীতে মহাত্মা গেছেন নিশ্চয় করে জানতে ইসলাম যাদের ধর্ম ইণ্ডিয়া কি তাদের দেশ, না দেশ নয়? ইণ্ডিয়ান কি তারা জাতিতে, না ইণ্ডিয়ান নয়?

মেসোমশায় হঠাৎ বলে বসলেন, "আমিও নোয়াখালী যাব।"

"তুমিও নোয়াখালী যাবে।" মাসিমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "কেন? মেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে? না শুধু একবার দেখে আসতে?"

অবাক হলুম আমিও। ভাবলুম মালার জন্যে তার বাপের মন কেমন করছে। করবে না? আমি কোথাকার কে! আমারি মন কেমন করছে।

"না। সে জন্যে নয়।" মেসোমশায় পরিষ্কার করলেন। "নোয়াখালী গেলে দেখা হবে বইকি, কিন্তু দেখার জন্যে নোয়াখালী যাওয়া নয়। আর ঘরে ফিরিয়ে আনা তো মালার অনিচ্ছায় হতে পারে না। তার যেদিন ইচ্ছা হবে সে আপনি চলে আসবে।"

একটু থেমে বললেন, "ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে লণ্ডনে নয়, দিল্লীতে নয়, নোয়াখালীতেই। নোয়াখালীতে যদি আমরা সিদ্ধকাম হই তা হলে দিল্লীতেও আমরা ব্যর্থ হতে পারিনে, লণ্ডনেও আমাদের নিষ্ফলতা ঘটবে না। আর নোয়াখালীতে যদি আমরা অকৃতকার্য হই তা হলে দিল্লীতেও আমাদের অক্ষমতা ঢাকা থাকবে না, লণ্ডনেও সেটা ধরা পড়ে যাবে। শেষ সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে নোয়াখালীর উপর। সে যেদিকে ইঙ্গিত করবে দিল্লী সেই দিকেই চলবে, লণ্ডন সেই দিকেই হেলবে।"

"সব মানলুম। কিন্তু তুমি কেন?" মাসিমা ভুললেন না। ভবী ভোলে না।

"আমি কেন?" মেসোমশায় বললেন, "কলকাতায় আমি কার কোন্ কাজে লাগছি? কলকাতা এখন মফঃস্বল। নোয়াখালী এখন সদর। ভারতের ভাগ্য তো দূরের কথা, বাংলাদেশের ভাগ্যও এখন কলকাতার হাতে নয়। কলকাতাই বা কার কোন্ কাজে লাগছে? অসতো মা সদ্ গময়। আন্‌রিয়ালিটি থেকে আমাকে রিয়ালিটিতে নিয়ে যাও। কলকাতা থেকে আমাকে নোয়াখালীতে যেতে দাও। যাই, দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমার দ্বারা বৃহৎ কিছু হবে না, কিন্তু সামান্য কিছুও তো হতে পারে। রাম যখন সমুদ্রবন্ধন করেন কাঠবিড়ালীও নুড়ি বয়ে এনে সাহায্য করেছিল।"

মাসিমা তা শুনে লাল হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে কথা জোগাল না। আমার দিকে তাকালেন। যেন আমিও তাঁর পক্ষে। আমি তাকালুম টোগোর দিকে। টোগো তাকাল নীলির দিকে। আমাদের সকলের ভাবনা মেসোমশায়কে কী করে নিবৃত্ত করা যায়। মাসিমা কখনো তাঁকে যেতে দেবেন না। তিনি রক্তের চাপে ভুগছেন। তাঁকে যেতে দিলে বিপদ। ওদিকে তিনিও প্রায় মরীয়া হয়ে উঠেছেন। নোয়াখালী তিনি যাবেনই। তাঁকে যেতে না দিলেও বিপদ। নজরবন্দী করে তাঁর মতো লোককে কাঁহাতক আটকিয়ে রাখা যায়! তাঁর উপর জোর খাটাতে গেলে ফল খারাপ হবে।

এ এক সঙ্কটময় পরিস্থিতি। মাসিমা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, "দেবপ্রিয়, এই সঙ্কটের জন্যে দায়ী তোমার বোন মালা। সে যদি অমন করে নোয়াখালী না যেত ইনিও যাবার জন্যে কোমর বাঁধতেন না। তোমার কি মনে হয় না যে মালাকে টেলিগ্রাম করে ফিরতে বলা উচিত ?"

"কোন্ অজুহাতে, মাসিমা ?" আমি তটস্থ হই।

"পিতার অবস্থা উদ্বেগজনক। এর মধ্যে মিথ্যা কোথাও আছে ?" তিনি ভাষার দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিলেন।

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি যে মালা যদি টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ী আসে তো উদ্বেগের উপযুক্ত কারণ না দেখে আবার চলে যাবে। সঙ্গে যাবেন তার বাবা। তার চেয়ে অনেক ভালো সত্যের মুখোমুখি হওয়া। মেসোমশায়কে যেতে দেওয়াই শ্রেয়। সাথী হবেন মাসিমা।

"আমি !" তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "তুমি হয়তো মনে করবে আমি ভীতু। প্রাণের ভয়ে যেতে নারাজ ! কিন্তু তা নয় ! আমার নজর সব সময় পার্কসার্কাসের বাড়ীখানার উপর। এইখানে বসেই আমি কড়া পাহারা দিচ্ছি। জানো, ও বাড়ীতে এখন টেলিফোন বসেছে। একদিন হয়তো মিলিটারিও বসবে। আমার বাড়ী আমি বেদখল হতে দেব না। নিজে ঢুকতে না পারি আর কাউকে ঢুকতে দেব না। কিন্তু আমি কলকাতার বাইরে যাই বাড়ীটাও আমার নাগালের বাইরে যাবে। তোমার মেসোমশায়কে এ কথা বোঝায় কে ? 'দেশ' 'দেশ' করে তিনি গেলেন। আচ্ছা দেশ কি একটা নিরাকার বস্তু ? দেশ হচ্ছে বাড়ী ঘর বাগান। দেশ হচ্ছে পনেরো কাঠা জমি। এই যদি গেল তো দেশ নিয়ে আমি করব কী, বল।"

এই পারিবারিক সঙ্কটে ডাক্তার বন্ধুরাও হার মানলেন। মেসোমশায় তাঁদের পরামর্শ কানে তুললেন না। বললেন, "গান্ধীর বয়স সাতাত্তর বছর। আমার বয়স ষাটেরও কম। তিনি তো শুনতে পাই পা দিয়ে নোয়াখালী চষে বেড়াচ্ছেন। বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে হাঁটছেন। আমি কি এতই অথর্ব ! আমার কি এটা ইনভ্যালিড দশা !'

নয়

বড়দিনের সময় এক চিত্রপ্রদর্শনীতে নির্মলের সঙ্গে দেখা। এলাহাবাদ থেকে সে কলকাতা এসেছিল কী একটা কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। মেসোমশায়ের ঠিকানা খুঁজে পায়নি। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে আবিষ্কার করেছে।

পরিস্থিতির বিবরণ তাকে শোনাই। সে বলে, "উপায় যে নেই তা নয়। মাসিমা যদি অনুমতি দেন আমিই মেসোমশায়ের যাত্রাসহচর হব। তাঁর স্বাস্থ্যের খবরদারি করার দায় আমার। তাঁর শরীরতত্ত্ব আমার অজানা নয়। নোয়াখালীতে গিয়ে তাঁর যদি ঘুরতে ইচ্ছা হয় আমিও তাঁর সঙ্গে ঘুরব। যদি এক জায়গায় থাকতে ইচ্ছা হয় আমিও তাঁর সঙ্গে থাকব। ছুটি ? ছুটি আমি যেমন করে পারি জোটাব।"

মাসিমার সামনে হাজির করে দিই তাকে। মাসিমা ভুরু কুঁচকিয়ে বলেন, "তুমি ডক্টরেট পেয়েছ

বলে কি ডাক্তার হয়েছ? অসুখবিসুখ করলে তুমি পারবে চিকিৎসা করতে? ওষুধ পাবে কোথায় ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে?"

মেসোমশায় কিন্তু নির্মলের প্রস্তাব শুনে লাফিয়ে ওঠেন! রাতারাতি পরিকল্পনা তৈরী হয়ে যায়। মাসিমার প্রত্যেকটি আপত্তির খণ্ডন হয়। তিনিও হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, "যাচ্ছ, যাও। কিন্তু বেশীদিন থেকো না। শুনছি আবার গোলমাল বাধবে নোয়াখালীতে। মালাকেও টেনে নিয়ে এসো।"

একদিন নির্মলকে সঙ্গে নিয়ে মেসোমশায় নোয়াখালী অভিমুখে যাত্রা করলেন। শেয়ালদায় তাঁকে তুলে দিয়ে এলুম। বিদায়কালে বললেন, "এ কাজটা আমার কাজ নয়। তবে যাচ্ছি কেন? যাচ্ছি এইজন্যে যে, নাই কাজের চেয়ে কাণা কাজও ভালো। এখন আমার সত্যি বাঁচতে ইচ্ছা করছে।"

লক্ষ করলুম শুধু বাঁচতে নয়। নাচতেও। মেসোমশায় ইউরোপীয় পোষাক পরে যেন নেচে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে বয়সের তুলনায় ছোট দেখাচ্ছিল। কে বলবে যে তিনি একজন ইনভ্যালিড! অথচ তাই হতো তাঁর দশা আরো কিছুদিন বেকার বসে থাকলে। পরের বাড়ী নজরবন্দী হয়ে পড়ে থাকলে।

এ মানুষ যে খুব শীগগির নোয়াখালী থেকে ফিরবেন এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। কিন্তু কাউকে মুখ ফুটে বলিনে এ কথা। পাছে মাসিমা দুঃখ পান। তাঁর ধারণা মানুষ বাঁচে ডাক্তার দেখালে আর ইনজেকশন নিলে আর ওষুধ খেলে। কিন্তু তাঁকে দোষ দিয়ে কী হবে? স্বামীকে যেতে দিলে কী নিয়ে তিনি থাকবেন? তাঁরও তো একটা অবলম্বন চাই। যা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাঁচা তো কেবল টিকে থাকা নয়।

মাসিমা এর পরে এক দারুণ দুঃসাহসিক কাজ করেন। সোজা গিয়ে নিজের বাড়ীতে ওঠেন। সেইখানেই বাস করতে থাকেন। অগত্যা আমাকেও প্রাণ হাতে করে তাঁর ওখানে যেতে হয়। যখনি যাই দেখি মাসিমার বাড়ীর ফটকে এক সশস্ত্র গুর্খা পাহারা দিচ্ছে। আর একটা গুর্খা খাটিয়ায় শুয়ে বিশ্রাম করছে। তার পাশে শুয়ে আছে তার হাতিয়ার। গুলীভরা রাইফেল। দেখলে গা ছমছম করে।

মাসিমাকে জিজ্ঞাসা করি, "এসব তো আগে দেখিনি। কবে লাইসেন্স নিলেন? মুসলিম লীগ সরকার কি হিন্দুকে লাইসেন্স দেয়?"

মাসিমা একটু হাসেন। বলেন, "গুণ্ডাদের কে লাইসেন্স দিয়েছে? এত হাতিয়ার তারা পায় কোথায়? যত কড়াকড়ী কি শুধু ভদ্র গৃহস্থের বেলায়? গুণ্ডার বিরুদ্ধে গুর্খা লাগিয়ে দিয়েছি। ওদের হাতিয়ার ওরাই যেখান থেকে হোক জুটিয়েছে। আমি চোখ বুজে রয়েছি। টাকা চায়, টাকা দিই। এও একরকম ট্যাক্স। গুর্খাকে না দিলে গুণ্ডাকে দিতে হতো। আগেকার দিনে একটাই গবর্নমেণ্ট ছিল। এখন একজোড়া গবর্ণমেণ্ট। একটা সরকারী। আরেকটা বেসরকারী। দু'দিন সবুর কর। দেখবে দেশে একটা প্রাইভেট আর্মি গড়ে উঠবে। অস্ত্রশস্ত্র ঘরে ঘরে তৈরী হবে। বোমা একদিন আমিই বানাব। এ বাড়ী কি আমি অমনি ছেড়ে দিচ্ছি?"

কী পরিমাণ মরীয়া হলে মানুষ এমন কথা মুখে আনে। বিশেষত হিন্দুর মেয়ে! আমি বিমূঢ় হয়ে শুনি। প্রতিবাদ বা সমর্থন কোনটাই করিনে।

মাসিমা বলে যান, "বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' পড়েছ? মুসলমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হিন্দুর ছেলে, হিন্দুর মেয়ে সেদিন কী করেছিল? ইংরেজ এসে মুসলমানের আশা দেয়। ইংরেজকে বিশ্বাস করে আমরা আমাদের হাতের অস্ত্র ইংরেজের হাতে তুলে দিই। ইংরেজ এখন আমাদের রক্ষা করতে অক্ষম।

তা হলে রক্ষা করবে কে? মুসলমান? সেই তো প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সূত্রধার। আবার 'আনন্দমঠে'র দিন আসছে। গান্ধীজীর অহিংসা কোনো কাজে লাগবে না। তার মহিমা এই গুণ্ডার দল বুঝবে না। নোয়াখালীর বেণাবনে মুক্তা ছড়ালে হবে কী!"

কলকাতা শহরে অকস্মাৎ অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য লক্ষিত হলো। টোগোকে জিজ্ঞাসা করলে সেও হাসে। বলে, "কোনটা তোমার চাই? পিস্তল? রিভলভার? রাইফেল? ষ্টেনগান? কত টাকা খরচ করতে রাজী? কাল রাত বারোটার সময় ঘরে বসে পাবে। কোনখান থেকে আসবে জানতে চেয়ো না।"

এই বলে টোগো দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে দেয়। সে সুরক্ষিত।

দেখলুম হাতিয়ার চাইলেই পাওয়া যায়। অফুরন্ত সরবরাহ। লাইসেন্স অবশ্য দুর্লভ। কিন্তু কেউ তার অপেক্ষায় বসে নেই। পুলিস যথারীতি হানা দেয়, খানাতল্লাসী করে, কিন্তু পুলিশের লোকেই দয়া করে জানিয়ে দিয়ে যায় যে হানাদার আসছে, খানাতল্লাসী হবে। হাতী ঘোড়া পার হয়ে যায়। ধরা পড়ে চুনোপুঁটি। স্টেনগান যার হাতে আছে তার কাছে ঘেঁষবে কে? ওই গাদা বন্দুক কি ছোরা উদ্ধার করে। মোদ্দা কথা হিন্দুর স্বার্থ নয় হিন্দুকে নিরস্ত্র করা, মুসলমানের স্বার্থ নয় মুসলমানকে নিরস্ত্র করা। ইংরেজের স্বার্থে তো কেউ বাদ সাধছে না, তাই ইংরেজেরও স্বার্থ নয় কাউকে নিরস্ত্র করা।

দেশ চলেছে গৃহযুদ্ধের অভিমুখে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হইনি। এবার ভারতের গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হব। মনটাকে সেইভাবেই প্রস্তুত করতে আরম্ভ করি। কিন্তু আমার কাজ অসি দিয়ে নয়। তুলি দিয়ে। তবে তুলি ধরার জন্যেও তো বেঁচে থাকা চাই। বেঁচে থাকার জন্যে কি অসি ধরতে হবে? পাব কোথায়? কি ভাবে? টোগো যেখানে পেয়েছে। যেভাবে। চিন্তান্বিত হই।

এমন সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে ভারতীয়রা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করুক আর নাই করুক আটচল্লিশ সালের জুন মাসের মধ্যে ইংরেজ এ দেশ থেকে অপসরণ করবে। আমার কাছে এই সম্ভাবনাটা নতুন নয়। এই তারিখটাই নতুন। ইংরেজ তা হলে সত্যি সত্যি চলল। তার যাত্রা শুভ হোক। মনটাকে সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষমুক্ত করি। ইংরেজ বন্ধুরা দেখি পরম আশ্বস্ত। চার দিকের বিশৃঙ্খলার দায়িত্ব বইতে তাদের আন্তরিক অরুচি। ক্ষমতার বদলেও না। তারাও নতুন করে জীবন পত্তন করতে চায়।

মেসোমশায় ইতিমধ্যে ফিরেছিলেন। মাসিমা একদিন আমাকে একটা বিচিত্র বার্তা শোনালেন। বললেন, "দেখ, দেবপ্রিয়, নোয়াখালীর সমস্যা আজকের নয়। তোমার জন্মের আগের। লাট কার্জন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা কলকাতা থেকে শাসন করা যায় না বলেই তিনি ঢাকা থেকে শাসনের পরিকল্পনা করেন। বঙ্গবিভাগের সেইটেই ছিল প্রাথমিক কারণ। আবার যদি বাংলাদেশ দু'ভাগ হতো আর ঢাকা হতো পূর্ববঙ্গের রাজধানী তা হলে নোয়াখালী শাসন করা সুগম হতো কি না তুমিই বল। যেটা কলমের এক খোঁচায় হতে পারে সেটার জন্যে মহাত্মাকেই বা অমন ভীষ্মের মতো পণ করতে হয় কেন? মালারই বা অমন তপস্যায় কাজ কী? আর ইনিই বা কেমন করে আমাকে বিপদের মুখে ফেলে অত দিন ওখানে থাকেন?"

বাংলা ভাগ করার এই অভিনব প্রস্তাব দেখতে দেখতে সর্বত্র ছড়িয়ে যায়। সমস্যা যে অত সহজে মিটতে পারে কারো মাথায় আগে এটা ঢোকেনি। ইংরেজীতে একটি কথা আছে। হেরডকে আউট-হেরড করা। হেরডের উপর টেক্কা দেওয়া। তেমনি এটা হলো জিন্নাকে আউট-জিন্না করা। খোদার উপর খোদকারী করা। তুমি চল ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়।

"দেখ, এর মধ্যে একটা মস্ত কূটনৈতিক চাল আছে।" আমাকে বোঝায় আমার রাজনৈতিক বন্ধু হারানিধি সাহা। "বাংলা ভাগ হলে ওরা কলকাতা হারাবে। এটি একটি সোনার খনি। ওদের দশা হবে মণিহারা ফণীর মতো। কিছুতেই ওরা রাজী হতে পারে না। ওরা যদি এতে রাজী না হয় আমরা কেন ওতে রাজী হব? আর ওরা যদি এতে রাজী হয় তা হলে আমরা কেন ওতে নারাজ হব? এসব গুণ্ডাদের পদ্মাপার করতে পারলেই বাঁচি।"

"ও পারের হিন্দুরা কি আরো বিপন্ন হবে না?" প্রশ্ন করি আমি।

"ওরা," হারানিধি অম্লানমুখে উত্তর দেয়, "এ পারে চলে আসবে।"

বাজিয়ে দেখলুম গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো মেরুদণ্ড একজনেরও নেই। গৃহযুদ্ধ যাতে না বাধে সেই কথা ভেবে আগে থেকেই সন্ধি করতে বুদ্ধিমানেরা ব্যগ্র। সন্ধির সর্ত পর্যন্ত তাঁদের জিহ্বাগ্রে। বাকী শুধু জিন্নাকে ঢেঁকি গেলানো। তার জন্যে দরকার ছিল মাউণ্টব্যাটেনের মতো এক ওস্তাদের। তিনি যা করলেন তা একপ্রকার অসাধ্যসাধন। হঠাৎ নবাবদের কলকাতা ছাড়ার দিন ঘনিয়ে এলো।

সেই যে রাজেক হোসেন সাহেব বা রাজেনদা তিনি মেসোমশায়ের অনুপস্থিতিতে মাসিমার বাড়ী আসতে সাহস পেতেন না। যেই শুনলেন মেসোমশায় ফিরেছেন অমনি ছুটে এলেন দেখা করতে। তখনো মাউণ্টব্যাটেনের প্ল্যান পাকা হয়নি। মেসোমশায়ও বিশ্বাস করেন না যে পাকা হবে। তাঁর ধারণা গান্ধীজী ওটা উলটিয়ে দেবেন। যেমন দিয়েছিলেন ক্রিপস্ প্রস্তাব। মাউণ্টব্যাটেনকেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে।

"ভাই অমল, এ কী শুনছি, ভাই?" রাজেনদা তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। "এ কী আবদার ধরেছিস তোরা? বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে! এ কি কখনো ভাবা যায়!"

"তুমি নিশ্চিন্ত থেকো রাজেনদা।" মেসোমশায় অভয় দেন তাঁকে। "দেশ কিছুতেই ভাগ করা হবে না। না ভারতবর্ষ, না বাংলাদেশ। ইংরেজ যাচ্ছে, যাক। ওরা গেলে পরে আমরা যেমন করে পারি মিটমাট করব। মিটমাট না হলে তখন দেখা যাবে; নতুন আবহাওয়ায় নতুন করে ভাবা যাবে। আগে হাওয়া বদল।"

রাজেনদা যে খুব খুশি হলেন তা নয়। তিনি ইংরেজ থাকতেই মিটমাট চান। গান্ধী যেন জিন্নার দাবী মিটিয়ে দেন। চরম মহত্ত্ব দেখান। মুসলমান চিরবাধিত হবে। পাকিস্তান যে সব মুসলমানের মনের কথা তা নয়, কিন্তু সব মুসলমানেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তারা যেন নতুন করে পরাধীন না হয়। তাদের শঙ্কা অমূলক হলে তারা কি এমন মরীয়া হয়ে উঠত? তাদের দিক থেকে এটা একটা জীবনমরণ সংগ্রাম। তারাও শান্তি চায়, কিন্তু স্বাধীনতার বিনিময়ে নয়।

মেসোমশায় নোয়াখালী থেকে বিষণ্ণতর ও বিজ্ঞতর হয়ে ফিরেছিলেন। সর্বদা একটা অন্যমনস্ক ভাব। বেদনার সঙ্গে বললেন, "মুসলমানরা নতুন করে পরাধীন হোক একটি হিন্দুর মনেও এ কামনা ভুল করেও স্থান পায়নি কোন দিন। বহুল প্রচারের দ্বারা মিথ্যা কখনো সত্য হয়ে যায় না। স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যে সংগ্রাম চলে এসেছে তাতে হিন্দুও অংশ নিয়েছে, মুসলমানও অংশ নিয়েছে, শিখও অংশ নিয়েছে। যে স্বাধীনতা আসন্ন সে স্বাধীনতা সকলেরই এজমালী স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পরে যদি একে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে ভোগ করতে পারি, এর দায় একসঙ্গে বহন করতে না পারি, তা হলে একসঙ্গে বসে স্থির করব কেমন ভাবে ভাগ করলে সকলের সন্তোষ। সেটা হবে

আমাদের ঘরোয়া বাঁটোয়ারা। তাতে বিদেশী শাসকের হাত থাকবে না। ভালোবেসে যদি ধরে রাখতে না পারি তবে প্রেমের সঙ্গেই ছেড়ে দেব তোমাদের। তোমরা যদি পাকিস্তান চাও আমাদের হাত থেকেই পাবে, তার সঙ্গে পাবে আমাদের শুভেচ্ছা। আমরাই সে পাকিস্তান রক্ষা করব, তার জন্যে জান দেব।"

রাজেক হোসেন মনঃস্থির করে ফেলেছিলেন। দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "না। না। তোমাদের হাত থেকে নয়। ইংরেজের হাত থেকেই। ওরাই যে আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিল। ওরাই আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।"

মেসোমশায়ও তেমনি দৃঢ় স্বরে বললেন, "তা হলে ইংরেজের কাছেই দরবার করগে। গান্ধীজীর কাছে মহত্ব প্রত্যাশা করছ কেন?"

রাজেক হোসেন নিরুত্তর। মেসোমশায় বলতে লাগলেন, "ইংরেজের সঙ্গে যারা লড়াই করেনি তারাই দেখি ইংরেজের হাত থেকে খয়রাত নেবার জন্যে ব্যগ্র। এমন ব্যগ্র যে ভাইয়ের সঙ্গে লড়াই বাধাতে তর সয় না। তাও যদি হতো অহিংস কিংবা ভদ্র পদ্ধতিতে! প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যাহার না করলে জিন্নার সঙ্গে গান্ধীর কথাবার্তার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। হিংসার কাছে নতিস্বীকার করার নাম অহিংসা নয়। গান্ধীজীর দেবার যা আছে তিনি দেবেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তুলে নিলে ব্রিটিশ অপসরণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরলে। সেটা মহৎ দানই হবে।"

"না। না। তাঁর হাত থেকে দান আমরা চাইনে।" রাজেক হোসেন উঠলেন। "তা সে যতই মহৎ হোক না কেন। অপেক্ষাও আমরা করব না।"

মেসোমশায় তাঁকে ধরে বসিয়ে বললেন, "তোমরা শুধু চাও গান্ধীজীর সম্মতি। দেবার মালিক ইংরেজ। কিন্তু ইংরেজ যদি তোমাদের আধখানা বাংলা দেয় নেবে?

রাজেক হোসেন আমতা আমতা করে বললেন, "কী করে নিই?"

"নিয়ো না।" মেসোমশায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। "নেওয়া উচিত নয়। এটা একটা খারাপ চালের পালটা চাল। এটাও খারাপ। দুই খারাপে এক ভালো হয় না। এতে তোমাদেরও অমঙ্গল, আমাদেরও অমঙ্গল। আপাত লাভকে প্রকৃত লাভ বলে ভুল করলে আখেরে ঠকতে হয়। কাঁটা একদিন গলায় বিঁধবেই। সেদিন হয়তো আমাদের জীবিতকালে নয়। জাতি হিসাবে আমরা বাঙালীরা তৃতীয় শ্রেণীর হয়ে যাব। আমাদের সব স্বপ্নের, সব ধ্যানের সমাধি হবে। আমাদের হাত দিয়ে আর কোনো মহৎ সৃষ্টি হবে না। এ বেদনা আর কেউ বুঝবে না, বুঝবে শুধু তোমরা আর আমরা। উভয়ের উত্তরপুরুষ। ভাই রাজেনদা, বহু শতাব্দীতে এ রকম মুহূর্ত একবার মাত্র আসে। এটা আমাদের সত্যের মুহূর্ত। মোমেণ্ট অব ট্রুথ। আমরা কি বরাবরের জন্যে দু'ভাগ হয়ে যাব?"

এর উত্তরে রাজেক হোসেন কী বললেন, শুনবে? বললেন, "সেইজন্যেই তো বলি, বাঙালী যেন ভাগ হয়ে না যায়, বাংলা যেন ভাগ হয়ে না যায়। পাকিস্তানেই আমাদের সকলের স্থান হবে। ভারতবর্ষ কতবার ভেঙেছে। আবার ভাঙলই বা!"

মেসোমশায় হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, "বাংলাকে ভালোবাসি বলে ভারতকেও কম ভালোবাসিনে। এক ভালোবাসার খাতিরে আরেক ভালোবাসাকে ত্যাগ করতে পারি কখনো? যাদের অন্তরে প্রেম নেই তারাই ভাগ করতে পারে ভারতকে, বাংলাকে।"

"এই যদি হয় নির্যাস কথা তবে ইংরেজ চলে গেলেও তোমরা আমাদের পাকিস্তান দেবে না।

বৃথা স্তোক দিয়ে আমাদের শেষ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করছ। তার চেয়ে ইংরেজ যা দেয় তাই সই। আধখানা বাংলা দেয় আধখানাই নেব।" বললেন রাজেক হোসেন।

ঘটনার গতি গান্ধীর জন্যে অপেক্ষা করল না। ব্রিটিশ অপসারণের সন্ধ্যামুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে দেখে তাঁর সম্মতি না নিয়েই নূতন শাসকরা পুরাতন শাসকদের দিয়ে চক্ষের নিমেষে দেশ ভাগ করিয়ে নিলেন, প্রদেশ ভাগ করিয়ে নিলেন। ভেবেছিলেন সেই উপায়ে অরাজকতা রোধ করবেন। পাঞ্জাবে কিন্তু তার উল্টো ফল হলো। গান্ধী না থাকলে বাংলাদেশেও হতো।

মেসোমশায় অসুখে পড়লেন। আমি গেলুম দেখতে। আমাকে তাঁর বিছানার ধারে বসিয়ে বললেন, "যে যার এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিল হে। একসঙ্গে দু'দুটো শাইলক। রক্তধারা ঝরবেই তো। এখন একে বন্ধ করবে কোন ধন্বন্তরি!"

ভেবেছিলুম মালা ফিরে আসবে। ফিরল না। ফিরল মনোরমা। বলল, "মালা তো বিশ্বাসই করে না যে মানুষকে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত করলে তার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়ে যায়। কিংবা দেশকে হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান বলে চিহ্নিত করলে তার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয়ে যায়। নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান বলে চিহ্নিত করাটাই যখন ভুল তখন সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের শামিল বলে গণনা করাটাও ভুল। যেখানে পনেরো আনা মিল সেখানে এক আনা গরমিলটাই বড় কথা নয়। তেমনি যেখানে এক আনা মাত্র মিল সেখানে সাম্প্রদায়িক নাম ধারণ করাটাই লজ্জার কথা। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এটা একটা প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। বিংশ শতাব্দী যখন শেষ হয়ে আসবে তখন এর অসারতা প্রত্যেকের চোখে পড়বে। তা বলে যেসব মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেছে সেসব হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। সেইসব রক্তের নদী আর হাড়ের পাহাড় কোথাও হিন্দুর, কোথাও মুসলমানের, কিন্তু সর্বত্র মানুষের। সর্বত্র আপনার লোকের। মালা ভাবছে কেমন করে ওদের প্রাণ ফিরিয়ে আনবে।"

আমিও বিশ্বাস করিনে যে এই ভূতের লড়াই চিরদিন চলবে বা চলতে পারে। কিন্তু জ্যান্ত মানুষের ঘাড় মটকাবার শক্তি এর অপরিসীম। যা ঘটেছে তা হাস্যকর তো নয়ই। তা ভয়ঙ্কর। যা ঘটবে তা হয়তো আরো ভয়ঙ্কর। মালা পারবে কেন সহ্য করতে! রক্তের নদী দেখতে দেখতে সমুদ্র হবে হয়তো। হাড়ের পাহাড় দেখতে দেখতে হিমালয়। মালা! মালা! তুমি কেন এ পথ দিয়ে যাবে! প্রাণ ফিরিয়ে আনা কি সম্ভব না সহজ! মুক্তা ঝরার জল সোনার শুকপাখী থাকলে তো আনবে।

মনোরমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, "মালার সঙ্গে আপনি থাকলেন না কেন?"

"আমি কেন থাকব?" মনোরমা পাল্টা সুধায়। "কেমন করে থাকব? আমার স্বামী আছে, সন্তান আছে। তাদের কতকাল অবহেলা করব? যদি জানতুম যে এ সঙ্কটের আশু অবসান হবে। তা তো হবার নয়। স্বয়ং মহাত্মাজীকেই দেখলুম অসহায়ের মতো কাঁদতে। তিনিও অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলেছেন। মানুষ একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে, ভাইজী। মহাত্মার কথাও তার প্রাণে পৌঁছয় না। কানে পৌঁছলেও তবু কাজ হতো। মহাত্মার সভায় আসবেই না। তিনি ঘরে ঘরে গিয়ে প্রেম দেন। তাও কি নেয়? অনেকগুলি মেয়েকেই আমরা উদ্ধার করেছি। কিন্তু যেই আমরা সরে আসব আর মিলিটারি সরে যাবে অমনি আরো অনেক মেয়ে বন্দিনী হবে। মালা যদি থাকতে চায় তাকে ওই বিংশ শতাব্দীর শেষদিন অবধি থাকতে হবে। আমি ততদিন থাকতে পারিনে! তবে আর একজন থাকবেন।"

কৌতূহল দমন করতে পারিনে। জানতে চাই কে তিনি।

"আপনার বন্ধু নির্মলজী।" মনোরমার চোখ হাসে।

"ওঃ! তাই তো! ভুলে গেছলুম তাঁর কথা।" আমি গম্ভীরভাবে বলি।

মেসোমশায় ও মাসিমা দুজনেই মালার জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। বিশেষত গান্ধীজী বিহারে চলে যাওয়ার পর থেকে। মনোরমা ছিল তাদের প্রধান ভরসা। তার স্থান নিল নির্মল। লক্ষ্য করলুম নির্মলের প্রতি মাসিমার অপার নির্ভরতা।

একদিন কথায় কথায় মাসিমা আমাকে বললেন, "তা একালের মেয়েরা যখন নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করবেই. গুরুজনের নির্বন্ধ মানবে না, তখন আমরাই বা কেন আপত্তি করি? আপত্তি করলে শুনছে কে? আমি, বাবা, কাউকে বাধা দিতে চাইনে। একটিমাত্র মেয়ে। তাই আমি একটু ভালো দেখে বিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। এই আমার অপরাধ। এর জন্যে আমাকে ত্যাগ করে বনবাসে যাবার কোন অর্থ হয়? গেল তো গেল। আর ফিরে আসার নামটি নেই। বাপের সঙ্গেও না। মনোরমার সঙ্গেও না। চিঠি লিখলে জবাব দেয়, আমি যদি যাই তবে একখানা টিকিটে কুলোবে না। কিছু না হোক শতখানেক মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইবে। কোন প্রাণে তাদের পিছনে ফেলে যাই? তুমি তাদের কোথায় জায়গা দেবে বল?

আমি আশ্চর্য হলুম। "আপনার বাড়ীতে জায়গা দিতে হবে এমন কী কথা আছে!"

"ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো আমার এই হতভাগা বাড়ী। দেশ ভেঙে দিয়ে মুসলমানকে যদি বা হটালুম তো বাঙাল উড়ে এসে জুড়ে বসতে চায়। তাও একটি নয়, দুটি নয়, শতখানেক। বলি এদের পিণ্ডি জোগাবে কে?"

"সেটা," আমি সন্তর্পণে বলি, "দেশ ভেঙে দেবার আগে দু'বার ভেবে দেখা উচিত ছিল আপনার। হিন্দুকে হিন্দু না পুষিলে কে পুষিবে?"

মাসিমা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, "বেশ, তা হলে এ বাড়ীও আমি বেচে দেব।"

একটু ঠাণ্ডা হয়ে আবার বলতে লাগলেন, "হাঁ, মালা আর কী লিখেছে শুনবে? লিখেছে, মুসলমানরাও আমাকে ছাড়তে রাজী নয়। মুসলমানদের গ্রামশুদ্ধ লোক এসে আমার কাছে দরবার করে, সবাই যাক। আপনি থাকুন। যা করতে বলবেন তাই করব। সত্যি তারা আমার কথা শোনে। তাদের কথা আমি কেমন করে না শুনি? হাঁ, জনাদশেক মুসলমান যুবক আমার কাছে আরজ জানিয়েছে যে আমি যেদিন যাব সেদিন তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। কলকাতা শহর তারা দেখেনি। সেখানে গিয়ে কাজকর্ম করবে। খেটে খাবে। কারো গলগ্রহ হবে না। এই নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলিকে আমি কেমন করে বোঝাই যে কলকাতায় মুসলমান আর নিরাপদ নয়? সেখানে খেটে খেতে চাইলেও ঠাঁই নেই। অধিকার নেই। তাই যদি হয় তবে কলকাতা ফিরে যাওয়া আমার হবে না। আমি অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করব।"

আমি বেদনা বোধ করি। বলি, "নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলির কোথাও কি ঠাঁই আছে? তা বলে মালা কলকাতা না ফিরে কতকাল ও মুলুকে থাকবে?"

"নিরীহ প্রকৃতির মানুষগুলি!" মাসিমা জ্বলে ওঠেন। "না হিংস্রপ্রকৃতির বনমানুষগুলি! যাদের আমি এত কষ্টে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে যাচ্ছি তাদেরি ভাই বেরাদরদের উনি খাল কেটে শহরে ডেকে আনবেন। নয়তো অভিমান করে মোগলের মুলুকে থাকবেন। এখন আমি করি কি? কেমন করে

আমার মেয়েকে উদ্ধার করি? ও যদি ভালোবেসে কাউকে বিয়ে করতে চায় আমার দিক থেকে বাধা নেই জেনো। শুধু জামাইটি মুসলমান না হলেই হলো।"

মাসিমার উদারতায় আমি চমৎকৃত হই। এটা কি স্বাধীনতার হাওয়া লেগে? না ভাঙনের দৃশ্য দেখে? আঘাত প্রতিঘাতে দেশ যদিও জর্জর প্রগতির রথচক্র অবিরাম ঘর্ঘর রবে ছুটে চলেছে।

দেশবিভাগের অভাবনীয়তায় হিন্দুরা যত না স্তম্ভিত প্রদেশবিভাগের অকল্পনীয়তায় মুসলমানরা ততোধিক। পাকিস্তানের খড়্গ তবু সাত আট বছর ধরে মাথার উপর ঝুলছিল, কিন্তু পশ্চিম বাংলার বজ্রটি অকস্মাৎ আসমান থেকে পড়ল। মুসলমানরা একবার মুর্শিদাবাদের তখত হারিয়েছিল। এবার হারালো কলকাতার গদি। এমনিতেই তাদের মন খারাপ। তার উপর শোনা গেল পনেরোই আগষ্টের দিন হিন্দুরা দেখে নেবে। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, "দাঁড়ান, মশায়। ক্ষমতাটা একবার আসুক হাতে। এমন শিক্ষা দেব যে চিরদিন মনে থাকবে।" আমি শিউরে উঠি।

ভয়ানক এক ট্র্যাজেডী ঘটে যাবে চোখের উপর। প্রথমে কলকাতায়। তার পরে তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্ববঙ্গের যেকোন জায়গায়। খুব সম্ভব নোয়াখালীতেই আবার। মালার জন্যে অস্থির বোধ করি। মুসলমানরা যে তাকে ছাড়তে চায় না এর মানে কি এই যে মালা তাদের হস্টেজ? তাকেই তারা নির্যাতন ও হত্যা করবে? হা ভগবান! কেমন করে ওকে নোয়াখালী থেকে পনেরোই আগষ্টের আগে টেনে বার করে আনি? বিপদের কথা শুনে ও যদি উলটে কঠিন হয়? যদি বলে, "বিপদ যদি আসে তা হলেই জানব যে মায়াপাহাড়ের পথে চলেছি। কোনো দিকে দৃক্পাত করব না। পিছন ফিরে তাকাব না। সোজা এগিয়ে যাব তীরের মতো। বীরের মতো।"

রাজেক হোসেন সাহেব একদিন আমাকে তার মর্মবেদনা জানালেন। তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে যাচ্ছেন। বললেন, "পশ্চিমবঙ্গ কবে থেকে বাংলা দেশ হলো? সে তো পাঠান মোগলদের আমলেই। সাত শ' বছর ধরে যাকে আমরা সৃষ্টি করেছি, পালন করেছি, ঐক্য দিয়েছি, নাম দিয়েছি তাকেই তোমরা আজ কলমের এক খোঁচায় দু'খানা করে দিলে। পাকিস্তানের এতদিন কোনো যৌক্তিকতা ছিল না। এখন হলো।"

আমরা দু'খানা করে দিয়েছি! তার মানে আমিও! "না, স্যার," আমি প্রতিবাদ করে বলি, "আমি এর মধ্যে নেই। সারা ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, এই তথ্যটাই একদল ভারতীয়ের বরদাস্ত হলো না। তেমনি বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু এ তথ্যটাও একদল বাঙালীর সহ্য হলো না। তথ্য দুটোকে উলটিয়ে দিতে না পেরে তারা তথ্য থেকে পলায়নের পন্থা খুঁজে বার করল। ক্রমশঃ এক খোঁচায় ভারত হলো দু'খানা। সেই একই খোঁচায় বাংলাদেশও দু'খানা হলো। কলমের খোঁচায় হয়েছে বলেই রক্ষা। নয়তো তলোয়ারের খোঁচায় হতো। হতোই এটা ধ্রুব।"

মেসোমশায়ের ইচ্ছা নয় যে রাজেনদারা পাঠান আমলের ভিটামাটি ছেড়ে পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। তা শুনে রাজেক হোসেন বলেন, "বাড়ীর মেয়েদেরও ইচ্ছা নয়। কলকাতার মতো স্বাধীনতা ঢাকায় কোথায়? বুলি আলাদা, খানা আলাদা। তবু যেতে হবে। হিন্দুস্থানে আমাদের অতীত আছে ভবিষ্যৎ নেই। আমরা অনধিকারী।"

মেসোমশায় যতই বোঝাতে যান কিছুতেই তিনি বোঝেন না। বলেন, "ওসব কে বিশ্বাস করে? ইণ্ডিয়া। সেকুলার ষ্টেট! তাই যদি হবে তো পনেরোই আগষ্ট আমাদের মেরে সাবাড় করার আয়োজন চলেছে কেন?"

মেসোমশায় জানতেন না। মাসিমা জানতেন। তা শুনে মেসোমশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। "ওহে, তোমরা এখানে মাইনরিটি, কিন্তু ওখানে মেজরিটি। আমি যে সর্বত্র মাইনরিটি। টুর্গেনিভের উপন্যাসে সুপারফ্লুয়াস ম্যান। ফালতো মানুষ। আমি তা হলে কোথায় যাই। আমার মনে হয় গান্ধীজীও এখন সুপারফ্লুয়াস ম্যান।"

কিছুদিন পরে গান্ধীজী কলকাতা এসে প্রমাণ করে দিলেন যে তিনি সুপারফ্লুয়াস নন। পাঞ্জাবের রক্তসিন্ধুর মতো রক্তগঙ্গা বাংলাদেশে যে বইল না এর কারণ নোয়াখালীতে ও কলকাতায় তাঁর শান্তিব্রত। মালারও এতে সামান্য কিছু হাত ছিল। পনেরোই আগষ্ট হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান মাতালের মতো কোলাকুলি করে। আমি তো অবাক। আরেক দিন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল যখন একদল হিন্দু যুবক গিয়ে মহাত্মার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করল।

পনেরোই রাত্রে মাসিমার ওখানে ছোটখাটো একটি ব্যাঙ্কেট। তাঁর বাড়ী তিনি এবার নিষ্কণ্টক হয়ে ভোগ করতে পারবেন। এ যেন দ্বিতীয়বার গৃহপ্রবেশ। তফাতের মধ্যে একজনও মুসলমান অতিথি নেই। নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তারাই আসেননি। তার চেয়েও বড় তফাৎ: মালা নেই। তার অনুপস্থিতিটা সকলের চোখে বাজছিল।

মেসোমশায় স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। নিশ্চল পাষাণমূর্তি। সকলে একে একে বিদায় নিলে আমার প্রণাম নিয়ে বললেন, "এই দিনটির জন্যে সারা জীবন ধৈর্য ধরেছি। বেঁচে আছি বলে আমি ধন্য। ইন্দ্রত্বের জন্যে তপস্যা করিনি। ইন্দ্র যারা হতে চায় তারা হোক। আমি তপস্যা করেই মুক্ত। হাঁ একটা মুক্তির স্বাদ আজ পাচ্ছি। আমার দেশ আজ মুক্ত। আমার দেশবাসী মুক্ত। তা হলে এই আনন্দের দিনে প্রাণভরে আনন্দ করতে বাধছে কেন? দেশ ভেঙে গেছে বলে কি? আবার জোড়া লাগতে কতক্ষণ? জুড়তে চাইলে ইংরেজ কি বাধা দিতে আসছে? কিন্তু গায়ের জোরে জোড়া দেওয়া চলবে না। দিতে হবে প্রেমের জোরে। তেমন জোরালো প্রেম আজ তুমি ক'জনের মধ্যে দেখলে? কোলাকুলিকেই প্রেম বলে ভ্রম হতে পারে। সে ভ্রম ভাঙতে কতক্ষণ? প্রেম দিতে হলে প্রাণ দিতে হয়।"

পরিস্থিতি আবার অবনতির দিকে গেল। ভেবেছিলুম লড়াই থেমে গেছে। একটুও না। পাঞ্জাবের খবর থেকে বোঝা গেল সমুদ্রমন্থনে শুধু অমৃত ওঠেনি, গরলও উঠেছে। এবং গরলেরই পরিমাণ বেশী। কে ওই বিষ কণ্ঠে ধারণ করবে? নীলকণ্ঠ হবে? দেবতারা সবাই তো সুধাপানে নিবিষ্ট। সে ওই গান্ধীজী। ভারতের ভাগ্য ভালো যে হলাহল পান করার জন্যে শিবও রয়েছেন।

শচীন মিত্র ও স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন শহীদ হন সেদিন চোখভরা জল নিয়ে মেসোমশায়ের কাছে ছুটে যাই। কথা বলতে গিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদি। তিনিও শোকে অভিভূত। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন নীরবে। তার পর ধীরে ধীরে বলেন, "ওরাই আমার অরুণ বরুণ। আমি ধন্য। আমি ধন্য। আমি কৃতার্থ।"

অরুণ বরুণের পর তো কিরণমালা? মালাও কি এমনি করে আমাদের ছেড়ে যাবে? আমি চোখের জল রোধ করতে পারিনে। তিনি মনে করেন ওটা অরুণ বরুণের জন্যেই। আমিও গোপন করি। মালার জন্যে প্রাণটা হায় হায় করে ওঠে।

যা ভয় করেছিলুম তাই। মালা লিখেছে তার মাকে, "নোয়াখালী থেকে লাহোর যাচ্ছি। পথে একদিনের জন্যে কলকাতায় নামব! ভেবো না। বাবাকে দেখো। আমার সঙ্গে নির্মলদা যাচ্ছেন।"

রোদে ঝলসানো খসখসে মলিন মূর্তি। কোনো এক আধুনিক ভাস্করের হাতে গড়া। চুলে তেল পড়েনি কতকাল। গায়ে সাবান লাগেনি। স্নো পাউডার তো দূরের কথা। পায়ের পাতা ফেটে চৌচির। স্থলে স্থলে ক্ষতচিহ্ন। খালি পায়ে হাঁটা হয়েছে বোঝা যায়। খোস পাঁচড়ারও দাগ ছিল সেরে যাওয়ার পরেও।

মালার মা মেয়েকে দেখে থ। রুদ্র রূপ ধরে বললেন, "আমিও গান্ধীর মতো আমরণ অনশন করতে জানি। দেখি তুমি কেমন করে লাহোর যাও।"

তিনি সত্যি সত্যি খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তা দেখে মেসোমশায়কেও একাদশী করতে হলো। তিথিটা যদিও সপ্তমী কি অষ্টমী।

মাসিমা বললেন, "আমি ঢের সহ্য করেছি। আর না। আমারি ভুল হয়েছিল তোমাকে মনোরমার সঙ্গে নোয়াখালী যেতে দেওয়া। ভেবেছিলুম দিন কয়েকের মধ্যে ঘুরে আসবে। তুমি যা করেছ আর কোনো মেয়ে আর কোনো দিন তা করেনি। আর কোনো মা তা করতে দেয়নি। ইংরেজের গাফিলতির দায় তোমাকে বইতে হবে কেন? আমরা কি ট্যাক্স জোগাইনি যে তার বদলে বেগার দেব আর প্রাণে মরব? মেয়েদের তারও বাড়া বিপদ আছে। যমের হাত থেকে না হয় বাঁচলে। কিন্তু নরপশুর কবল থেকে? বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! জানো না সতীর দেশের মেয়ে তুমি?"

মালা নিরুত্তর। তার মা তাকে তালাবন্ধ না করেও যা করলেন তা একরকম তাই। অনশনেরও সেই একই ফল হলো। মালা কলকাতায় থামল।

আর নির্মল? সেও বেঁচে গেল মালার জন্যে ভাবনা থেকে। তার প্রয়োজন ফুরিয়েছিল। সে এলাহাবাদ ফিরে গেল। যাবার সময় আমাকে বলে গেল, "যত রটেছে তত ঘটেনি। তবু যা ঘটেছে তা সাংঘাতিক। এখন না ঘটলে পরে ঘটতই। তখন আমরা তাকে বলতুম শ্রেণীসংঘর্ষ। একদিকে শতকরা আশিজন চাষী, অন্যদিকে শতকরা আশিভাগ জমি। কায়েদ আজমকে ধন্যবাদ যে তিনি সেটাকে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়ে বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করতে দিলেন না। এর ফলে হয়তো শ্রেণী সংগ্রামের মাজা ভেঙে গেল। হিন্দু মুসলমান চাষী একজোট হয়ে আর কোনো দিন লড়তে পারবে বলে মনে হয় না। লড়তে গেলে কোমরে জোর পাবে না। একদিন অনুতাপ করতে হবে।"

এক বছরের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ত্রিশ বছরের কাজ মাটি করে দিয়ে গেল। রুশ বিপ্লবের পরবর্তী ত্রিশ বছরের ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিয়ে গেল। শ্রমিক কৃষকদের দিক থেকে এই। আর জাতীয়তাবাদীদের দিক থেকে? সেদিক থেকে জাতির অঙ্গহানি। আর অহিংসবাদীদের দিক থেকে? সেদিক থেকে স্বয়ং গান্ধীজীরই মোহভঙ্গ। জনগণ প্রস্তুত নয়। [ক্রমশঃ]

মাইকেল মধুসূদন ও আধুনিক যুগ

নারায়ণ চৌধুরী

আধুনিক কালে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বিশেষভাবে স্মরণ করবার প্রয়োজন আছে। এক দিক্‌ দিয়ে দেখতে গেলে মাইকেলের যুগ আর বর্তমান যুগের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মাইকেল একান্তভাবেই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার মানস-সন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে মাতৃভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু-ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর বিতৃষ্ণা ছিল। বিদেশী জীবনাদর্শের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যের বশে মাতৃভাষাকে ভোলবার চেষ্টা তিনি কম করেন নি। তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্য রচনা করে যশস্বী হবার চেষ্টা করেছিলেন শুধু তাই নয়, ইংরেজ কবিকুলে তাঁর স্থান হবে এমন দুরাশাও তাঁর ছিল। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার মধ্যে যেমন স্বপ্নভঙ্গের গভীর বেদনা আছে, তেমনি আছে নূতন সম্ভাবনার দিগন্তের উন্মোচন। প্রবল নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বিদেশী ভাষায় আত্মপ্রকাশের মোহ থেকে বিচ্যুত হয়ে মাতৃভাষার কক্ষপথে সবেগে ছিটকে এসে পড়েছিলেন। তারপর চার বৎসর (১৮৫৮-৬২) একটানা চলে তাঁর মাতৃভাষায় একাগ্র অনুশীলন, এই সময়ে তিনি সাহিত্যচর্চায় ডুবে ছিলেন বললেও চলে। কিন্তু তার পরেই আবার বিদেশীয়ানার মোহ এবং আত্যন্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাড়না তাঁর জীবনে দুর্নিবার হয়ে ওঠে এবং সেই তাড়নায় তিনি দেশজ সংস্কার ও জাতীয় সংস্কৃতির নৈকট্য-চেতনা থেকে পুনরায় স্খলিত হয়ে পড়েন। তার পরের ইতিহাস অতীব করুণ, মর্মান্তিক। মধুসূদনের জীবন-নাট্যের নিতান্ত বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি দোটানার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এক চিত্তের অনিবার্য নিমর্ম পরিণাম। দুই প্রান্তীয় বা বিপরীত প্রবৃত্তির সংঘর্ষে মানুষের জীবনে এরকম দুর্দৈবই সচরাচর ঘটে থাকে। এমনকি অমিত শক্তির অধিকারী হয়েও বোধ হয় এমনতর পরিণাম এড়ানো যায় না। শক্তি কেন্দ্রবিচ্যুত হলে তার ফল কত মারাত্মক হতে পারে মধুসূদনের জীবনেতিহাস তার প্রমাণ।

মনে হয় এই রকমের একটি দোটানার দ্বন্দ্ব, অপেক্ষাকৃত অনুগ্রভাবে, আধুনিক যুগেও চলছে। মধুসূদন ডিরোজিও-রিচার্ডসনের শিক্ষায় দীক্ষিত হিন্দু কলেজের যে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন, সেই গোষ্ঠীর মূল ঝোঁকটি ছিল সম্পূর্ণ জাতীয়তাবিরোধী ও একান্তভাবে বিদেশাভিমুখী। এখনকার মানসিকতায় এরকম সাংঘাতিক একদেশদর্শিতা নেই বটে, তাই বলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের প্রতি মোহ যে আমাদের ঘুচেছে এমন মনে হয় না। সত্যি কথা বলতে কি, পাশ্চাত্ত্য আদর্শ এখনও পর্যন্ত আমাদের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করছে। আমাদের চলায় বলায় আচরণে জীবনযাপন পদ্ধতিতে কর্মজীবনে সমাজ জীবনের নানাবিধ উৎসবে অনুষ্ঠানে ব্যবসায়-বাণিজ্যে শাসন-পরিচালনায়—সর্বত্র পাশ্চাত্ত্য প্রভাব অতি স্পষ্ট। আমরা জাতীয়তার সংগ্রাম করেছি বিজাতীয় পদ্ধতিতে, আমাদের মধ্যে সর্বভারতীয়ত্বের চেতনা ও ঐক্যবোধ এসেছে ইংরেজী শিক্ষার খাত বেয়ে, এমন কি খোদ্‌ জাতীয়তা বা 'ন্যাশনালিজম্‌' বস্তুটিই পেয়েছি ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সংস্পর্শজনিত প্রভাবের ফলে। আমাদের পোশাক-আশাক আহার-বিহার

সব কিছুর উপর বিদেশী প্রভাব মুদ্রিত রয়েছে। আমাদের আধুনিক সাহিত্য একান্তভাবেই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতি ও সংঘাতের ফল।

স্বাধীনতা পাওয়ার পরে অবশ্য মুক্তিবোধের উল্লাসে দেশজ শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি একটা অভিনব উৎসাহ ও অনুরাগের সঞ্চার হয়েছে দেশবাসীর মনে, কিন্তু এই উৎসাহ পুরোপুরি স্বাভাবিক মনে হয় না। আমরা এখনও তলায় তলায় প্রবলভাবে বিদেশী ভাবধারার অধীন। অথচ বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করছি, ব্যক্তিগত স্তরে ও জাতীয় স্তরে উভয়তঃ অস্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির জন্য আমাদের আরও বেশী করে জাতীয়তার গহনে প্রবেশের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে যা অনুভব করা যায় তা-ই যে সব সময় কাজে খাটানো যায় তা নয়। বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে বুদ্ধিগত বিশ্বাস কাজে খাটানোর পথে সর্বপ্রধান বাধা হচ্ছে আমাদের গত দেড়শো বছরের সংস্কৃতির বিশেষ 'প্যাটার্ন'। এই প্যাটার্ন প্রায় সবটাই পশ্চিমী। আমরা মুখে বলি বটে রামমোহনের সময় থেকে বাংলা দেশে যে বিশেষ শিক্ষাদর্শ সমাজাদর্শ জীবনাচরণ-পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছে তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয় হয়েছে। কিন্তু এ কথা বোধ হয় পুরাপুরি ঠিক নয়। আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে রামমোহনের নাম করি বিদ্যাসাগরের নাম করি মাইকেল মধুসূদনের নাম করি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম করি। কিন্তু এঁদের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর কেউই বোধ করি সর্বাঙ্গীণ ও সার্থক সমন্বয়ের গৌরব দাবি করতে পারেন না। রামমোহন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা, ভারতীয় জীবনে পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের বাণীবাহক একাধিক সংস্কারের প্রবর্তক, প্রাচ্য জ্ঞান ও পাশ্চাত্ত্য ভোগ অর্থাৎ 'ভুক্তি-মুক্তি' আদর্শের তিনিই প্রচারক কিন্তু প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলতে যা বোঝায় তার দৃষ্টান্ত বোধহয় তিনি নন। রামমোহন সমন্বয়ের পথপ্রদর্শক, পথের গন্তব্যে উপনীত নন। বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্ত্যের ভাব দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর মনের গঠন ও সংস্কার একান্তভাবে স্বদেশীয়। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য ভাবুকতায় ওতপ্রোত হয়ে ছিলেন, মাত্র জীবনের কয়েক বৎসর তাঁর চিন্তা ও কল্পনার পার্শ্ব-পরিবর্তন ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নব-হিন্দুত্বের প্রচারক হলেও যে র‍্যাশনালিজমের ভিত্তির উপর তিনি হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সেই র‍্যাশনালিজমের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও দর্শনচর্চার সূত্র থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র শিক্ষার ভিত্‌টাই ছিল পাশ্চাত্ত্য, এদেশের লোক-সংস্কৃতি বা গ্রামীণ সংস্কৃতির মাটিতে তাঁর মনের শিকড় খুব বেশীদূর ছড়ানো ছিল না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, নূতন ও পুরাতনের সার্থক সমন্বয়ের উদাহরণ প্রত্যক্ষ করি। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ভাবধারায় নিস্নাত হয়ে তাঁর সাহিত্য ও কাব্যকে এক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা মণ্ডিত করে তুলেছিলেন। রামমোহনের প্রবর্তিত সমন্বয় রবীন্দ্রনাথে এসে তার চূড়ান্ত সার্থকতা প্রাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু সমসাময়িক কালে এই সমন্বয়ের ধারা দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবেই ব্যাহত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য আদর্শ পুনরায় প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে পাশ্চাত্ত্য আদর্শেরই আধিপত্য দেখতে পাই। সত্যিকার জাতীয়তায় প্রত্যাবর্তনে আমাদের যে আগ্রহ নেই তা নয়, কিন্তু দীর্ঘকালীন পাশ্চাত্ত্যমুখীনতার ফলে বিজাতীয় রীতিনীতি ও অভ্যাস আমাদের মধ্যে এমনই বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে চেষ্টা করলেই তা থেকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া যায় না। মধুসূদনের কালে যেমন, একালেও তেমনি আমরা ঘড়ির দোলকের মত দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার মধ্যে ক্রমাগত দোল খেয়ে ফিরছি—কখনও জাতীয় সংস্কার, মাতৃভাষা ও সাহিত্য, প্রাচ্য জীবনাদর্শ আমাদের মনোহরণ করছে, কখনও তার প্রতিক্রিয়ায় একেবারে বিপরীত প্রান্তে গিয়ে উপনীত হচ্ছি এবং পাশ্চাত্ত্য আদর্শকেই জীবনের একমাত্র সার বলে

জানছি। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের বর্তমান অবস্থায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবটাই আমাদের মনের উপর সমধিক বলবৎ দেখতে পাচ্ছি। চারদিকের হালচাল আমাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিচ্ছে যে, মনের দিক দিয়ে জাতীয় চৈতন্যের জগতে বাস করা চললেও চলতে পারে, কিন্তু বাইরের ব্যবহারে অর্থাৎ পোশাকে-আশাকে ভাষায় ও ভঙ্গীতে পাশ্চাত্ত্য ধরণধারণটাই সমধিক গ্রহণীয়। মনের জগত লোকচক্ষুর অগোচর—সেখানে জাতীয় ভাবের লীলা চলুক, কিন্তু বাইরে আমাদের ব্যবহার ও অভ্যাস আধুনিক কেতাদুরস্ত হওয়া চাই, আধুনিক জীবনমানোপযোগী হওয়া চাই। ভোগসুখের প্রতি আমাদের মনে যে স্বাভাবিক মোহ রয়েছে তা-ই আমাদেরকে বারে বারে পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রার অভিমুখে সবলে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। মনোজীবন আর বহির্জীবনের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব, এই যে ব্যবধান—এই হল আধুনিক মানুষের মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য আর এ-ই তার নিয়তি। এ বৈশিষ্ট্য এবং এ নিয়তি মধুসূদনের অন্তসংঘাতময় বিরুদ্ধ ভাবদ্বন্দ্বপ্রপীড়িত জীবনভঙ্গীর কথা প্রবলভাবে মনে করিয়ে দেয়।

২

মধুসূদনের যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সৌসাদৃশ্যের কথা কতকটা সবিস্তারে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। এবারে মধুসূদনের জীবন ও কাব্যের মধ্যে প্রবেশ করে তার থেকে যে শিক্ষা ও সংকেত আমরা পাই, এখনকার কালের পক্ষে তার কোন তাৎপর্য রয়েছে কিনা সেটি নিরূপণ করবার চেষ্টা করব। মধুসূদনের জীবন দিয়ে এই পর্যালোচনা শুরু হোক।

মাইকেল মধুসূদন

এ কথা সর্বসাধারণের পরিজ্ঞাত যে, মধুসূদনের সাংসারিক জীবন ব্যর্থ হয়েছিল। নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁর কাব্যজীবন স্বল্পস্থায়ী কিন্তু প্রতিভার উজ্জ্বল বিভায় দীপ্ত। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি যেন আকস্মিক প্রেরণার তাড়নায় উল্কার ঔজ্জ্বল্য নিয়ে সহসা প্রবেশ করেছিলেন এবং উল্কার মতই কিছুক্ষণ চোখ-ধাঁধানো আলো ছড়িয়ে তারপরেই ফুৎকারে নিবে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। কাব্য-গগনে যা সাময়িক প্রখর আলোক-বিচ্ছুরণ রূপে প্রকাশ পেয়েছিল,তা-ই সাংসারিক ক্ষেত্রে দগ্ধাবশেষ অঙ্গারে পরিণত হয়ে প্রচণ্ড দুঃখকষ্টের সৃষ্টি করে-ছিল। মধুসূদনের কাব্যজীবন যে-পরিমাণে সার্থক ঠিক সেই পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিজীবন ব্যর্থ। ব্যক্তি-জীবন বলতে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কেন্দ্রিক পারিবারিক জীবনকেও বোঝাচ্ছে। এই ব্যর্থতার কারণ মধুসূদনের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাঁর সাংসারিক বুদ্ধি অকিঞ্চিৎকর ছিল। তিনি সর্বদা স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতেন। প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তিনি

অনেক সময় অলীক আকাশ-কুসুম রচনাতেও সময় ব্যয় করতেন। অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা একাধিক চিঠিতে তিনি তাঁর এই দিবাস্বপ্ন-বিলাসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাত্যহিক জীবনে যে বুদ্ধির বলে সাংসারিক মানুষ সচরাচর চলে, তেমন বুদ্ধির তিনি ধার ধারতেন না। সাংসারিক সেয়ানা বুদ্ধির আনুগত্য করবার জন্য মধুসূদনের সৃষ্টি হয় নি। এটি তাঁর জীবনমহিমারই দ্যোতক। তিনি সতত কাব্যকাননে বীণাবাদনে নিরত থাকতে পারলেই তৃপ্ত। তাঁর এই মনোভাবটি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র "সাংসারিক জ্ঞান" নামক সনেটে চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে—

কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?···

*　　*　　*

কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি?
উদাসীন দশা তার সদা জীব-পুরে,
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি!"

সুতরাং বলতে পারা যায়, একপ্রকার স্বেচ্ছাক্রমেই, অন্তর্তাগিদের অনিবার্য টানেই তিনি সংসার-সুখ থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে একান্ত অনিশ্চিত ঘাত-সংঘাতময় জীবনের বিড়ম্বনার মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর কাব্য যেমন নাটকীয়তার উপাদানে ভরা তেমনি তাঁর জীবনও নাট্যভাবে সমৃদ্ধ। বস্তুত: তাঁর গোটা জীবনটাই একটা মহানাটক। গভীর অহং চেতনা এই নাটকের মূল ভাব, আর আজন্ম বিদ্রোহী মনোভঙ্গী ও অমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার দুই স্থায়ী বিভাব। মধুসূদনের অহং চেতনার সঙ্গে আভিজাত্যচেতনা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল। যা কিছু সাধারণ মামুলী গতানুগতিক, তার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার অন্ত ছিল না। ধর্মীয় প্রেরণার আন্তরিকতার বশে তিনি খৃষ্টধর্ম অবলম্বন করেছিলেন তা নয়, তিনি ক্রিশ্চিয়ান হয়েছিলেন স্বজাতির ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তাঁর বিমুখতা ও বৈরিতা প্রদর্শনের জন্য। রামচন্দ্র আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের তিনি পছন্দ করেন না ("I hate Ram and his rabble"), তাই বিপরীত জীবনাদর্শের প্রতীক রাবণ ও ইন্দ্রজিৎকে বড় করে দেখানোর তাঁর প্রয়োজন ছিল। রাবণের রাজকীয় মহিমা ও আড়ম্বর এবং ইন্দ্রজিতের শৌর্য তাঁর কল্পনাকে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করেছে। সেই তুলনায় রাম-লক্ষ্মণ বহু গুণাবলীর অধিকারী হয়েও তাঁর চোখে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। মধুসূদন স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি গভীর প্রত্যয়ের বশে—সে প্রত্যয়ের সঙ্গে, বলা নিষ্প্রয়োজন, আত্মাদর অনেকখানি মেশানো ছিল—আজীবন বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর দ্বারা চালিত হয়েছেন। এই বিদ্রোহী মনোভঙ্গীরই মূল্যবান ফসল হল—বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, বাংলায় প্রথম বিয়োগান্ত নাটক ('কৃষ্ণকুমারী নাটক') ও প্রথম প্রহসন সৃষ্টি ('একেই কি বলে সভ্যতা?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ') এবং সনেট নির্মাণ ('চতুর্দশপদী কবিতাবলী')। মধুসূদনের কাব্যবৈশিষ্ট্য ছেড়ে দিলেও একমাত্র এই চতুর্বিধ অভিনবত্ব-প্রয়াসের জন্যই

তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকা উচিত। এ সবই অন্তর্সঞ্চিত বিদ্রোহী বহ্নিস্ফুলিঙ্গের বহির্প্রকাশ, নিছক অভিনবত্বের জন্য অভিনবত্বের অবতারণা নয়। তিনি যে সংস্কৃত কবিদের আদর্শ অনুসরণ না করে হোমার, ভার্জিল, ট্যাসো ও মিল্টনের আদর্শে তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্য'কে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন তার মূলে শুধুই পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল কাব্যপ্রীতি ছিল না, ছিল গতানুগতিকের প্রতি গভীর বিরাগ। সকলে যে পথ অনুসরণ করে সে পথ মধুসূদনের জন্য নয়—এই ছিল তাঁর মনোভঙ্গী। এই মনোভাব অবশ্য নীতিগত ভাবে সমর্থনীয় নয়, কিন্তু মধুসূদন যা নিজের সম্পর্কে ভাবতেন তা অনেকাংশে কার্যতঃও সত্য ছিল। কাব্যের জ্ঞান এবং বৈদগ্ধ্যের বিচারে তৎকালে তাঁর তুল্য বিদ্বান ব্যক্তি বাংলাদেশে আরকেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিস্বভাবেও কোনরূপ নীচতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। তিনি তা জানতেন এবং তা প্রকাশেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। বৈষ্ণব বিনয় তাঁর ধাতে ছিল না। তাঁর মন একান্তভাবেই পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা কর্ষিত ছিল ব'লে আত্মবৈশিষ্ট্যকে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। মধুসূদনের ব্যক্তিত্বের এই যে আত্যন্তিক প্রত্যয়শীলতা, এই যে অহং-কেন্দ্রিকতা—এ একেবারেই পাশ্চাত্য মনোভঙ্গীর প্রভাবজাত ফল। সদৃশ মনোভঙ্গী এ-দেশীয় শিক্ষায় উপজাত হবার কথা নয়, হয়ও না। বরং উল্টোটাই হয়। প্রাচ্য জ্ঞান মানুষের নম্রতা ও বিনয় বাড়ায়। এ দুটি মনোভঙ্গীর মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রাচ্যের আদর্শটি অধিক শ্রেয়, তবে পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণটির সপক্ষেও যে কিছু বলা যায় না এমন নয়। মধুসূদনের চরিত্রে যে অকপটতা ও মহানুভবতা আমরা লক্ষ্য করি তার মূল তাঁর ওই পাশ্চাত্য শিক্ষিত জনসুলভ আত্যন্তিক অহং-চেতনার মধ্যেই প্রোথিত রয়েছে বলে মনে হয়। সত্য বটে তাঁর আত্যন্তিক অহং-চেতনা তাঁর বিবেচনা-শক্তিকে অনেকখানি পরিমাণে পঙ্গু করে রেখেছিল—কি জীবনে কি কাব্যে কোথাও তিনি সুস্থির বিবেচনা-শক্তির পরিচয় দিয়ে যেতে পারেন নি—এবং তাঁর স্বভাবে যে impulsiveness বা ভাবোদ্বেলতা লক্ষ্য করা যায় তারও মূলে যে তাঁর ওই 'অহং' (ego) সে কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এই সত্য আমরা কেমন করে বিস্মৃত হই যে, মধুসূদনের অহং-চেতনাই তাঁর সকল সৃষ্টিশীল বিদ্রোহের মূলে ক্রিয়াশীল রয়েছে? তিনি যদি অহং-ভাবান্বিত না হতেন তা হলে বাংলা সাহিত্য চার-চারটে মূল্যবান এবং বহুদূর-প্রসারীফলসম্ভাবনাযুক্ত অভিনবত্ব-প্রয়াসের দ্বারা বোধ হয় সমৃদ্ধও হতে পারত না। মনে রাখতে হবে ইউরোপীয় ছাঁদে লেখা প্রথম বাংলা নাটক 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৮) তিনি রচনা করেছিলেন অনেকটা বন্ধু গৌরদাস বসাকের কথার উত্তরে বাজীর মনোভাব নিয়ে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ রচনা 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৬০)-ও একই মনোভাব প্রসূত। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের একটি নঞর্থক উক্তির পাল্টা জবাব হিসাবে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনা করে তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন বাংলায় Blank Verse-এ সার্থক কাব্য রচনা সম্ভব। তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' (১৮৬১) বা প্রহসনদ্বয় (১৮৬০) বা পরবর্তী 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) তিনি ঠিক বাজীর মনোভাব থেকে রচনা করেন নি বটে, তবে বাংলায় ইউরোপীয় ধাঁচের বিয়োগান্ত নাটক ও প্রহসন সৃষ্টি এবং সনেট নির্মাণের পিছনে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা সর্বাংশে সক্রিয় ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মধুসূদন আজন্ম-বিদ্রোহী ছিলেন। মূর্তি-ভাঙায় তাঁর সহজ উল্লাস ছিল বলে মনে হয়। বস্তুতঃ তিনি যদি সংসার-জীবনের হাতে ঠেকে না শিখতেন, সমাজের রূঢ় বাস্তব তাঁর জীবনের পথে যদি নানাবিধ বাধা-বিপত্তি উপস্থাপিত না করত, তা হলে তাঁর কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি কোথায় গিয়ে যে শেষ হত বলা দুষ্কর। তাঁর স্বভাবে গূঢ়সঞ্চিত তীব্র জ্বালাময় বিদ্রোহী আগুন বাধাবন্ধহীন

ভাবে আপনাকে জালিয়ে পুড়িয়ে ক্ষয় করে একদিন হয়ত দপ্‌ করে নিবে গিয়ে নিংশেষে ফুরিয়ে যেত। মধুসূদনের প্রবৃত্তিকে বাধা দিতে পারে এমন প্রতিবন্ধক তাঁর ভাবজীবনে ছিল না,—তিনি বাধাকে বাধা বলেই মনে করতেন না—; একমাত্র সাংসারিক খাতে নানাবিধ নিগ্রহ লাঞ্ছনা দুর্গতি সহ্য করে তবে তিনি খানিকটা আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। তবে এই চৈতন্যোদ্রেকও সাময়িক এবং ক্ষণিক, তাঁর মোহাবেশ চিরতরে ঘুচিয়ে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট জোরালো ছিল না। সংসার জীবনের হাতে দুঃখ-কষ্ট আর লাঞ্ছনার মার খেয়ে তাঁর অমিতাচার আর অদম্য বাসনা ক্ষণকালের জন্য প্রতিহত হয়েছে, আবার দুর্গতির মেঘ কেটে যেতেই মধুসূদনের স্ব-স্বভাব প্রকট হয়ে উঠেছে—তিনি পূর্বে যা ছিলেন তা-ই হয়েছেন। মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' সাময়িক বিলাপ মাত্র। এ মোহভঙ্গ স্থায়ী হয় নি।

মধুসূদন-চরিত্রের এই হল কাঠামো। এ কাঠামোর সঙ্গে আজকের দিনের মানুষের মানসিক কাঠামোর মিল আছে। আমি পূর্বে যে দোদুল্যমানতার উল্লেখ করেছি সেই দোদুল্যমানতা যেমন মধুসূদনের স্বভাবে তেমনি একালীন মানুষের স্বভাবেও একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। আমরা এ কালের মানুষ কেন্দ্রবিচ্যুত হয়ে পড়েছি। আমাদের মানসিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। কখনও আমরা প্রাচ্য জ্ঞানের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তদনুযায়ী জীবন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি, কখনও পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদের দ্বারা বিমোহিত হয়ে তারই পাদমূলে জীবন সঁপে দিচ্ছি। আমাদের বর্তমান জীবনচর্যার ধারা-ধরণটাই এমন যে তা আমাদের পাশ্চাত্ত্য ভোগবাদের দিকেই সমধিক টানছে। ভোগের পায়ে আমরা দাসখৎ লিখে দিয়েছি বললেও চলে। কোন সুস্থির প্রত্যয়ই আজ আর আমাদের মনের আকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় শোভমান নেই, আমরা প্রত্যয় থেকে প্রত্যয়ান্তরের অন্ধকারে কেবলই পথ হাতড়ে ফিরছি। মধুসূদন তাঁর জীবনের কেন্দ্রে সাময়িকভাবে অধিষ্ঠিত না হয়ে সকল সময়ের জন্য সুস্থিত হতে পারলে কত ভাবে যে জাতীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন তা আর বলে শেষ করা যায় না। আমরাও যদি আমাদের জীবনের কেন্দ্রে ফিরে যেতে পারতাম তা হলে একালের ক্ষুদ্রশক্তি মানুষ আমরা, আমাদের দ্বারাও অনেক কাজ হতে পারত বোধ হয়। কিন্তু সে সম্ভাবনা নিজেরাই আমরা স্বীয় জীবনভঙ্গির দ্বারা খণ্ডিত করে ফেলেছি। আমাদের চৈতন্যোদ্রেক হবে কবে?

মধুসূদনের জীবনে আত্মবিলাপের আন্তরিকতা যে স্থায়ী হয় নি তার একাধিক প্রমাণ আছে। তাঁর 'আত্মবিলাপ' নামক প্রসিদ্ধ কবিতাটি তিনি রচনা করেন ১৮৬১ সনে। তখন তাঁর বয়স সাঁইত্রিশ বৎসর। এই বয়স প্রৌঢ়ত্বের সূচনাকাল। এই বয়সে মানুষের মনে মোটামুটি রকমের একটা ভারসাম্য দেখা দেয়। নানাবিধ অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জীবনের প্রায় মধ্যভাগে এসে মানুষ স্বীয় শক্তির সম্ভাবনা এবং অপূর্ণতার মোটামুটি একটা হিসাব পায় এবং পরিমাপন ক্রিয়ার সাহায্যে নিজের শক্তির দৌড় বুঝে ফেলে তদনুযায়ী উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে ছাঁটাই করতে সচেষ্ট হয়; পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে তখন সম্ভাব্য পরবর্তী অভিজ্ঞতার ছাঁচটুকু চিনে নেবার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। মধুসূদনের বেলায়ও এ নিয়ম সত্য হতে পারত, কিন্তু, পূর্বেই বলেছি, প্রচলিত নিয়মের মূর্তিমান ব্যতিক্রম রূপেই মধুসূদনের জীবনের সার্থকতা ও মূল্য। যে মধুসূদন আশাভঙ্গের গভীর মনস্তাপে ক্ষুব্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বলছেন—

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে!

নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী।
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি মন, কেমনে!

তিনিই আবার বৎসরখানেকের মধ্যে "বিষজ্বালা" বেমালুম ভুলে গিয়ে রাতারাতি ধনী হবার আশায় ইংলণ্ডের জাহাজে চাপছেন! রইল পড়ে চার বছরের একটানা কাব্যসাধনার আবেগ, কাব্যখ্যাতির দ্বারা তিনি সমাজে যে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান অর্জন করেছিলেন তা শিকায় তোলা রইল—পতঙ্গ যে রঙ্গে জ্বলন্ত পাবক-শিখায় পানে ছুটে চলে, তিনিও ঠিক তেমনি রঙ্গে ব্যারিস্টারির আলেয়ার পিছনে ছুটলেন। কি না? দেশে ফিরে এসে একজন ধনাঢ্য ও মানী ব্যক্তিরূপে সমাজে পরিচিত হওয়ার জন্য। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস আর এই পরিহাস একান্তভাবেই মধুসূদনের পাওনা ছিল। এরকম পরিণতি মধুসূদনেরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত। ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাসে পড়েছি আঠারো শতকের ফরাসী লেখকেরা লেখক হওয়াটাকে খুব বড় কৃতিত্ব বলে মনে করতেন না, লেখক-জীবনের সাফল্য, ওটা ছিল ওঁদের হাতের পাঁচ; কী করে বনেদী চাল বনেদী জৌলুষ আরও বাড়ানো যায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে সমাজের মান্যমানতা পাওয়া যায় তা-ই ছিল ওঁদের ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা। উনিশ শতকীয় ব্যলজাকের জীবন থেকেও আমরা একই তথ্য আহরণ করি।

এও ঠিক সেই ব্যাপার। কবিকুলচূড়ামণি রূপে দেশ যাঁকে মাথায় করে নিয়েছে, তিনি ছুটলেন কিনা আরও বেশী সাহেব সাজবার আশায় অসার এক ব্যারিস্টারী উপাধির তকমা গায়ে আঁটবার জন্য। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, মণিখণ্ড ফেলে দিয়ে আঁচলে কাঁচ বাঁধবার সাধনা একেই বলে। এই অপ্রস্তুের সাধনায় নিজেকে লিপ্ত করতে গিয়ে মধুসূদন নিজ জীবনে কী বিড়ম্বনা ডেকে এনেছিলেন সে ইতিহাস সকলেই জানেন।

আর একটি নজীরের উল্লেখ করব। মধুসূদন একবার গৌরদাস বসাককে লিখেছিলেন—

"There is nothing like cultivating and enriching our mother tongue···If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother tongue. That is his legitimate sphere, his proper element······Let those who feel that they have springs of fresh thought in them fly to their mother tongue....... Our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up."

মধুসূদনের বিখ্যাত সনেট "বঙ্গভাষা"র সঙ্গে এই কটি লাইন মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, মাতৃভাষার প্রতি এক সময়ে যেমনি তাঁর বিমুখতা ছিল তেমনি অন্য এক সময়ে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর মনে প্রবল সম্ভ্রমবোধ ও অনুরাগের সঞ্চার হয়। তাঁর সমৃদ্ধ কাব্যফসল শেষোক্ত সময়ের আবেগের দান। কিন্তু এই আবেগ তাঁর জীবনে স্থায়ী হয় নি। মাত্র চার-পাঁচ বৎসর তিনি প্রকৃত অর্থে সাহিত্যসাধনায় নিবিষ্ট ছিলেন, তার পরেই ভিন্নতর ও নিম্নতর আকর্ষণে সাহিত্যসাধনা থেকে স্খলিত হয়ে পড়েছিলেন। উদ্ধৃত চিঠিতে ও অন্যান্য রচনায় মাতৃভাষার প্রতি তিনি যে অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন তাতে এতটুকু ফাঁকি ও মেকী ছিল না।—মধুসূদনের চরিত্রে মেকীর জায়গা নেই—, কিন্তু কবির জীবন-নিয়তিটাই এমন যে কোন-একটি বিশেষ আবেগে বেশীদিন আবদ্ধ হয়ে থাকা তাঁর স্বভাবের বিরোধী ব্যাপার ছিল। যে প্রবল অধ্যবসায় ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রথম যৌবনে তিনি ইংরেজী কব্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই একই উদ্দীপনার বশে তিনি ইংরেজী কাব্যসাধনা ছেড়ে জীবনের প্রায়-মধ্যভাগে মাতৃভাষার সাধনায় তাঁর সবটুকু উদ্যম ও মনোযোগ

নিয়োগ করেছিলেন। আবার মন-মেজাজের আর একটি ফেরতায় সময়ে বহু যত্নে ও সাধনায় অর্জিত মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগকে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত পরিত্যাগ করে অসার বিত্তকৌলীন্যের ভজনায় আপনাকে ক্ষয় করতেও তাঁর বাধে নি। এই হলেন মধুসূদন, এবং মধুসূদনের স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্য না বুঝলে তাঁর কাব্যবৈশিষ্ট্যকেও ভাল করে বোঝা যাবে না। সাংসারিক মানদণ্ডে যা ছিল মধুসূদনের স্বভাবের অস্থিরতা ও অব্যবস্থিতচিত্ততা, তাই পরোক্ষে, এক হিসাবে দেখতে গেলে, তাঁর কাব্যরচনায় শক্তি জুগিয়েছে। উদ্দাম প্রকৃতি তাঁর কাব্যে, জীবনে। জীবনের পথে আকস্মিকতার ঝোঁকে দমকে দমকে তাঁর ছুটে চলা, তেমনি কাব্যসৃষ্টিতেও আকস্মিক প্রেরণার প্রাবল্যটাই বড় কথা। প্রেরণা যখন ফুরিয়েছে তখন রচনাও ফুরিয়েছে। কি জীবনে কি কাব্যে মধুসূদন কোথাও হিসাবী বুদ্ধির দ্বারা চালিত হন নি। সত্যিকারের শিল্পী মন ছিল তাঁর। কবির আত্যন্তিক শিল্পী সত্তা তাঁকে অনেক বিপাকে জড়িয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওইটি তাঁর শক্তিরও উৎস ছিল। তাঁর দুর্বলতা এবং বল একই সূত্র থেকে আহৃত হয়েছে। এ-জাতীয় প্রতিভার ধর্মই হল এই যে, ত স্বল্প সময়ের সীমার মধ্যে তীক্ষ্ণতম আলোক বিচ্ছুরিত করে; দীর্ঘ সময়ের ব্যাপ্তিতে আলোর রোশনাই ছড়িয়ে দেওয়া এরকম প্রতিভার কাজ নয়।

মধুসূদনের অমিতাচারের একটি নীতিগত শিক্ষা আছে বর্তমান যুগের পক্ষে। তা এই যে, শক্তি যতই অপরিমিত হোক এবং প্রাণপ্রাচুর্য যতই অশেষ হোক তা যদি সংযমবন্ধনের দ্বারা নিয়মিত না হয় তা হলে সে শক্তির প্রকাশ প্রতিহত হতে বাধ্য। মধুসূদনের বেলায় হয়েছিলও তা-ই। তাঁর জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি তাঁর অমিতাচার আর অবিমৃষ্যকারিতার ফল। কবি যদি নিজ জীবনকে সংযমের শাসনের দ্বারা উপযুক্তভাবে দমিত করতে পারতেন তা হলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পক্ষে তার ফল যে কত সুসমৃদ্ধ আর বৈচিত্র্যময় হতে পারত তা বলে শেষ করা যায় না। যে সামান্য কয় বছর তিনি কাব্যসাধনায় নিয়োজিত ছিলেন তাতেই বাংলা বাণীমালঞ্চ অজস্র পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত হয়ে উঠেছিল, তাঁর সাধনার কাল যদি আরও বিস্তৃত হত এবং তাঁর শক্তি যদি পরিপূর্ণভাবে এই সাধনায় নিয়োজিত হত তা হলে কী অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটতে পারত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে! এক মধুসূদনই তাঁর শক্তির দ্বারা বাংলা কাব্য-কাননকে নন্দন-কাননে পরিণত করতে পারতেন—দ্বিতীয় শক্তির প্রয়োজন হত না।

কিন্তু বলেছি, মধুসূদনের তেমন ধাতই ছিল না। হয় তিনি স্বল্পকালীন, নয় তিনি কোন কালের জন্যই নন। প্রথমতঃ তাঁর আত্যন্তিক শিল্পী স্বভাব তাঁর প্রতিভায় উদ্যমকে দীর্ঘকালে প্রসারিত করার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, দ্বিতীয়তঃ উনিশ শতকের শিল্পী জগতে প্রচলিত বোহেমীয় আদর্শের দ্বারাও তিনি কম প্রভাবিত হন নি। কবি ভারতীয় আদর্শের অনুগত ছিলেন না, তিনি একান্তভাবেই ইউরোপীয় আদর্শের প্রভাবাধীন ছিলেন। সেইটি তাঁকে আরও বেশী করে বোহেমীয় হবার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাছাড়া তাঁর গোটা কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষা-দীক্ষাও তাঁকে নিয়ন্ত্রণ-বল্গাহীন জীবনযাত্রার পথে আকর্ষণ করতে কম প্রভাব বিস্তার করে নি। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অর্জিত সংস্কার ও বিশ্বাস মধুসূদনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল বললেও চলে।

খুব সম্ভবতঃ মধুসূদনের বিমর্ষ দৃষ্টান্ত থেকে এ দেশের পরবর্তী কালের শিল্পীরা অপেক্ষাকৃত আত্মস্থ হবার প্রেরণা লাভ করেছেন। বোহেমীয় জীবন-যাত্রার আদর্শ এ কালের শিল্পী-মনে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তার উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত ওই ব্যাপারে একটা মস্ত বড় check বা নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। তিনি স্বীয় জীবনযাপন প্রণালীতে ইউরোপীয় আদর্শের অনুসরণ না

করে ভারতের প্রাচীন ঋষি কবিদের সংযমপূত জীবনের ধারা অনুসরণ করেছেন। বাল্মীকি ব্যাস প্রমুখ ভারতীয় কবি-ঋষিদের প্রজ্ঞা বোধি ও নিরাসক্তি এ যুগের কোন কবি যদি নিজ জীবনে সার্থকতমভাবে প্রতিফলিত করে থাকেন তো তিনি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনে হয়তো উল্কার ক্ষণিক তীব্র আলো-বিচ্ছুরণ চোখে পড়ে না, কিন্তু তাতে আমাদের আক্ষেপ করবার কারণ ঘটে নি, কেন না ওই আলো একটি বিশেষ মুহূর্তে বা বিন্দুতে সংহত না হয়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের পরিধির উপর সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাতে তাঁর গোটা জীবনটাই প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শিল্পীর জীবনাচরণের এইটিই হল ভারতীয় আদর্শ এবং এইটিই আমাদের পক্ষে গ্রহণীয়। আমাদের মহাভাগ্য যে, আমরা আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের ন্যায় এক পূর্ণ শিল্পীকে আমাদের মধ্যে পেয়েছিলাম। সংযমনিষ্ঠ আত্মস্থ অনাসক্ত শিল্পী রূপে তিনি আমাদের সমক্ষে এক ধ্রুব অনির্বাণ আলোকবর্তিকা স্বরূপ বিরাজ করেছেন। সর্ববিধ ভাবাকুলতা প্রবৃত্তিপ্রবণতা ও অহংবোধের সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ পথের পথিক তিনি। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের একেবারেই বিপরীত কোটির শিল্পী। মধুসূদনের জীবনচর্যার আদর্শ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের জীবনাচরণের আদর্শ এ যুগে সমধিক কার্যকরী হওয়ায় এ যুগের শিল্পীরা বেঁচে গেছেন। এমনিতেই এ যুগের শিল্পীদের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অমিতাচারের অন্ত নেই, তার উপর তাঁরা যদি মধুসূদনের জীবনাচরণের আদর্শটিও গ্রহণ করতেন তা হলে তাঁরা কোথায় এসে দাঁড়াতেন ভাবতেও আতঙ্ক হয়।

৩

এবার আমরা মধুসূদনের কাব্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করব। সংক্ষেপেই আলোচনা সারব, তার কারণ এ বিষয়ে ইতঃপূর্বে এত বেশী আলোচনা হয়ে গেছে যে কিছু মৌলিক বক্তব্য থাকলে তবেই সেটা উপস্থিত করবার ঝুঁকি নেওয়া চলে, নয়তো পুরনো আলোচনার উপর দাগা-বুলনো যে আলোচনা, সে রকম মামুলী কথার পুনরাবৃত্তির বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। মৌলিক কিছু বলতে পারব এমন আত্মশ্লাঘা আমার নেই সুতরাং অল্পতেই বক্তব্য নিবেদন করি।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী কবির তালিকায় জয়দেব গোস্বামীর পরেই মধুসূদনের স্থান নির্দেশ করেছেন। তিনি প্রসঙ্গতঃ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গোবিন্দদাস মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু সত্যিকার কবি বলতে জয়দেব গোস্বামীর পরেই মধুসূদনের উপর তিনি তাঁর সুনিশ্চিত পক্ষপাত ব্যক্ত করেছেন। এর কারণ কী? এর কারণ কি এই নয় যে এই দুই প্রধান কবিই নিজ নিজ পথে দুই বিশিষ্ট কাব্য-আন্দোলনের পথিকৃৎ? একজন সংস্কৃত কান্তমধুর ললিত পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত রচনা করে পরবর্তী বৈষ্ণব কবিদের অভ্যুদয় ও কাব্যপ্রেরণার পথ তৈরী করেছেন; অন্যজন বাংলা কাব্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে একাধিক ক্ষেত্রে নব রীতির প্রবর্তন করে আধুনিক কাব্যের পুরোধার গৌরব অর্জন করেছেন। প্রচলিত কাব্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে আধুনিক কাব্যের সূচনা আর এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কি আঙ্গিক ছন্দঃপ্রকরণ শব্দরীতি ভাষাব্যবহারের দিক দিয়ে কি ভাববস্তুর বিচারে মধুসূদন বাংলা কাব্যের প্রচলিত ধারার প্রতিকূলতা করেছিলেন। তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের পথিকৃৎ শুধু নন, তার দিঙ্‌নির্দেশক তার গতির সঞ্চালক। আধুনিক বাংলা কাব্যশরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি বিদ্রোহের আগুন পুরে দিয়েছিলেন। সেই বিদ্রোহের তেজ পরবর্তী কালে স্তিমিত হয়ে এলেও এখনও তার তাপ একেবারে মুছে যায় নি। বিশ শতকের যুদ্ধোত্তর বাংলা কাব্যে

আঙ্গিক নিয়ে নানাবিধ নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর ভাববস্তুর নূতন নূতন পথে সম্প্রসারণের মূলে যে মধুসূদনের আদিম বিদ্রোহের প্রেরণা সক্রিয় নেই সে কথা জোর করে বলা যায় না। সাহিত্যে ও কাব্যে গতানুগতিককে ভাঙবার প্রেরণা মধুসূদনই সবচেয়ে আমাদের বেশী জুগিয়েছেন। তাঁর বিদ্রোহের মশাল থেকে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করা গিয়েছিল তারই আলোতে আজও বাংলা কাব্যের পথ-পরিক্রমা চলছে এমন কথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হয় না। মধুসূদনের নিজে হাতে জ্বালানো মশালের আগুন আজও নেবে নি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, মহৎ কবিত্বের কৃতিত্ব অপেক্ষা অভিনবত্ব-প্রয়াসের কৃতিত্বই মধুসূদনের সমধিক প্রাপ্য। তা যদি হয়ও, সেও বড় কম কৃতিত্ব নয়। এক একজন কবি এতগুলি দিকে অভিনবত্বের প্রবর্তনার দ্বারা নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন এইটেই একটা বিস্ময়কর কীর্তিরূপে পরিগণনীয়। তাছাড়া কবিত্বেও তিনি প্রবলা শক্তির অধিকারী। বাংলা কাব্যে নমনীয়-কমনীয় ভাবেরই সমধিক চর্চা হয়েছে মধুসূদনের আগে পর্যন্ত। বৈষ্ণব ও মঙ্গল কাব্যগুলিতে বীর্যভাব দার্ঢ্য ও ওজঃগুণের একান্ত অসদ্ভাব ছিল। মধুসূদনের সর্বপ্রধান গৌরব এই যে, তিনি বাংলা কাব্যে এই তিন অনাস্বাদিতপূর্ব রসের সঞ্চার করে বাংলা কাব্যের এযাবৎ অর্গলবদ্ধ এক নূতন সিংহতোরণের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। বাংলা কাব্যে সত্যিকার গাম্ভীর্য রসও তাঁর দান। এক্ষেত্রে একমাত্র পূর্ব-নজীর রয়েছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ‘শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত’কাব্যখানি। তবে গাম্ভীর্যের এমন ব্যাপক অনুশীলন ইতঃপূর্বে আর হয় নি।

মধুসূদন স্বীয় স্বভাবের অন্তর্তাগিদের বশে ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যে রামায়ণের প্রচলিত আদর্শের বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর হাতে রামায়ণোক্ত চরিত্রগুলির গুরুত্ব-লঘুত্বের ধারণার অদলবদল হয়েছিল। তিনি রামকে সর্বগুণাধার করে না এঁকে রাবণকে মেঘনাদ বধ কাব্যের নায়করূপে অধিষ্ঠিত করেন এবং তৎপুত্র ইন্দ্রজিৎকেও প্রায় তত্তুল্য মর্যাদায় ভূষিত করেন। রাবণসুত ইন্দ্রজিতের পাশে রামভ্রাতা লক্ষণ নিতান্ত নিষ্প্রভ মধুসূদনের রূপান্তরিত কাব্যে। এ রূপান্তরকরণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে কি না, হলেও তার মূল্য কতটা, আপাতত সে বিচারক্রিয়ায় প্রবেশ না করেও বলা যায়, মধুসূদন কর্তৃক এই যে রামায়ণের কাহিনীতে ঝোঁকের পরিবর্তন সাধন, অনায়ককে নায়কোচিত গুণে বিভূষণ—এর সঙ্গে আধুনিক কালের মানসিকতার মিল আছে। আধুনিক যুগ আড়ম্বরের পূজারী, শক্তির পূজারী, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন উপায়ের ঔচিত্যে বিশ্বাসী। রাম চরিত্রে কীর্তিত বৈষ্ণব গুণগুলিতে স্পর্ধিত আধুনিক মানুষ বড় একটা বিশ্বাস করে না। সত্য ও অহিংসা এ যুগের দুই প্রধান বাণী হলেও, এখনকার বলদর্পী মানুষ তাতে আস্থা স্থাপন করে না। বরং সেই তুলনায় বাহুবল ধনবল লোকবল কূটবুদ্ধিবল ইত্যাদি বলেরই যেন বাজারদর অনেক বেশী। এই আধুনিক মানসিকতারই প্রতীক রূপে মধুসূদন রাম ছেড়ে রাবণের ভজনায় অগ্রসর হয়েছেন। আর এই মানসিকতারই প্রতিধ্বনি ব্যক্ত হয়েছে লক্ষণের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে—

আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে ?

* *

মারি অরি, পারি যে কৌশলে।”

এই হচ্ছে এ কালের যুগধর্মোচিত দৃষ্টিভঙ্গী। এই অনুচিত দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়, কিন্তু তাতে তার গতিবেগকে প্রহত করা যায় না। জোয়ারের আবর্তে ঘোলা জলের আবিলতাই বেশী, তাই বলে

জোয়ারকে কি বাগ মানানো যায়, না তাতে বাঁধ দেওয়া চলে? কালধর্ম ভাল হোক মন্দ হোক তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। অস্বীকার করার যাঁরা চেষ্টা করেন তাঁরা সংখ্যাশক্তিতে বহুগুণে ভারী মূঢ় জনসাধারণ কর্তৃক নিগৃহীতই শুধু হন। এ যুগে সঙ্ঘবদ্ধ মূঢ়তারই জয়। অন্য পক্ষে প্রমীলার দর্পিত উক্তি—

"দানব নন্দিনী আমি, রক্ষঃকুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী।
আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে,"

এর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ঐশ্বর্যকৌলীন্যের চেতনা, বনেদিয়ানার মনোভাব, উপাদান-উপকরণের দীনতার প্রতি অবজ্ঞা। এ একেবারেই ভারতীয় মানসিকতা নয়, ইংরেজ শাসনের আওতায় আমাদের সমাজে বিত্তকুলীন যে নবধনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, তাঁদের মানসিকতার সঙ্গে এই কটি চরণে ব্যক্ত মনোভাবের কোথায় যেন একটা অলক্ষ্য সাদৃশ্য রয়েছে। উক্তিটি নারীমুখ নিঃসৃত হওয়ায় তার তাৎপর্য কমে না বরং সেই কারণেই আরও বেশী অর্থপূর্ণ। আভিজাত্যের মোহ যখন একটা নবসৃষ্ট সম্প্রদায়ের মনে মত্ততার আবেশ আনে তখন স্ত্রীপুরুষ কাউকেই রেয়াৎ করে না, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই চিত্তকে তা আবিষ্ট করে। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। মধুসূদন ছিলেন নব বুর্জোয়া সমাজের প্রতিনিধি। ওই সমাজের বিশেষ সুখসুবিধার কক্ষপুটে লালিতবর্ধিত হওয়ায় সামাজিক আভিজাত্য সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল—তারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে তদঙ্কিত রাবণ চরিত্রে মেঘনাদ চরিত্রে প্রমীলা চরিত্রে। মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্বের এইখানেই অসম্পূর্ণতা যে তিনি শ্রেণী চেতনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি, স্বশ্রেণীর বিশেষ মানসিকতার দ্বারা তাঁর কল্পনা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। নবধনিক সম্প্রদায়ের অমিত আশাবাদী অহংকৃত মনোভাবের প্রতিনিধি কবি তিনি। তাঁর ভিতর যে বিদ্রোহ আমরা লক্ষ্য করি তা একান্তভাবে তাঁরই ব্যক্তিত্বের তেজে পূর্ণ একক বিদ্রোহ, আত্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহ; এর সঙ্গে প্রচলিত শ্রেণীসম্পর্কের অবসান বা নূতন শ্রেণী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টার কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর মন তেমনভাবে গঠিতও ছিল না। এ যুগের প্রবহমান গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটতে তখনও অনেক বিলম্ব ছিল।

মধুসূদনের বাংলা ভাষার উপর অধিকার সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে এখনকার কোন একজন সুপরিচিত লেখক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন, মধুসূদন বাংলা জানতেন এটা নাকি বাংলা সাহিত্যের এক 'দুর্মরতম কুসংস্কার'। লেখক এ রকম উক্তি কী করে করতে পারলেন আমরা ভেবে পাই না। এ উক্তি শুধু অসত্যই নয়, সমগ্র আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্ব-ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধারও দ্যোতক। যে মধুসূদনের কাব্য-সাধনার বুনিয়াদের উপর পরবর্তী কালের কাব্য-সাধনার উত্তুঙ্গ প্রাকার দাঁড়িয়ে আছে, সেই বিশিষ্ট কবি পথিকৃৎ বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না এমন কথা বললে নিজেদেরই যে অস্বীকার করা হয় এই বোধ পর্যন্ত লেখকের নেই। তা যদি তাঁর থাকত তা হলে মধুসূদনের প্রতি এমন অবমাননাকর বেদনাদায়ক উক্তি তিনি কখনই করতে পারতেন না। কেউ কেউ মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দোলালিত কাব্যের, বিশেষ করে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র অতিরিক্ত শব্দালঙ্কার, ভাবাব্যবহারে দুরূহ জটিল বাক্যরীতির আশ্রয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষার বাহুল্য ও কষ্টকল্পনা, অপ্রচলিত তথা আভিধানিক শব্দের সমাবেশ, ভাবের আত্যন্তিক গাম্ভীর্য ইত্যাদিকে মধুসূদনের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে প্রয়োগ করে তাঁর ভাষাজ্ঞানের অপ্রতুলতা ও কৃত্রিমতা প্রমাণে সচেষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথের সতেরো বৎসর বয়সে লেখা

মেঘনাদ বধ কাব্যের সমালোচনায়ও এই-জাতীয় অভিযোগ ছিল, কিন্তু আপনারা জানেন যে রবীন্দ্রনাথ পরিণত জীবনে তাঁর এই সমালোচনা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। নিয়েছিলেন এই কারণে যে, ওইরূপ সমালোচনায় মধুসূদনের কাব্যের বহিরঙ্গের সমালোচনা মাত্র করা হয়, তাঁর কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় প্রকটিত হয় না। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে এযাবৎ-অলভ্য যে ওজঃগুণ ও গাম্ভীর্যের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই তাঁকে বাক্যরীতিতে ও শব্দসমাবেশে কিঞ্চিৎ জটিল রীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল ; তাছাড়া অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিজস্ব প্রয়োজনেও তাঁর ওই কঠিনের পথ অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। নয় তো তাঁর কাব্যকে সহজের খাতে তিনি ইচ্ছা করলেই নামিয়ে আনতে পারতেন। তিনি যে লৌকিক ভাষারীতির সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন এবং তার সম্যক্ ব্যবহারও জানতেন তা তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', বিচ্ছিন্ন কবিতাবলী, নাটক ও প্রহসনের সংলাপ পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' থেকে দু-একটি কবিতাংশ উদ্ধার করছি। তা থেকেই বুঝতে পারা যাবে, সুললিত সুছাঁদ সহজবোধ্য বাক্য প্রয়োগেও মধুসূদনের দক্ষতা বড় কম ছিল না।

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন !
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?
("সখি")

কিংবা,

কেনে এত ফুল তুলিলি সজনি—
ভরিয়া ডালা ?
মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী,
তারার মালা
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা ?
আর কি পরিবে, কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী ?
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বনশোভিনী ?
অলি বঁধু তার, কে আছে রাধার—
হতভাগিনী ?
হায় লো দোলাবি সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া ?
আর কি নাচে লো, তমালের তলে,
বনমালিয়া ?
প্রেমের পিঞ্জর, ভাঙি পিকবর—
গেছে উড়িয়া।
("কুসুম")

এমন মধুর সুশ্রাব্য স্বচ্ছন্দ ভাষায় যিনি কাব্য রচনা করতে পারেন তিনি বাংলা জানেন না এ কথা শুধু যে বিশ্বাসের অযোগ্য তাই নয়, অতীব হাস্যকর। মধুসূদনের প্রথম রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে (রচনাকাল ১৮৫৮ সনের শেষভাগ) মধুসূদন যে সংলাপের ভাষা ব্যবহার করেছেন তার বাক্যগঠনে তৎসম শব্দের আধিক্যটুকু বাদ দিলে সে ভাষা প্রায় এ কালের ভাষার সমতুল মনে হবে। আর প্রহসন দুটির সংলাপ ব্যবহারে তিনি তো একেবারে কথ্য রীতির চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। এত সব জোরালো বিপরীত সাক্ষ্য থাকতে কেমন করে যে আধুনিক কালের একজন মান্য লেখক মধুসূদনের বিরুদ্ধে বাংলা ভাষায় অজ্ঞতার অভিযোগ আনেন আমাদের পক্ষে তা বুঝে ওঠা সত্যিই দুষ্কর।

৪

পরিশেষে আর একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করব।

মধুসূদন স্বধর্ম ত্যাগ করে ধর্মান্তর পরিগ্রহ করেছিলেন, ধর্মান্তর পরিগ্রহ করণের জন্য স্বজন কর্তৃক প্রায়-পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে বাস করেও শুধু তাঁর ওই কার্যের জন্য প্রায়-নিরাত্মীয়ের জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তৎকালীন সমাজের পক্ষে তাতে তার কাব্যের রসাস্বাদনে ও তাঁকে কবি হিসাবে স্বীকৃতিদানে কোন বাধা ঘটে নি। তৎকালীন জনসমাজ মধুসূদনকে এক বাক্যে একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে অভিনন্দিত করেছিলেন। এতে সেই যুগের মানুষের সহজ রসরসিকতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। আজ থেকে একশো বছর আগে মধুসূদন বাংলার কাব্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। সে যুগ এ যুগের তুলনায় স্বভাবতঃই অনেক বেশী রক্ষণশীল ছিল। প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল মনের পক্ষে বিধর্মিতার অপরাধ ক্ষমা করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। অথচ দেখতে পাই, ক্রীশ্চিয়ান মধুসূদন কবি মধুসূদনের গ্রহিষ্ণুতার পথে আদৌ বাধার সৃষ্টি করতে পারে নি। তৎকালীন কাব্যের সন্ধানী মানুষ মধুসূদনের ক্রীশ্চিয়ান পরিচয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তাঁর কবি-পরিচয়কেই নিজেদের কাছে বড় করে তুলে ধরেছিলেন। এতে ঔদার্য, কাব্যরসগ্রহণক্ষমতা, সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিকতার বোধ প্রভৃতি বিভিন্ন গুণের এককালীন পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের জীবিতকালেই মধুসূদন বাংলা দেশ কর্তৃক শ্রদ্ধা ও অনুরাগের স্বীকৃতিধন্য হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন ইহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।"

ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে তদানীন্তন সমাজ কর্তৃক মধুসূদনকে একজন পরমাত্মীয় কবিরূপে গ্রহণের তাৎপর্য আমাদের ভাল করে পরিমাপ করা দরকার। মনে হয় এ কালে আমরা সেই ঔদার্য আর সহজ কাব্যের রসাস্বাদন-ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। আমরা রাজনীতি দলীয়তা লেখকের ব্যক্তি-পরিচয় প্রভৃতি নানা অবান্তর প্রসঙ্গের দ্বারা রচনার সহজ গুণ গ্রহণরূপ কর্মকে আবৃত করে ফেলেছি। রচনার গুণাগুণ দ্বারা রচনার মূল্য নিরূপিত না হয়ে রচয়িতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয়ের দ্বারা রচনার উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। এ অভ্যাসের পরিবর্তন হওয়া দরকার। উনিশ শতকের কাব্যপাঠকের কাছ থেকে যদি তাঁদের ওই নৈর্ব্যক্তিক রসগ্রহণক্ষমতার আদর্শটিকে গ্রহণ করতে পারি তা হলে আমরা অনেক অনর্থের হাত থেকে মুক্তি পাব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দশ

অমন হন হন করে কোথায় চললেন ?

একি ! পিছনে যে ঋতাই ডাকছে। আমাকে মুখ ফেরাতে দেখেই ঋতা হেসে ফেলল, বলল : দুজনের একজনও সুস্থ নন।

বললুম : শরীর দুজনেরই সুস্থ।

ঋতাও রাস্তার উপর নেমে এল। পাশে পাশে চলতে চলতে বলল : ঠিক ধরেছেন, আমি আপনাদের মাথার কথাই বলছি।

এই হোটেলে উঠেই অসুস্থ হল।

কেন ?

মাথা খারাপ হবার মতো কাণ্ড বারেবারেই ঘটছে।

যথা ?

পিছনে টিকটিকি এবং মেয়ে দুইই লেগেছে।

ঋতা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল : টিকটিকি কে ?

খবর পাননি ?

না তো।

সন্দেহও করেননি কিছু ?

কিছু করছি বলেই ভয় পাচ্ছি।

তবে আমার সঙ্গে আর পথ চলবেন না, লক্ষ্মী মেয়ের মতো ঘরে ফিরে যান।

আপনি কি খুনের আসামী ?

তাহলে ভয় পাবার কারণ ছিল না।

কেন ?

সব কিছু চুকেই গেছে। ভয় পাওয়া উচিত খুনের মতলব আঁটছি জেনে। কেননা জড়িয়ে পড়বার ভয় আছে।

হেঁয়ালি ছেড়ে এবারে সত্যি কথাটা বলুন।

সত্যি কথাটা জানিনে, তবে সন্দেহের কথাটা বলতে পারি।

তবে তাই বলুন।

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ আসছেন, সে খবরআপনাদের বাস ওয়ালা দিয়েছে। আর আমাদেরই হোটেলের

একটা ছোট ঘরে দুজন ভদ্রলোক ফিসফিস করে কথা বলছিল। হোটেলে সন্দেহ করবার মতো দুটো মানুষই আছে—রামানন্দ আর গোপাল। রামানন্দ একটা গবেষণার জন্য এসেছেন, গোপাল কেন এসেচে সেটা কারও জানা নেই। তার হাবভাব কথাবার্তা এমন কি আচার-আচরণও একটু সন্দেহজনক।

এ ইংরেজের রাজত্ব নয়, স্বদেশীর যুগও নয়। তবু কেন সন্দেহ করবে?

সন্দেহ করা ওদের কাজ। ওদের চাকরিই এই। কাউকে সন্দেহ না করলে মাসের পর মাস মাইনে নেবে কোন যুক্তিতে!

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে চলবার পর শ্বেতা বলল: আপনার একটু সাবধানে চলা উচিত।

আমি হেসে ফেললুম।

হাসি নয় গোপালবাবু, অনর্থক ঝামেলা বাধিয়ে তো লাভ নেই।

আপনি আর আমার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন! অনর্থক তো নাও হতে পারে!

আমার বিশ্বাস হয় না।

এ কথার উত্তর না দিয়ে আমি বললুম: আপনার ভোরবেলার কথাগুলো বেশ ভাল লেগেছিল।

এখন বুঝি খারাপ লাগছে?

খারাপ নয়, বড় পানসে কথা। এ ধরনের কথা ঘরের ভেতর মানায়।

বললুম না, স্বামীস্ত্রীতে? কিন্তু শ্বেতা বলল: পরিচয় নামমাত্র হলেও বোধ হয় মানায়। অন্তত সৌজন্যটা প্রকাশ পায়।

আন্তরিকতার গন্ধটা আপত্তিকর কিনা, তাইতেই বলি, সৌজন্য তোলা থাক। উপদেশ না দিলেও কেউ অভদ্র বলবে না।

অভদ্র বললেও আমি লজ্জা পাব না।

এ সব কথা রামানন্দবাবুকে কেন বলছেন না? তিনি খুশী হতেন।

তা বুঝতে পেরেছি।

আর কিছু কি বোঝেননি?

শ্বেতা হেসে বলল: আপনাকে বললে যে উল্টো ফল হবে, তাও বুঝেছি।

তবু কেন বলছেন?

ঝগড়া করতেই আমার ভাল লাগে।

তবে এমন মিনমিনে ঝগড়া কেন করছেন? আসুন না চেঁচিয়ে করি।

আসুন।

শ্বেতা আবার হাসল! বলল: আপনাকে ধাক্কা খাওয়া মানুষ মনে হচ্ছে।

আপনিও অনেককে ধাক্কা দিয়েছেন।

আমার সম্বন্ধে তো আপনি কিছু জানেন না।

এই সমস্ত কথাতেই অনুমান করতে সুবিধে হচ্ছে। তবে আমাকে যে ধাক্কা দিতে পারবেন না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

আপনি এমন নিশ্চিন্ত কেন?

এমন নিচের তলায় আমরা শুয়ে আছি যে সমাজের উপর-তলার ধাক্কা সেখানে পৌঁছয় না।

আপনি যে কেরাণীগিরি করেন, তা শুনেছি।

এত তাড়াতাড়ি খবরটা সংগ্রহ করেছেন ?

ঋতা হাসল।

হাসলুম : লোকে যে বদনাম করবে।

কেরাণী না হলে করত।

কেরাণী কি পুরুষ নয় ?

মেয়েদের আকর্ষণ করতে পারে এমন পুরুষ নয়। তার জন্মে পদস্থ হওয়া দরকার।

না হলে অপদস্থ তো করতে পারেন।

পুরুষদের অপদস্থ করে বেড়ালে মেয়ে মহলে সুনাম হয়।

আপনি তাহলে সুনামেরই চেষ্টা করুন।

আর আপনি করুন আত্মরক্ষা।

বললুম : কিছু করব বলে এখানে আসিনি।

কিন্তু এসেছেন যখন তখন কিছু করতেই হবে।

তার জন্তে রামানন্দ বাবু আছেন, তাঁকে ধরুন। দরকার হলে—

দরকার হলে কী ?

নায়কের ভূমিকা নিতে তাঁর আপত্তি হবে না।

ও ভূমিকাটি অনেকের কাছেই লোভনীয়। বুদ্ধিমান যারা, তারা বোকা সেজে লুকিয়ে থাকে। গভীর জলে অনেকদিন খেলে।

লোকে কি এখানে খেলবার ও খেলাবার জন্তে আসছে ?

ভেতরে কোন গোলমাল না থাকলে সহজ হতে বাধা কিসের !

কথাটা যে খুব খাঁটি তা মেনে নিতে দ্বিধা হল না। আর আমি যে ভিতরের গোলমালের জন্তই সহজ হতে পারছিনে, তা এই মেয়েটার কাছেও ধরা পড়ে গেছে। বললুম : কৌতূহল জিনিষটা ব্যক্তিগত না হলেই ভাল। এই যে লোকগুলো এখানে কাজ করছে, এদের সম্বন্ধে কৌতূহল জাগলে অনেক কিছু জানা যেত।

উত্তর না দিয়ে ঋতা চারিদিকের কর্মরত মানুষগুলোর দিকে তাকাল। তারা মাছ ধরার বড় বড় জাল বালির উপর বিছিয়ে বসেছে। নিঃশব্দে মেরামত করে চলেছে। কারও মাথায় সাদা টুপি, কারও কাপড়-জড়ানো মাথা। দূরে দূরে বসেছে, কেউ কারও সঙ্গে কথা কইছে না।

ঋতা বলল : কাণ্ড দেখেছেন ?

আমি চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

ঋতা আমাকে আঙুল দিয়ে ঘুমন্ত মানুষ দেখাল। উদার আকাশ থেকে এখন উত্তাপ বৃষ্টি হচ্ছে। প্রসারিত সমুদ্র-সৈকতের কোনখানে একটু ছায়া নেই। তবু কতগুলো মানুষ এই গরম বালির উপর নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে ঘুমচ্ছে। ছোটবড় অসংখ্য নৌকো বালির উপর ইতস্তত ছড়ানো আছে। তারই গা ঘেঁষে একটুখানি ছায়া। সেই ছায়ায় মানুষ শুয়েছে। কেউ আবার কাপড় টাঙিয়ে ছায়ার সৃষ্টি করেছে। ঋতা বলল : সমুদ্রকে এরা সত্যিই ভালবাসে।

তাতে বুঝি সন্দেহ নেই। কষ্টিপাথরের মতো কালো দেহ পাথরের মত মজবুত। রোদে জলে

ঝড়ে নির্বিকার ভাবে সমুদ্রে নামছে, ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করে পয়সা আনছে জীবনধারণের জন্ত। শেষ রাত থেকে শেষ বেলা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম। তার উপর উটকো কাজ। নৌকো আর জাল মেরামত লেগেই আছে। কখনো হাতুড়ি কখনো সুঁচ। বেশিদিন মেরামত করেও চলে না, আবার নতুন করে গড়তে হয়। কেউ মাছ বিক্রী করে, কেউ হাত ধরে সমুদ্রে স্নান করায়। ঐতো মাথায় ঝাঁকা ভর্তি মাছ নিয়ে মেয়েরা সহরের দিকে যাচ্ছে। এই তো নুনিয়া জাত। এরা যদি সমুদ্রকে ভাল না বাসে, তাহলে আর কে বাসবে ?

ঋতা বলল : আপনি বুঝি মানলেন না আমার কথা ?

এদের কথাই ভাবছি।

কী রকম ?

সমুদ্রের গরম বালির ওপর কেমন নিশ্চিন্তে এরা ঘুমচ্ছে। সমুদ্রের গর্জন এদের ঘুমপাড়ানি গান। ছোট ছোট ছেলেরাও দেখুন সমুদ্রের টানে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ঋতা আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি লজ্জা পেলুম। সহসা মনে হল, আমার দুর্বল মনের কোন পরিচয় বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি বললুম : সমুদ্রের প্রতি মেয়েদের কোন টান দেখছি না। ওদের মন নিশ্চয়ই ঘরমুখো।

ঋতা বলল : এই বাড়িগুলোর পেছনেই নুনিয়াদের একটা বস্তি আছে। দেখেছেন ?

না।

চলুন না, একবার দেখে আসি।

আমি কোন উত্তর দিলুম না।

ঋতা বলল : ভয় পেলেন নাকি ?

আপনি সঙ্গে থাকলে আর ভয় কিসের ?

মানে ?

বস্তিতে এখন শুধু মেয়েরা আছে। কোন পুরুষমানুষকে ঘুর ঘুর করতে দেখলে—

খিল খিল করে ঋতা হেসে উঠল। অবাধ উদ্দাম হাসি। যে লোকগুলো একান্ত মনে কাজ করছিল, আমি তাদের চমকে উঠতে দেখলুম। হাসি থামলে ঋতা বলল : মারের ভয় !

দুর্নামেরও।

আমি সঙ্গে থাকলে বুঝি সে সব ভয় নেই ?

সভ্য সমাজের দৃষ্টি তখন আপনার ওপরেই পড়বে।

আর ওদের দৃষ্টি ?

ওদের কৌতূহল কম। আমি একা গেলেও যেমন, আপনি সঙ্গে থাকলেও তেমনি। পুরুষ ও নারীকে নিয়ে কোন বিচিত্র সম্পর্ক ভাবতে ওরা অভ্যস্ত নয়।

তাহলে আপনি মারের ভয় কেন পাচ্ছিলেন ?

সে তো ওদের কাছে নয়, সে আপনাদেরই প্রতিনিধির কাছে। মারের চেয়ে দুর্নামেরই বেশি ভয় পাই।

আমি সঙ্গে থাকলে ?

দুর্নামটা আপনি বিশ্বাস করবেন না। আর রামানন্দবাবু কিছু সন্দেহ করলে আমার উপকার আছে। আমাকে তিনি পরিত্যাগ করলে আমি পরিত্রাণ পাই।

নুনিয়াদের বস্তির দিকে চলতে চলতে ঋতা বলল: বলে দেব।

ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখ তার থমথম করছে।

সমুদ্রের তীরে যে বাঁধানো সড়ক, তারই সমান্তরাল রাস্তা, ঠিক প্রথম সারির বাড়িগুলোর পিছনেই। কিন্তু সেই রাস্তায় পৌঁছে বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে এও পুরীর পথ। দুধারে অসংখ্য খড়ের ঘর, মাঝখানটা প্রশস্ত বটে, কিন্তু ধূলায় অপরিচ্ছন্ন। মনে হবে, পায়ে পায়ে সমুদ্রের সমস্ত বালি এসে এইখানে জমা হচ্ছে। সমুদ্রের মানুষগুলোর গায়ে লোনা জলের প্রলেপ যায় শুকিয়ে, কিন্তু পায়ের বালি ঘরের দুয়োর পর্যন্ত চলে আসে। ছেলেদের পায়ে পায়ে সেই ধুলো উড়ছে। ছেলেরা চক্রাকারে কোন খেলা খেলছে।

নদীর মানুষ নিয়ে অনেক লেখা আছে। পদ্মা, তিতাস আর গঙ্গার মাঝিদের নিয়ে। সমুদ্রের মানুষ নিয়েও নাকি লেখা হয়েছে, আমি পড়িনি। ঋতা ঠিক এই প্রশ্নই করল: এই সব মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু জানেন?

না।

কোন কৌতূহল নেই?

একদা ছিল।

আজ কেন ফুরিয়ে গেল?

বড় ক্লান্ত বোধ করছি।

আপনি খুব আয়েশী লোক মনে হচ্ছে।

এ কথার প্রতিবাদ করলুম না। প্রতিবাদ করতে গেলেই কিছু অপ্রয়োজনীয় কথা এসে পড়বে। সব কথা সকলের সামনে বলা যায় না।

ঋতা বলল: এদের জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে। একটা জিনিষ ভারি অদ্ভুত দেখছি। পুরুষরা সারাক্ষণই সমুদ্রে আছে। অথচ মেয়েদের দেখি না। মেয়েরা বোধ হয় সমুদ্রকে ঘেন্না করে। কেন এমন হয় বলতে পারেন?

আমি এদের লক্ষ্য করবার সুযোগ পাইনি। ঋতার কথা সত্য কিনা তাও জানিনে। সত্য হতেও পারে। স্বামী যদি সমুদ্র নিয়ে সারাক্ষণ মেতে থাকে, স্ত্রী সেই সমুদ্রকে সতীন ভাবলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সভ্য সমাজে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে অসন্তোষের এই প্রধান কারণ। এদের বিবাদ বোধ হয় তত তীব্র নয়। জীবনের সমস্যাকে এরা সহজভাবে মেনে নিতে পারে। বললুম: সমুদ্র এদের সতীন।

ঋতা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল: বেশ বলেছেন। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় এদের ঝগড়া দেখেছি। পুরুষেরা নেশা করে ঘরে ফিরেছিল—

বললুম: দোষ ঐ পুরুষদেরই। ওরা নেশা করে বলেই ঝগড়া হয়।

না না, দোষ ঐ মেয়েদের। অমন নেশা না করলে সমুদ্রের সঙ্গে লড়বে কী করে!

বলে আমার দিকে চেয়ে ঋতা কৌতুকে হাসল। আমাকেও হাসতে হবে।

নুনিয়াদের জীবনযাত্রা আমাদের দেখা হল না। দেখা সম্ভব নয়। জীবন যদি ঘটনা হত, তাহলে

তার খবর সংগ্রহ করা যেত, ছাপা চলত খবরের কাগজের পাতায়। জীবনের খবর পাওয়া যায় জীবনের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে। আমরা তা পারিনে। দূর থেকে দেখে আমরা একটা ধারণার সৃষ্টি করি। যে ধারণার ভিত্তিতে কোন সত্য নেই। এমনি একটা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

বাহিরের বারান্দায় রামানন্দবাবু অপেক্ষা করছিলেন। ঋতার সঙ্গে আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠলেন: আপনি!

হ্যাঁ আমি।

দুপুর রোদে কোথায় বেরিয়েছিলেন?

ঋতা উত্তর দিল: বেড়াতে।

রামানন্দবাবু ঠিক এমনটি আশা করেননি। আমতা আমতা করে বললেন: তাইতো।

তাঁকে আরাম দেবার জন্য আমি বললুম: আপনাকেও সঙ্গে নেব ভেবেছিলুম, কিন্তু—

কিন্তু কী?

আপনি ঘুমচ্ছিলেন।

কী যা-তা বলছেন! দুপুরে আমি কখনও ঘুমোই?

আমি ভাবলুম, হবেও বা। কিন্তু ঋতা হেসে উঠল উচ্ছলিত কৌতুকে: না না, দুপুরে আপনি ঘুমোবেন কেন! আমরা সমুদ্রের গর্জন শুনেছি।

আমি হেসে বললুম: শুনেছেন বুঝি?

উত্তরে ঋতা হাসল। কিন্তু দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আমাকে একা পেয়ে রামানন্দবাবু ক্ষেপে উঠলেন। বললেন: এ নিশ্চয়ই আপনার কাজ!

কোন্ কাজ?

এই যে আমার নামে লাগিয়ে বসে আছেন!

একসঙ্গে থাকলে এসব নানা বিপদ। আমাকে যেতে দিন না!

রামানন্দবাবুর মনে পড়ল হোটেলের কনসেসনের কথা। দুজনে এক ঘরে থাকার জন্য কিছু সুবিধা পাওয়া গেছে। আলাদা হলেই খরচ বাড়বে। রাগত ভাবে বললেন: যেতে দিচ্ছি বৈকি।

আর যা বললেন, তা আমার কানে গেল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে রামানন্দবাবু অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাঁকে হোটেলে ফেলে আমাদের বেরিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি।

বললুম: বুঝতেই পাচ্ছেন—

রামানন্দবাবু বুঝতে পারছেন বৈকি!

(ক্রমশঃ)

পার্শ্বচরিত্র

সুশীল সিংহ

আসলে কুকুরের মৃত্যুটা এ ছবিতে একটা বড় এবং বিশেষ ঘটনা। তাই এ ছবিতে কুকুরের ভূমিকা ও অভিনয়ের গুরুত্ব বোঝার জন্য ছবির কাহিনীর সেইটুকু অন্তত জানা দরকার। দৃশ্যটাও।

এ ছবির কাহিনীতে আছে শরৎকালের এক বৃষ্টিঝরা বিকেলে মণিমোহন এসেছে লহরীর বাড়ীতে। মণিমোহন এ কাহিনীর উপনায়ক। একদিন তার স্বপ্নের সপ্তডিঙা কল্পনার সাগর পাড়ি দিত বাসনার এক দ্বীপ লক্ষ্য করে সেই কন্যার নাম লহরী। একরোখা আবেগ মণিমোহনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সে আবেগে অন্ধ মণিমোহন। যে লহরী অন্যের ঘরণী হয়েছে তার সান্নিধ্যে এসে তাকে পাওয়া মণিমোহনের স্বভাব নয়, ভিক্ষাও নয়। যাকে একান্ত করে চেয়েও সে পায়নি. সেই লহরীকে সে মুছে দেবে পৃথিবী থেকে। মুছে যাবে নিজেও। সেই উদ্দেশ্যে—লহরীকে ও নিজেকে মৃত্যু দেবে বলে—সেই বৃষ্টিঝরা বিকেলে লহরীর বাড়ীতে এসেছিল মণিমোহন। আততায়ীর মত কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র সে লুকিয়ে আনেনি। টিফিন বাক্সে করে কোন হোটেলের রাঁধা মাংস এনেছিল বেশ খানিকটা। বিষ মাখিয়েছিল নিজের হাতে।

লহরী অবাক হয়েছিল। তবু ভদ্রতার হাসি হেসে স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিল সে।

সেই মুহূর্তে একটা চক্রান্তের শিহরণে মণিমোহনের সমগ্র অন্তরাত্মা ক্রমশঃ অসাড় হয়ে যাচ্ছিল। তাই সে স্পষ্ট বলল, জিনিষ ফিরিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।

—তা কেন? আমরা খানিকক্ষণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে পারি!

—পারি। রোজই পারি। কিন্তু আজ পারি না। চাই না।

—কেন?

—এ কেনর কোন উত্তর নেই। 'চাই না' এই যথেষ্ট।

বাইরে আকাশে আলোড়ন। ঝর ঝর করে বৃষ্টি ঝরছে। ঘরটার মধ্যে নীরবতা। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে লহরী ভাবছে। তার সেই পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকার দিকে চেয়ে আছে মণিমোহন। লহরীর বিয়ের পর এই প্রায় এক বছরে খুব কম এসেছে সে। হয়ত এই নিয়ে চারবার। কিংবা তিনবার। এর আগে কোন দিন লহরীর স্বামীর অনুপস্থিতিতে এ বাড়ীতে আসেনি সে। আজ এসেছে সে। কেন এল? জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে এই কথাটাই কি ভাবছে লহরী?

—বুঝেছি। ঠিকই তো। এই সময় আসা আমার ভুল, শুধু ভুল নয়, অন্যায় হয়েছে। আচ্ছা, চলি।

—না। না। সেকি। বস, জানলার কাছ থেকে হাল্কা পায়ে কাছে এসে বিপরীত দিকে বেতের চেয়ারটায় বসল লহরী।

মণিমোহনের মনে হয়ত সেই মুহূর্তে অনেক স্মৃতির টুকরো ভীড় করে এসেছিল। আবেগে অন্ধ ও অপ্রকৃতিস্থ মণিমোহনের মুখের প্রতিটি সূক্ষ্ম রেখা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যেত তা। এইখানটায়

মণিমোহনের অভিব্যক্তির একটা 'ক্লোজআপ' নেওয়া হবে। দেখা যাবে সে তার নিজের একটা ঠোঁট দিয়ে আরেকটা ঠোঁটকে পীড়ন করছে। আর ডান হাতের একটা আঙুল অকারণে ঘষছে টেবিলের ওপর।

মণিমোহন বললে,—স্বর্গের পারিজাত চাইনি, অসম্ভব কিছুই দাবী করিনি যে—

কথাটা শেষ করল না মণিমোহন। নিজেই ডাকল, রাধু—

রাধু বাড়ীর চাকরের নাম। রাধু এল। পিছনে পিছনে এল একটা এদেশী কুকুর। গায়ের রঙটা পাঁশুটে। কটা চোখ। লম্বাটে মুখ। দেশী, তবে পথের কুকুর নয়। তাই শরীরটি বেশ চিকন। লহরীর স্বামী সতীশ নাকি তাকে স্নেহ করে।

—বাবু।

—একটা প্লেট নিয়ে এসো।

—একটা? লহরী জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, একটাই।

প্লেট আনতে চলে গেল রাধু। কুকুরটা একটু এদিক ওদিক ঘুরে লহরীর পায়ের কাছে বসে পড়ল।

—রাধু এল।

প্লেটে মাংস ঢালল মণিমোহন। একটা মৃদু খোসবাই ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়। কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে জিব বার করে লেজ নাড়তে লাগল।

একই প্লেট থেকে দু'জনে এই সামান্য খাবারটুকু খাবে এই চেয়েছিল মণিমোহন। আর কিছু নয়। অতি সামান্য।

মণিমোহনের হাত চলে এসেছে প্রায় তার মুখের কাছে। নিজের মুখে নেওয়ার আগে লহরীর দিকে চেয়ে আছে। একটা টুকরো তুলে নিতে লহরী বললে, কোন মানে হয় না এ'ছেলে-মানুষীর।

কুকুরটা তখন চেয়ে আছে লহরীর হাতের দিকে। সেদিকে চেয়ে লহরী বলল, কি রে খাবি?

এই বলে তার হাতের টুকরাটা মাটিতে ফেলে দিল।

—না, না, বলে উত্তেজিত হয়ে তাকে বাধা দিতে চাইল মণিমোহন। তার এই আচরণে বিস্মিত হ'ল লহরী। ততক্ষণে কুকুরটা এক কামড় দিয়েছে। বাঁ পায়ের নখে টুকরোটা ধরে গুছিয়ে বসে খেয়ে ফেলছে টুকরোটা।

টুকরোটা ফুরিয়ে যেতেই কুকুরটা লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। তার চোখ দুটো বুজে যেতে চেয়েও ধিক্ ধিক্ করে জ্বলে উঠছে মাঝে মাঝে। পা দিয়ে সে যেন সিমেন্টের মেঝেটাকে চিরে ফেলতে চাইছে। উগ্র তীব্র ধারালো বিষ—বিস্তর ফেনা টেনে বার করেছে কুকুরটার মুখ দিয়ে।

এই দৃশ্য। মরে যাওয়ার আগে প্রাণটাকে ধরে রাখার জন্য কুকুরটার করুণ, অন্তিম কাকুতি দর্শকের মনে গেঁথে দেওয়া দরকার। ওই টুকরোটা কুকুরটার পেটে না গেলে লহরী আর মণিমোহনের এই দশা হতো। সেই মৃত্যুকে আড়াল করল কুকুরটা। মেকী হলে চলবে না। ডামির ওপর তুলির টান দিলে যথার্থ মৃত্যুর ছবিতো কিছুতেই ফোটেনা, হাস্যকর কিছু হয়। চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি, মুখের হাঁ, নেতিয়ে পড়া জিব, অজস্র ফেনা এইসব হুবহু চাই। চাই-ই। অগত্যা একটি কুকুরকে অনুরূপ তীব্র বিষক্রিয়ায় সেটের মধ্যে মেরে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পরিচালক তরুণ। কাহিনীর মধ্যে কেবলমাত্র নাটকীয়তা আনা ছাড়াও তিনি এই ঘটনার ব্যঞ্জনার দিকটাও নানাভাবে বুঝে দেখেছেন। প্রথমতঃ মন দেওয়া নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের (আমাদের দেশে) যে বিশেষ যুগ যন্ত্রণা, মণিমোহন একদিক থেকে তারই প্রতিনিধি। ভালবাসার ক্ষেত্রে পাওয়া না পাওয়ার জটিলতা ইতিহাসের আগে থেকেই আছে। যুগের সঙ্গে তার রূপ বদলও আছে। কিন্তু বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা এই মুহূর্তে যে সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এর আগে তা কোনদিন দেখা যায় নি। লহরীকে মারতে চেয়ে ও নিজে মরে—অর্থাৎ মৃত্যুতে আমরা আমাদের—ভাবাবেগে বোকামীর চরম করেছে মণিমোহন। মাত্রার দিক থেকে ব্যতিক্রম। কিন্তু এই চরমটাকেই—একটা বিকৃত মৃত্যুকে—টুকরো টুকরো করে নানা ভাগে, উপভাগে, বিচিত্রভাবে মণিমোহন লহরীরা কি নিজেদের মধ্যে অহরহ ছড়িয়ে দিচ্ছে না? তবে?

ব্যঞ্জনার অন্যদিক হল প্রাণ-যে কি অমূল্য অমৃত আধার তো এ'হেন মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে ভাবা দরকার। প্রাণ প্রাণই। কুকুরটাকে মরতে দেখে দর্শকের বুকের পাঁজরে টন্‌টন্‌ করে বাজুক। হায় হায় করে উঠুক। ওটা চাই। কুকুর মরবে। গ্রহণ করা হবে দৃশ্য। যথাযথ।

॥ ২ ॥

সুতরাং একটা কুকুরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যে লোকটির ওপর এ'হেন দায়িত্ব দেওয়া হল তার চলতি নাম: পাত্র। পুরো নাম পঞ্চানন মহাপাত্র।

ষ্টুডিও চত্বরের মধ্যেই আউট হাউসের মত একটি ঘুপসি ঘরে থাকে পঞ্চানন। সে মানুষটা মাথায় খাটো, ধুতি পরে আরো খাটো। রোগা চেহারা, চোয়ালবসা মুখ। পঞ্চানন ছাগ মাংস খুব ভালবাসে। এত ভালবাসে যে অনেকের ধারণা তার পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব ছিল।

পাত্র যে কবে থেকে ওই ঘরটা অধিকার করে আছে তা সঠিক জানতে হলে ইতিহাস ঘাঁটতে হয়। পঞ্চানন ওখানে আছে, থাকে এবং থাকবে এ কথাটাই সবাই জানে। অনেক নক্ষত্রের ওঠানামা ঘটেছে ওর চোখের সামনে। কিন্তু সে সব ওর পক্ষে কোন অভিজ্ঞতা নয়। কেননা ও কিছু দেখে না। ঠাকুরের উপমা ধরতে গেলে ও হল সেই জাতের মাছ যার গায়ে পাঁক লাগে না। ও কেবল আছে। সিনেমার সাতে পাঁচে নেই। অথচ ষ্টুডিওর বাগান, পুকুর সব কিছু মিলিয়ে যে গোটা এলাকা তা ওর সব জানা। সে যেন অনেকটা গাইডের মত। ষ্টুডিওর মধ্যে কখন কোথায় গেলে কাকে পাওয়া যাবে, তা প্রায়ই ও ঠিক ঠিক বলে দিতে পারে। দেয়। পাত্র কুলির কাজ করে। বিভিন্ন মোট ভারী জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করা, সাজান, এখানকার জিনিষ ওখান করা এই তার কাজ। এই কাজটা কোনদিন কেউ তাকে দেয়নি। সে নিজেই তুলে নিয়েছে।

একদিন ষ্টুডিওতে কুলিগিরি করে দিন গুজরান করতে হবে এ' কথা জেনে পাত্র এখানে আসেনি। অনেকেই জানে এবং সে নিজেও মেজাজী থাকলে হেসে হেসে বলে, জানেন তো আপনাদের—বাবু (সে একজন বিখ্যাত প্রবীণ নটের নাম করে) যখন ঘর ছেড়ে এ 'নাইনে' এলো তখন থেকেই আমি এখানে আচি। আমি হলাম গিয়ে সে'বংশের চাকর। খোকাবাবুর মা গিন্নিমা আমায় পাঠিয়েছিলেন সে বাবুকে চোকে চোকে রাখার জন্তে।

তারপর কতদিন হয়ে গেল।

পঞ্চানন বলে, রাখতে রাখতে চোকের নাগাল কাটিয়ে বাবু কোথায় চলে গেলেন। কিন্তু সে রয়ে গেছে আজও।

এ'হেন পঞ্চাননের ঘুপসি ঘরের কাছে মাস সাতেক আগে একটা কুকুরের চারটে বাচ্চা হয়েছিল। দেখতে দেখতে বাচ্চাগুলো ধেড়ে হয়ে উঠেছে। পঞ্চানন ওদের দেখাশোনা করে। বেলা দু'পহরে যখন সে খাওয়া শেষ করে তখন নিত্যি সে ডাকে: আয়। কইরে? আ—আ—য়। ই গেলো যা।

কুকুর চারটেকেই দেখতে মোটামুটি এক। রঙেরও কোন বৈচিত্র্য নেই। চোয়াল, চোখ, থাবা, ওই একই। চারটেরই গায়ে এঁটুলি হয়েছে। দুপুরে নিরিবিলিতে যখন মাটিতে শোয় তখন থেকে থেকে পিঠের ওপর থাবলে ধরে।

পঞ্চাননের ডাক কুকুরগুলোর চেনা। দৌড়ে আসে তারা। জিব বার করে লেজ নাড়তে থাকে পাত্রকে ঘিরে। এঁটো কাঁটা ভাত সে ছড়িয়ে দেয়। বোধ হয় এদের জন্যই রসুই ঘরের উচ্ছিষ্ট সে খানিকটা সংগ্রহ করে আনে। চারটে কুকুর পরস্পরের দিকে চেয়ে গর্—র্—র্ করে ডাকে। তাদের দাঁতালো মুখ কুৎসিত হয়ে যায়। কুশ্রী। কাড়াকাড়ি করে খায়।

আর সেই অবস্থার মাঝে পঞ্চানন দাঁড়িয়ে একটার গায়ে গোড়ালি দিয়ে বেদম লাথি মারে, গাল দেয়। কুকুরগুলো তাকে কিছুই করে না। নিজেদের মধ্যেই খাওয়াখায়ি করে।

একদিন উল্লিখিত ছবির তরুণ পরিচালকের তা নজরে পড়ে গেল। তরুণ শিল্পীর গুণই এই যে তা সব কিছুকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে। বর্জন করার আগে অন্ততঃ একবার ভেবে দেখতে ভোলে না।

ষ্টুডিওর কুলি পঞ্চানন মহাপাত্রকে সেদিন পরিচালক অন্য কাজের বায়না দিলেন। কুকুরকে অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার কাজ। অভিনয় নয়, একটা অভ্যাসে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে কুকুরটাকে। এই কাজ।

—তুমি নও, পার্ট করবে তোমার কুকুর।

—আমার কুকুর নয় এঁজ্ঞে।

—আহ—হা। তোমার হবে। তুমি পার্ট শেখাবে ওকে।

—আমি?

আমি তোমায় শিখিয়ে দিচ্ছি।

কুকুরটার মৃত্যুর দৃশ্য গ্রহণ করা হবে এই পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক পরিকল্পনা মাথায় খেলে গেল। কুকুরটা সে বাড়ীর কর্তা ও কর্ত্রীর খুব ন্যাওটা, পায়ে পায়ে ঘোরে, এসব দেখানো দরকার। সেটা এমন কিছু কঠিন নয়।

হবে। সব হবে।

॥ ৩ ॥

পেট। খিদে। ওইখানে ঘা দিলে জানোয়ারও শিক্ষিত হতে দেরী করে না। নিজের গরজে শেখে। কুকুরটাও শিখতে লাগল।

প্রথম প্রথম পঞ্চানন তাকে নিজের ঘরের কোণে বেঁধে রেখে দিত। দু'বেলা খাওয়াতো। স্নান

করাতো সপ্তাহে ছ'দিন। বাবুরা কি একটা পাউডার আর ওষুধ এনে দিয়েছেন। তাই মাখাত। গায়ের পোকাগুলো গেলো মরে। ছাদের নিচে ঘরের কোণে চটের বিছানায় সে মহা আরামে চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকত। মাঝে মাঝে তার গায়ে হাত বুলোত পঞ্চানন। ফলে তাদের ছুজনের মধ্যে অচিরে একটা ভাব ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে গেল। পঞ্চাননের চোখের ভাষা, হাতের নির্দেশ কুকুরটা বুঝতে আরম্ভ করল। দরজায় দাঁড়িয়ে সে যে-কোন লোক ও বিশেষ ভাবে তার মার পেটের আর তিন সহোদর সহোদরাকে হাঁক ডাকে বাড়ী থেকে তফাতে রাখতে আরম্ভ করল।

এই সময় একপো মাংস নিয়মিত বরাদ্দ হল পঞ্চানন ও তার কুকুরের জন্ত। কাঁচা নয়, রাঁধা মাংস। এই বরাদ্দের সংগে সংগে শিক্ষা দেওয়ার রীতিও বদলে গেল দ্রুত। অবশ্বই পরিচালকের নির্দেশে। সকাল থেকে অভুক্ত রইল কুকুরটা। মাঝে মাঝে সে করুণ চোখে পাত্রের দিকে চায়। জিব বার করে, লেজ নাড়ে। হাঁ করে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে। তারপর শিকল বাঁধা অবস্থাতেই ছটফট আরম্ভ করল। নখে করে আঁচড়াল মেঝে। তর্জন, গর্জন, পেটে তার ক্ষিদের আগুন জলছে। অবশেষে খানিকটা শিথিল হয়ে সে ঝিমিয়ে পড়ল।

বেলা যখন ছু'পহর তখন নিজের খাওয়া শেষ করে পঞ্চানন তার শিকল খুলে দিল। খাবার রাখা ছিল মেঝেয়। কুকুরটা লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। তাকে সামলাতে গিয়ে থাবার ঘা খেল পঞ্চানন। আর একটু হলে কামড়েও দিত। হিংস্র ভাবে অনুরূপ শব্দ করে কুকুরটা তেড়ে এল তাকে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পঞ্চানন তার খেলা দেখল। ভাতের থালা আর মাংসের বাটী নিঃশেষ করেই কুকুরটা বাইরে বার হয়ে গেল। পঞ্চাননকে নিশ্চিন্ত করে ফিরেও এলো একঘণ্টার মধ্যে। শান্ত। নিশ্চিন্ত। স্বস্থানে শয়ান হল।

এইভাবে পর পর তিনদিন।

চতুর্থ দিনে একটি বেতের টেবিল ও ছুটি চেয়ার এলো পঞ্চাননের ঘরে। তা দেখে পাত্র তো হেসে বাঁচে না। এ সবই নাকি তার। বটে? সাত জন্মে চেয়ার টেবিল ঢোকেনি তাদের ঘরে। কোনদিন দরকারও হয়নি। খোকাবাবু—সে কতদিন আগে—যেদিন সিনেমায় নাম লিখালে তখন গিন্নিমার সে কি কান্না। কতবড় বংশ। লক্ষ্মীর মত চেহারা, কেঁদে কেঁদে সারা। খোকাবাবুর তখন যেন কার্তিকের কান্তি। আর কর্তা মশাই? গিন্নীমা লুকিয়ে লুকিয়ে পঞ্চাননকে পাঠালেন কলকাতার ষ্টুডিওতে। সেই থেকে সে আছে। তারপর কতদিন হয়ে গেল। তখন এখানকার বাবুরা ছিল বাঁধা, চেনা। এখন কতই আসছে। রোজ। হাজারে। কুকুরের ভাগ্যে এতদিনে চেয়ার টেবিল জুটলো তার। আরাম করে বসে পঞ্চানন একটা বিড়ি ধরাল।

পঞ্চাননের দিক থেকে যাই হোক। সঠিক অভ্যাসের জন্ত এ'সবের প্রয়োজন ছিল। ছুটো চেয়ারে একটায় বসবে লহরী অন্তটায় মণিমোহন। মাংসের বাটি থাকবে টেবিলের ওপর। বাটি খোলার পর নিজের মুখের কাছে মণিমোহনের মাংস তুলে নেওয়া, লহরীর দিকে চেয়ে থাকা, খাবার তুলে লহরীর কুকুরটার দিকে তাকান ও বলা, 'কি রে খাবি?'……ইত্যাদি এ্যাকসন ও ডায়লগ বলার মত সময় চাই। সেইভাবে কুকুরটাকে শিক্ষিত করা দরকার।

চতুর্থ দিন থেকে মাংসের বরাদ্দ দ্বিগুণ হল। একপো পঞ্চাননের একপো কুকুরের। মাপা। সকাল থেকে অভুক্ত থেকে ভরপেটে খেলে আর বাইরে যাবার দরকার হবে না। শিকল ধরে পঞ্চাননই ঘুরিয়ে আনতে পারবে।

চেয়ার টেবিল ছাড়াও আর একটা জিনিষ এলো পঞ্চাননের ঘরে। লকলকে একখানা বেত।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে কোনকিছুর একটা দানা পড়েনি কুকুরের পেটে। ক্ষিদে বাড়ছে আর বাড়ছে। নানাভাবে ক্ষিদেটা জানাল সে। ঝিমিয়ে গেল। অবশেষে সূর্য যখন মাথার ওপর উঠল তখন টেবিলের ওপর ঢাকনা খুলল পঞ্চানন। ঘ্রাণে চঞ্চল জন্তু লাফিয়ে উঠল। খাবার ছড়িয়ে গেল ঘরময়। ঝোল, টুকরো, ভাত চেটে চেটে খেতে লাগল জানোয়ারটা।

পরদিন থেকে পঞ্চাননকে সহকারী দেওয়া হল একজন। অশিষ্ট অধৈর্য হলে চলবে না। সে বেত চালায়। সপাং। নির্মম, নির্মোহ।

একটা চাবুকে ঠাণ্ডা হয় না ক্ষিদে, মানে না। আরো জোরে আবার চালায়।

এইভাবে রোজ

কুকুরটা জেনে গেল যে খাবারের বাটি খোলা হলে অস্থিরতা চলবে না। আর সে অস্থির হয় না। গুটি গুটি পায়ে চেয়ারের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় তারপর পঞ্চাননের পায়ের কাছে গুটিয়ে শুয়ে থাকে। বাটি খোলে পঞ্চানন। গন্ধে উঠে দাঁড়ায় কুকুর। পঞ্চানন একটু সময় নেয় তারপর একটা টুকরো তুলে নিয়ে বলে, 'কি রে খাবি ?' কুকুরটা কুঁই কুঁই করে। পায়ের ওপর মুখ রাখে।

একটা টুকরো ফেলে। সবটা ক্ষিধে পেটে।

॥ ৪ ॥

আর সামান্য মাত্র বাকী। এবার ওকে একটু সেটে অভ্যাস করিয়ে নেওয়া দরকার। চোখ ঝলসানো আলো, অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়াও আরও অনেক লোক থাকবে, এ ঘরের মাঝে একটু অভ্যস্ত হওয়া দরকার আছে। দু'চারদিন খালি সেটে ঘোরানো হল কুকুরটাকে। এই পর্যায়ে আর একটা নতুন সমস্যা দেখা গেল। চাবুক তার সমাধান নয়। দেখা গেল, পঞ্চাননকে ছাড়া কুকুর এক পাও চলতে রাজী নয়। পাত্র যেন ওকে তুক করেছে। সে ছুটে এসে পঞ্চাননের পায়ের আড়ালে গা লেপটে দাঁড়ায়।

অগত্যা, নানা ভাবে বুঝিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে পঞ্চাননকে (লহরীর বাড়ীর চাকর) পার্ট করাতে রাজী করানো হল।

হায়, হায়, হায় খোকাবাবুকে সামলাতে এসে এতদিনেও যা হয়নি একটা কুকুর সামলাতে গিয়ে যে তাই করতে হচ্ছে পঞ্চাননকে। চেয়ার টেবিল হলো, নিত্যি মাংস খাওয়া হলো এবার পার্টও হচ্ছে।

কয়েকটা নির্বাক দৃশ্য নেওয়া হল রাধুবেশী পঞ্চানন আর কুকুরটাকে নিয়ে। যেমন লহরীর স্বামী শচীন কাজে বার হয়ে গেছে। দূরে পথের ওপর তাকে দেখা যাচ্ছে এখনও—বাড়ীর চাকর রাধু দরজা বন্ধ করছে আর পাশে রয়েছে কুকুর। এমনভাবে ছবিটা নেওয়া হল যাতে বোধ হবে প্রভুকে—শচীনকে—এগিয়ে দেওয়ার জন্যই কুকুরটা দরজায় এসেছিল। শচীন কুকুরটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, এ দৃশ্যও নেওয়া হল। সুবিধে মত জুড়ে দেওয়া হবে। রাধু বাড়ীর যে আসবাব ঝাড় পোঁচ করছে আর তার পায়ে কুকুরটা ঘুরছে এ দৃশ্য তো নেওয়া হলোই। মোট কথা এই দেশী কুকুরটা এই ছবিতে একটা দুর্ঘটনাকে আড়াল করছে সে যে এ বাড়ীর একজন এই কথাটা এইসব নানা টুকরো নির্বাক দৃশ্যের প্রয়োগে দর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে।

পঞ্চানন পার্ট করতে রাজী হয়েছে বটে কিন্তু বলে দিয়েছে যে কথা সে বলতে পারবে না। তাই 'আজ্ঞা' 'হু' 'যাই' 'এই যে' এইসব ছাড়া তার কথা বলা বিশেষ কিছু নেইও।

আজ সেই দৃশ্য নেওয়া হবে। কুকুরটার মৃত্যুর দৃশ্য। সবাই তৈরী। সেই সাজলো। বাইরে কৃত্রিম বৃষ্টি হচ্ছে। মণিমোহনের দিকে পিছন ফিরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লহরী। এইখান থেকেই 'টেক'! কয়েকবার মহড়াও হয়ে গেছে। অবশ্য খাওয়াটুকু ছাড়া।

তীব্র আলোয় সেট ভেসে যাচ্ছে। সাউণ্ড ভ্যানের সঙ্গে পরিচালক কথা বলে নিলেন। লহরীর ঘরের লম্বা আয়নায় আলো পিছলে পড়ছে। মণিমোহনের মুখের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরা অন। ক্ল্যাপষ্টিক দেওয়া হল।

পরিচালক ইউনিটের সকলকে বলে দিয়েছেন যে সেটে কুকুর যদি আপন মনে ঘুর ঘুর করে তাহলে অসুবিধের কিছু নেই। সেইভাবেই দৃশ্যটা নেবে। স্বাভাবিকই হবে তাতে।

টেবিলের ওপর ঢাকা টিফিন কৌটোয় মণিমোহনের আনা মাংস রয়েছে। নকল নয়, সত্যি বিষ মাখান আছে তাতে। দৃশ্য গ্রহণ চলছে।

—রাধু।

মণিমোহনের ডাকে পাত্র সেটে এসে ঢুকেছে। পিছনে কুকুরটা। লেজ নাড়ছে। জিব বার করছে।

—একটা প্লেট নিয়ে এসো।

—একটা?

লহরী জানতে চাইল।

—হ্যাঁ, একটাই।

প্লেট আনতে চলে গেল রাধুবেশী পঞ্চানন। কুকুরটা ঘুর ঘুর করে লহরীর কাছে বসে পড়ল। টেবিলে ঢাকা বাটি আছে। বাটিতে আছে ক্ষিধের আগুন নেভাবার খাবার। ও জানে।

রাধু ফিরল। বাটি খুলল মণিমোহন। মৃদু খোসবাই ছড়িয়ে গেল হাওয়ায়। কুকুরটা উঠে দাঁড়াল। কুঁই কুঁই করে ডাকল। যেমন ডাকে পঞ্চাননের ঘুপসি ঘরে। লহরীর পায়ের ওপর মুখ রাখল। যেমন রাখত পঞ্চাননের পায়ে।

মণিমোহনের হাত চলে এসেছে প্রায় তার মুখের কাছে। নিজের মুখে দেওয়ার আগে লহরীর দিকে চেয়ে আছে। একটা টুকরো তুলে নিতে নিতে লহরী বলল, কোন মানে হয় না এ ছেলেমানুষীর।

কুকুরটা তখন চেয়ে আছে লহরীর হাতের দিকে। সেদিকে চেয়ে লহরী বলল, কি রে খাবি?

এই বলে তার হাতের টুকরোটা মাটিতে ফেলে দিল।

টুকরোটা ফেলে দেওয়া মাত্র 'না', 'না' বলে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে মণিমোহন। চেয়ারটা দুলে উঠেছে। এই বাধা দেওয়ার অভ্যস্ত করানো হয়নি কুকুরটাকে। তাই সে গ-র্-র করে একটা প্রতিবাদ জানাল।

তারপরই বাগিয়ে ধরল টুকরোটাকে।

কুকুরটার দাঁত বসে গেছে। ক্যামেরা নিবদ্ধ তারই ওপর। যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব শব্দ সমারোহে হঠাৎ ছেদ পড়েছে। নিস্তব্ধ চারিধার। যান্ত্রিক মৃদু একঘেয়েমি কানে যাচ্ছে না। চারপাশের নানা কুশলী

শিল্পী আর সুনিপুণ অভিনেতাদের মাঝে দাঁড়িয়ে একটা নির্বোধ জানোয়ার তার আহার নিয়ে হাঁসফাঁস করছে।

যা আশা করা গিয়েছিল মৃত্যুর দৃশ্যে তার চেয়েও ভালো অভিনয় করছে কুকুরটা। দৃশ্যগ্রহণের অখণ্ড মনোযোগে ক্যামেরাম্যানের চোখ মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। পরিচালকের দৃষ্টি জৈবিক আবেগে সৃষ্টির উল্লাসে জলজ্বল্ করছে।

সেই মুহূর্তে পরিচালকের মনে হল পুতুল নাচের নাটমঞ্চের রশিটা তার হাতে। সে পরিচালক। ক্যামেরাম্যান ও অন্যান্য যন্ত্রকুশলীরা তার আজ্ঞাবহ। অভিনেতারা তার সৃষ্টির অংশীদার। আর সকলে দর্শকমাত্র। প্রতিবাদের, প্রতিরোধের অধিকার নেই। সব বোবা। সে যাই করছে, তাই হচ্ছে। মরছে একটা কুকুর।

কুকুর? মাত্র কুকুর?

আশ্চর্য! ব্যঞ্জনার এ দিকটা আগে মাথায় আসে নি। এ তো কেবল একটা সামান্য দৃশ্য গ্রহণ নয়। বর্তমান পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চটাই যেন আজ ষ্টুডিওর এই বিশেষ সেটে মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদি আগে একবারও মনে হত তাহলে একটা প্রতীকের মাধ্যমে এ'দিকটারও আভাস দিতে পারতেন তিনি। ইস্। মহা ভুল হয়ে গেছে। যে আইডিয়াটা মনে এলে সেটাকে সেলুলয়েডে বন্দী করা গেল না।

তীব্র বিষে নেতিয়ে যাচ্ছে কুকুরটা। একবার কেঁপে, অন্তিম চাহনিতে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে— মারভেলাস। অপূর্ব! কি করুণ এই চোখ মেলার চেষ্টা—মেঝের ওপর নখের আঁচড় দিয়ে, অজস্র ফেনা উদগীরণ করে যখন আশাতীত রকম ভালো অভিনয় করে চলেছে কুকুরটা তখন—,

ঠিক তখন 'ওরে বাপরে' বলে চিৎকার করে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল পঞ্চানন। হুমড়ি খেয়ে প্রায় কুকুরটার ওপর পড়ে গেছে।

কেউ ভুল করেনি। পরিচালকের নির্দেশের এক চুল এদিক ওদিক করেনি কেউ। কথা ছিল পাত্র কোন কথা বলবে না। কথা বলতে সে নিজেই তো চায় নি। এর মধ্যে, চার পাশে সবাই যখন বোবা তখন নিতান্ত একটা গেঁয়ো ডায়লগ্ 'ওরে বাপরে' বলে কুকুরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে।

—ইডিয়ট!

কাট্।

পরিচালকের বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি পঞ্চাননকে যেন বিঁধছে। দু'পা এগিয়ে এসে পঞ্চাননের জামা ধরে টেনে বললেন, বাইরে গিয়ে দাঁড়াও।

চার পাশে চেয়ে দেখল পাত্র। সবাই যেন নীরবে দৃষ্টি দিয়ে তাকে ছুষছে। কান্নাটা গলা ঠেলে চলে এসেছিল হঠাৎ। বাঁধতে পারে নি। তার চোখ আবার শুকনো খটখটে হয়ে গেল।

এরপর মরা কুকুরটার কতকগুলো ক্লোজ সট নেওয়া হল বিভিন্ন কোণ থেকে। মরা কুকুরের গলায় মালা দিয়ে ছবি নেওয়া হল কয়েকটা। ছবির পাবলিসিটির ষ্টীল হিসেবে ব্যবহার করা হবে।

* * *

পরিচালক মনে ভেবেছিলেন যে এডিটিংএর সময় পঞ্চাননের 'ওরে বাপরে' বলে ডুকরে কেঁদে ওঠা ও কুকুরটাকে জড়িয়ে ধরা কাঁচি চালিয়ে দেবেন তিনি। বাদ দেবেন।

কিন্তু কি ভেবে ঠিক শেষ মুহূর্তে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। ওটা রইল।

॥ ৫ ॥

পরিচালকের দৃষ্টি আছে। ছবি প্রদর্শিত হওয়ার পর সমালোচকেরা সমস্বরে অজস্র অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে রাধুবেশী পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় নবীন কিন্তু বর্ষীয়ান অভিনেতা শ্রীপাত্রর। ছবির টাইটেলে পঞ্চাননের নাম লেখা হয়েছে 'শ্রীপাত্র।' তাঁর মেঠো উচ্চারণ, সরল চাহনি, অকৃত্রিম অভিব্যক্তি, বুক ফাটানো কান্না এই সামান্য চরিত্রটিকে এমন অসামান্য করে তুলেছে যে ছবির শেষেও যেন তা পিছন থেকে টেনে ধরে। অপূর্ব। আবেদনময়ী কোন নবীনা অভিনেত্রীকে উপহার না দিয়ে এহেন শক্তিমান একজন পার্শ্বচরিত্রাভিনেতাকে উপস্থিত করার জন্য পরিচালককে সাধুবাদ……ইত্যাদি ইত্যাদি।

নিরক্ষর পঞ্চানন এসব কথা জানে না। ষ্টুডিওর চত্বরে থাকলে কানে কানে সেও শুনতে পেতো। কিন্তু সেদিনের সুটিং শেষে সারারাত নিজের ঘুপসি ঘরের মেঝেয়, দেওয়ালে এবং সব শেষে নিজের বুকের মধ্যে একটা ক্ষুধার্ত কুকুরের কুঁই কুঁই ডাক কিছুতেই থামাতে না পেরে পরদিন ষ্টুডিও ত্যাগ করে চলে গেছে। তার খোঁজ করা হয়েছিল এইমাত্র সেদিন,—যেদিন ইউনিটের সকলকে নিয়ে ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। বলাবাহুল্য, তাকে পাওয়া যায়নি।

হয়তো পঞ্চানন কলকাতার বন্দরে কুলীর কাজ করে। কিম্বা—

কলকাতায় কত লোক যে কিভাবে নিজের অন্ন সংস্থান করে তা কি কেউ বলতে পারে?

ষ্টুডিও চত্বরে পরিচালকের নির্দেশে কুকুর মরে। বাইরে?

—বাইরে?

পঞ্চানন সেই অনেক বড় কলকাতার, বাইরের কলকাতার বাসিন্দা হয়ে গেছে। হয়তো বা পার্শ্বচরিত্রও।

উক্ত ছবির সমালোচকেরা রাধুবেশী শ্রীপাত্রের পরেই কুকুরের অভিব্যক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। তার জন্যেও পরিচালককে সাধুবাদ, ধন্যবাদ……ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বার্লিনের ভূগর্ভস্থ কক্ষে হিট্‌লার ও তাঁর প্রণয়িনী ইভা গম্ভীর মুখে পাশাপাশি বসে আছেন। বার্লিনের পতন হয়েছে, নাৎসীতন্ত্রের ধ্বংস ঘটেছে। আর কোন আশাই নেই। মরতে হবে, তবে শত্রুর হাতে নয়।

হিটলারের হাতে বিষবটিকা। অতি তীব্র বিষ। পোষা কুকুরটাকেও হয়ত এ বিষ খাওয়াতে হবে।

হিট্‌লার ও ইভার মধ্যে অন্তিম তর্ক উঠ্‌ল, কে এ বিষ আগে খাবে, অথবা দুজনে এক সঙ্গেই।

ইভা ছলছলে চক্ষে বললেন—"তোমার মরণ আমি চোখে দেখতে পারব না, ও বিষ আমিই আগে খাব।"

হিটলার বললেন—"তুমি শুধু প্রেম দাও নি ইভা, আমার জন্যে তোমার জীবনও দিতে এসেছ। মৃত্যুর গরিমা দিয়ে প্রেমকে অমর করেছ,—তোমার প্রেমের তুলনা নেই।"

—"সে প্রেম শিখেছি আমি তোমারি কাছে।" ইভা বিষের বড়ি তখনি নিজের মুখে ফেলে দিলেন।

॥ রবীন্দ্রপাঠচক্র ॥

"সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিস এবং প্রাণের প্রকাশ তার মধ্যে আছে, একথা বলা বাহুল্য * * প্রাণের যে ধর্ম, সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম। * * * বৈদিক যুগে এক রকম সংগীত ছিল—'সামগান'। সেই সামগান নিঃসন্দেহে তখনকার যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁদের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল—বিশেষ রূপ নিয়ে তখনকার ক্রিয়া-কর্মে, যজ্ঞে তা রস রূপ পেয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে তা এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে, তখনকার সেই সামগান কি রকম ছিল তা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। তারপর এল কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের যুগ। তখনকার সংগীত, নৃত্য, গীত বিশেষত্ব লাভ করেছিল সেই সময়কার গভীর সাম্রাজ্য, গৌরব এবং আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে। আনন্দ যখন হোয়ে উঠেছিল অভ্রভেদী—তখন তারই অনুরূপ সংগীত যে জন্মেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

"কিন্তু বাঙলাদেশের একটা বিশেষত্ব আছে; বাঙালী ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হোয়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। তার প্রকৃতিতে যখন উদ্বৃত্ত হয়, তখন সেই শক্তি যায় বর্ধনের দিকে। পরিমিত ভাবে যখন কলে তখন আপনাকে সে প্রকাশের সম্পদ পায় না। সেই হৃদয়াবেগ যখন তীর ছাপায় তখন সে উচ্ছ্বাসকে সে গানে নৃত্যে উচ্ছ্বসিত করে। দেখুন, বৈষ্ণব সংগীত—সমস্ত হিন্দুস্থানী সংগীতকে পিছনে ফেলে বাঙালীর প্রাণ আপনার সংগীতকে উদ্ভাসিত করেছে—যেহেতু তার ভেতরের হৃদয়াবেগ সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না কোরে পারে নি। যে কীর্তন বাঙালী গেয়েছিল তা তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান্ প্রত্যুত্তর। * * আজকের দিনের বাঙালী, যে বাঙালী একদিন এই কীর্তনের মধ্যে, লোক-সংগীতের মধ্যে বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে, সে কি আজ নূতন কিছু দেবে না? সে কি কেবলি পুনরাবৃত্তি করবে?

"আমি বলব, আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না; আমরা যা-কিছু সৃষ্টি করি না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় ধারা আপনি যাবে। আমাদের সেই আত্মা, সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পূর্বতন কালে কীর্তন-গানে, বাউলে ছিল। সেই রকম আজ যদি বাঙালী আপনাকে সংগীতে চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে তবে সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না, যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যা কিছু করবে নিজেকে মুক্ত কোরে—নকল কোরে নয়।"—(২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

// রবীন্দ্র পাঠচক্র //

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কাব্য

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

আর্ষ রামায়ণে একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক আছে—

'যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়নী কথা ভূতলে প্রচরিষ্যতি॥'

যতদিন গিরি ও নদীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন ভূতলে রামায়ণী কথা প্রচারিত হইবে।

রামায়ণ সম্পর্কে যে কথাটি বলা হইয়াছে, এক হিসাবে পৃথিবীর শেষ কাব্যমাত্রের সম্পর্কেই সে কথাটি সত্য। আমরা এখানে 'কাব্য' কথাটি ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ন্যায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। বাস্তবিক পৃথিবীর কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনাই দেশ বা কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়।

অথচ সাহিত্য কখনও ঋজুগামিনী কখনও বক্রগামিনী নদীর ন্যায় প্রবাহিত হয়। যুগে যুগে জীবন ও জগৎসম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে, মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নব-নব পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেরও ভাষা, ভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায় সাহিত্যের মধ্য দিয়াও যেন 'মহাভুজঙ্গ খোলস খুলিছে হাজার হাজার বছর ধরে।' মানবীয় সাহিত্যের প্রবাহিনী কখনও মন্থরগামিনী, কখনও খরস্রোতা, কখনও গ্রীষ্মকালের নদীর ন্যায় শীর্ণকায়া, কখনও ভাদ্রের নদীর মত কূলপ্লাবিনী। জাতির জীবনে যেমন কখনও আসে জড়তা, কখনও আসে মহাভাবের প্লাবন, সাহিত্যেও তাই। সকল দেশে সকল যুগে মহৎ সাহিত্যের জন্ম হয় না। তবে, প্রত্যেক যুগের সাহিত্যেই বিশেষ প্রবণতা বা Trend লক্ষ্য করা যায়। তাই আধুনিক কাব্যের বিচারেও ইহার বিশেষ প্রবণতাটি লক্ষ্য করিতে হইবে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় আধুনিক, তাহারও কারণ নির্ণয় করিতে হইবে।

'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত আধুনিকতার লক্ষণ ও কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। যে সমস্ত কবির রচনার অংশ এই প্রবন্ধে অনূদিত হইয়াছে, তাহাদের বিশদ পরিচয় নূতন সংস্করণের গ্রন্থ-পরিচয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় যাঁহার লীলামাত্র, তাঁহার নিকট অবশ্য কাল অন্তহীন অর্থাৎ কালের কোন অস্তিত্বই নাই। আমাদের প্রয়োজনের অনুরোধে আমরা সেই অনাদি অনন্ত কালকে কয়েকটি সীমারেখায় চিহ্নিত করি। ব্যাকরণ শাস্ত্রে কালকে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। সাহিত্য বিচারেও আমরা প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক (কখনও কখনও অতি আধুনিক বা সাম্প্রতিক) এই কথাগুলির প্রয়োগ করিয়া থাকি, কিন্তু সাহিত্যে আধুনিকতা যে শুধু কালগত নয়, এ কথা

সকলেই স্বীকার করিবেন। একজন ইংরেজ সমালোচক লিখিয়াছেন, ভিক্টোরীয় যুগে এমন অনেক লেখক ছিলেন যাঁহারা চিন্তার দিক দিয়া অপর কোন শতাব্দীর লেখকের সগোত্র। আমাদের এই বাংলাদেশের মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াও এবং চিন্তার ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়া প্রগতিশীল হইয়াও কাব্য রচনায় ক্ষেত্রে ছিলেন ভারতচন্দ্রের অনুগামী। নূতন যুগের ভাবাদর্শ তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, আধুনিকতা 'কালের কথা ততটা নয়, যতটা ভাবের কথা।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনমুকরণীয় ভঙ্গিতে আধুনিকতার বিশ্লেষণ করিয়াছেন—

'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলা হয় মডার্ণ। বাংলায় বলা যাক, আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'

এক কালে যেসব কবি আধুনিক বলিয়া পরিগণিত হইতেন, যাঁহারা নিয়মের বন্ধন হইতে সাহিত্যকে মুক্তিদান করিয়া 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ' এই উক্তিটির যথার্থতা প্রমাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' যুগের কবি বলিয়া পরিচিত। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহারা রোমান্টিক যুগের কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস্, উইলিয়ম ব্লেক প্রভৃতি কবিদের আবির্ভাব হইয়াছিল এই যুগে। ইঁহাদের পূর্বে চলিয়াছিল ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসিকাল যুগ। রোমান্টিক যুগেও কাব্যের স্রোত নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছিল। ব্যক্তির আত্মপ্রকাশই ছিল তখন কবিদের কাব্য-সাধনার উৎস। তাঁহারা সৃষ্টি করিতেন মায়ার জগৎ, তাঁহাদের কাব্য যাঁহারা পাঠ করিতেন, তাঁহারা মুগ্ধ বিস্ময়ে এই রূপে-গন্ধে-গীতে ভরা পৃথিবীর দিকে তাকাইতেন। তাই আধুনিকেরা বলেন, সে যুগে কবিদের দৃষ্টি ছিল আচ্ছন্ন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিকের মত অনাসক্ত দৃষ্টিতে জগৎকে দেখিতে পারেন নাই, জগতের কুশ্রীতা বা কদর্যতার দিক হইতে তাঁহারা মুখ ফিরাইয়াছেন। কিন্তু আধুনিক কবিগণ মানুষের মনকে মোহমুক্ত করিতে চাহিলেও নিজেরা অনাসক্ত বা মোহমুক্ত হইতে পারেন নাই। ইঁহারা হয়তো সৌন্দর্যের প্রতি মোহ ত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু যাহা কুৎসিত ও কদর্য, তাহার প্রতি ইঁহারা পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ কালের কবিদের এই প্রবৃত্তি সুস্থ মনের পরিচায়ক নয়, তাঁহারা যেন স্পর্দ্ধাভরে সঙ্কোচের আবরণকে সবলে ছিন্ন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের সম্পর্কে শুধু বিদ্রূপ মন্তব্যই নয়, স্থানে স্থানে কঠোর মন্তব্যও করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'বিশ্বের প্রতি উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। * * আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক'।

এই আধুনিকতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ এমি লোয়েল নামক একটি মহিলা কবির কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়াছেন। একটি কবিতায় এই কবি কোন সুন্দরীকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের সৌন্দর্য মোহকে কশাঘাত করিয়াছেন। আর একটি কবিতা তিনি রচনা করিয়াছেন, লাল চটিজুতা দোকান সম্পর্কে। এই মহিলা কবি দেখাইতে চাহিয়াছেন, সৌন্দর্যের প্রতি তাঁহার কোন মোহ নাই। কিন্তু সত্যই কি তাঁহার দৃষ্টি মোহমুক্ত? বস্তুতন্ত্রতার নামে এই আতিশয্য, ইহা অনেকের মনে পীড়া দেয়,

রবীন্দ্রনাথকেও দিয়াছে। কবি এই প্রসঙ্গে এজরা পাউণ্ড ও টি, এস, এলিয়টের দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। আধুনিক কালের অনেক কবির মনে সৌন্দর্যের প্রতি, আদর্শের প্রতি এই যে বিরূপতা দেখা দিয়াছে, তাহার মূলে আছে য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রভাব। এই মহাসমর মানুষের প্রত্যয়কে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। এতকাল মানুষ যে প্রতিষ্ঠা ভূমির উপর দণ্ডায়মান ছিল, তাহার ভিত্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, ফলে মানুষ সত্য ও সুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আধুনিক কবিতায় সেই মনোভাব সুস্পষ্ট।

অনাসক্ত, মোহমুক্ত দৃষ্টিই আধুনিকতা কিন্তু এই দৃষ্টি কোন বিশেষ কালের সীমাবদ্ধ নয়। সাহিত্যের আধুনিকতা শাশ্বত কালের। রবীন্দ্রনাথ সহস্র বৎসর পূর্বেকার এক চীনা কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, সেকালের কবিতাও কতখানি আতিশয্য বর্জিত, মোহমুক্ত ও বস্তুতান্ত্রিক হইতে পারে, কিন্তু সে কবিতার কোথাও মানবতার প্রতি বিদ্রূপ বা অবিশ্বাস নাই। এ কালের তথাকথিত আধুনিক কবিরা চিত্তের প্রশান্তি ও স্থৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাই কদর্যতা ও বীভৎসতার প্রতি তাহাদের আকর্ষণ এত দুর্দমনীয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাদিগকে সাহিত্যে অঘোরপন্থী বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

'বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাত্র শ্রদ্ধাকে যদি বল সেন্টিমেন্টালিজম্, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতি-ভদ্রয়ানার পাণ্ডা বলে ব্যঙ্গ কর, তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উল্টো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়। সায়েন্সেই বল, আর আর্টেই বল নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন, য়ুরোপ সায়েন্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।'

আমরা দেখিলাম, আধুনিক কবিতার আতিশয্য ও রুচিবিকারকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন। যে এমি লোয়েলের কথা কবি উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি চিত্রধর্মী কবি। ইনি কাব্যে যে নূতন ধারার প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন, উহাকে বলা হয় ইমেজিষ্ট মুভ্মেণ্ট্। এলিয়টের কাব্যেও খোলা চোখে জীবন ও জগৎকে দেখিবার একটা ভান আছে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে সৌন্দর্যের প্রতি একটা আকর্ষণ ছিল বলিয়াই ইঁহারা সেই আসক্তিকে সদর্পে পরিহার করিয়াছেন। ইঁহাদের দৃষ্টিও যে মোহমুক্ত নয়, সেকথা রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট করিয়াছেন। অবশ্য সম্প্রতি কাব্যের ধারা আবার নূতন পথে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ যুগের কবিগণ, যেমন রবার্ট গ্রেভস্, জর্জ ম্যাকবেথ, লরেন্স ডারেল, ফিলিপ লার্কিন, এন্ রাইট প্রভৃতি আত্মগত ধ্যানধারণা ও হৃদয়াবেগকে একেবারে অস্বীকার করেন নাই। অবশ্য এ যুগে অন্তত কাব্যের ক্ষেত্রে কোন অসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিতেছে না এবং এ যুগের কবিরা অনেক সময় ভাষার দুর্বোধ্যতার দ্বারা ভাবের দৈন্যকে ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

'ভাষা ও ছন্দে' রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মানুষের ভাষা একদিন প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ ছিল, কবি উহাকে ভাবের স্বাধীন লোকে মুক্তি দিলেন। মানুষ প্রয়োজনকে অতিক্রম করিতে পারে বলিয়াই তাহার গৌরব। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি,' অর্থাৎ আনন্দ হইতে ভূত সকলের উৎপত্তি হয়, প্রাণিসকল আনন্দেই বিধৃত থাকে এবং আনন্দেই অনুপ্রবিষ্ট হয়। উপনিষদের ভাবধারায় দীক্ষিত কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—সাহিত্যেও আনন্দেরই প্রকাশ, তাই সাহিত্য অহৈতুক। অবশ্য এ কথার অর্থ ইহা নয় যে, সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নাই, অথবা সাহিত্যের মূল পৃথিবীর মাটিতে নিহিত নয়। আবার আমরা গীতার

ভাষায় বলিতে পারি, সাহিত্য যেন ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থ বৃক্ষ। আমাদের উক্তি দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে উহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ এদেশের আলঙ্কারিকদের রসবাদ ও উপনিষদের ঋষির আনন্দবাদকে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কবি রস ও আনন্দকে সৌন্দর্য হইতে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। কবি বলেন, যেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য, সেখানেই সৌন্দর্য। গোলাপ ফুলের মধ্যে এই ঐক্য আছে বলিয়াই গোলাপফুল সুন্দর। আর এই ঐক্য আমার মধ্যে ঐক্যবোধকে জাগ্রত করে।

প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের মতে রস জিনিষটি সহৃদয় সংবাদী, ইহা অনুভূতির সামগ্রী। যে আধুনিক কবিতা এই অনুভূতির মর্যাদা দেয় নাই, তাহা শাশ্বত ভাবে আধুনিক নয় অর্থাৎ তাহা বিশুদ্ধ সাহিত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ বলেন—'অনুভূতির বাইরে রসের কোন অর্থই নাই। রসমাত্রই তথ্যকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রসপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ আর আমার প্রকাশ একই কথা (সাহিত্যতত্ত্ব)।

এই চলমান, জীবন যার নাম।

এই চলমান নদী, জীবন যার নাম, তার একমাত্র সত্য হলো, সে চলেছে, অবিচ্ছেদ্য অবিরাম তার গতি।

মানুষের কত পরিশ্রম, কত আকাঙ্ক্ষা, কত প্রাণপাত আবেগ আর আকুলতা, কোন মূল্য নেই তার কাছে। রাজাকে এক নিমেষে সিংহাসন থেকে নামিয়ে ধুলোয় করে দেয় ধুলো, সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার শেষে মানুষ রেখে যেতে পারে না তার অন্তিম সৎকারের খরচ, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা আর সর্বরিক্ত ভিখিরি একই মাটির নীচে অচিহ্নিত অবস্থায় থাকে পড়ে, কোন জবাবদিহি খুঁজে পাওয়া যায় না সেই বিচারকের রায়ের, জীবন যার নাম।

আবার তার গতির রহস্যলোক থেকে কখন কি মন্ত্রে যে ধুলোকে সে পরিণত করে স্বর্ণমুষ্টিতে, কাল যে পথের ধারে পড়েছিল, জগতের উপেক্ষার অন্তরালে, রাত প্রভাতে তাকেই টেনে নিয়ে বসায় বিশ্ববাঞ্ছিত সিংহাসনে, প্রাপ্তির ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে ভিক্ষুকের জীর্ণ থলি, কেউ জানে না কি করে তার রাজ্যে কুঁড়ি হয়ে ওঠে ফুল, ফুল হয়ে ওঠে ফল।

মানুষের সমস্ত বিচার বিতর্ক, অতি সূক্ষ্ম হিসেবের কড়াক্রান্তি বিভাগ, ভালমন্দের চুল-চেরা বিচার, কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না তার ছন্দহীন গতির শুধু অবিরাম চলা।

তার কাছে একমাত্র সত্য, সে চলেছে, চিরদিন সে শুধু চলেছে, এই চলমান নদী, জীবন যার নাম।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

শশিনাথ

পাত্র-পাত্রী পরিচয়

সোমনাথ	...	...	সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ
শশিনাথ	...	...	সোমনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা
বরেন	...	...	শশিনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু
সুধীর	...	...	শশিনাথের অপর এক বন্ধু
রঘু	...	...	ভৃত্য
উর্ম্মিলা	...	...	সোমনাথের স্ত্রী
লীলা	...	...	উর্ম্মিলার ভগ্নী ! সোমনাথের আশ্রিতা
সরযূ	...	...	সোমনাথের পিতৃবন্ধুর কন্যা

নাট্যরূপদাতার নিবেদন

পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা। পরম শ্রদ্ধাস্পদ উপেন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়ায় 'বিচিত্রায়' লিখি।: আমার সাহিত্য-জীবনের গুরু ছিলেন তিনি। সেই সময় শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে', রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' এবং আরও দু'একখানি বিখ্যাত উপন্যাসকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করে অভিনয় করে ছিলাম এবং তাদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 'শশিনাথ' উপন্যাসটিকেও নাটকাকারে গেঁথেছিলাম। শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ আমার এই নাট্য প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে অনুমোদন করেছিলেন। এতদিন পরে তাঁর 'স্মৃতি সংখ্যায়' এটিকে প্রকাশ করে তাঁকে প্রণাম জানাবার সুযোগ পেয়ে পরম কৃতার্থ বোধ করছি।

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত

শশিনাথ

নাট্যরূপ : অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(শশিনাথের পড়িবার ঘর। অধ্যয়নরত শশিনাথ ক্ষণকাল পরে পরদা সরাইয়া উর্ম্মিলার প্রবেশ)

শশী। (মুখ তুলিয়া) কি মনে করে বৌদি ?

উর্ম্মিলা। (হাসিমুখে) একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। যদি সত্যি কথা বলো তো বলি।

শশী। কি কথা ?

ভাগলপুরের বাড়ীতে শশীনাথ রচনারত উপেন্দ্রনাথ

উর্ম্মিলা। আগে বল সত্যি বলবে।

শশী। (ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া) যদি কোনও কথা না বলি, সে স্বতন্ত্র কথা : কিন্তু যদি বলি তো মিথ্যে বলবো না। অতএব তোমার প্রশ্ন কি বল।

উর্ম্মিলা। লীলাকে তোমার পছন্দ হয় ?

শশী। (হাসিয়া) এই কথার জন্তে এত ভূমিকা করছিলে ? এ তো অতি সহজ কথা। আর এর সত্যি উত্তরই বা দেব না কেন ?

উর্ম্মিলা। পছন্দ হয় ?

শশী। (সকৌতুকে) হয়।

উর্ম্মিলা। তবে তাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি নেই ?

শশী। (সহাস্যে) এবার কঠিন প্রশ্ন করেছো বৌদি। জগতে যতগুলি পছন্দ-সই মেয়ে আছে, সবগুলিকেই দেখে আমার পছন্দ হবে। কিন্তু তাই বলে যদি প্রত্যেকটিকেই বিয়ে করতে আমার আপত্তি না থাকে সে তো বড় ভয়ানক কথা !

উর্ম্মিলা। কিন্তু আমি তো ভয়ানক কথা জিজ্ঞাসা করিনি ভাই। আমি একটিরই কথা জিজ্ঞাসা করছি। তার সম্বন্ধে তোমার কোনও আপত্তি নেই তো ?

শশী। ক্ষমা কর বৌদি, আমার কথায় যদি নিরাপত্তি-কর কোনও কথা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে ভাষার ওপর আমার কিছুমাত্র দখল নেই। কারণ, তুমি যা বুঝতে চাইছ, আমি ঠিক তার উল্টোটাই বরাবর বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

উর্ম্মিলা। (ম্লানমুখে) লীলা বাপ-মা-মরা, তার ওপর তোমাদের ঘাড়ে-পড়া তাই কি তোমার অমত ?

শশী। এ-কথা যদি ঠাট্টা করেও বলে থাক, তাহলেও ভাল করনি বৌদি। আমার ওপর কি তোমার সত্যিই এই ধারণা ?

উর্ম্মিলা। তবে তোমার অমত কেন ?

শশী। অমত কেন, সেকথা শুনলে তুমি এখুনি ইংরেজী শিক্ষার কুফলের বিষয়ে লেকচার দিয়ে বসবে।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) ওঃ! লেখাপড়া শেষ না করে বিয়ে করবে না, সেই কথা বলতে চাও?

শশী। হেসে ফেল্লে যে? কথাটা একেবারেই তুচ্ছ নাকি?

উর্ম্মিলা। না তুচ্ছ কেন! তাহলে লীলাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলছো তো? তা বেশ তো! এম-এ পাশ করতে তোমার তো আর মাস কয়েক দেরী আছে। তোমাদের মতে লীলা যদি সতেরো বছর অপেক্ষা করে থাকতে পারে, তাহলে আরও দু'চার মাস নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।

শশী। (হাসিয়া) দেখ বৌদি, বাঙালী বাড়ীর বৌ না হয়ে তুমি যদি উকীল ব্যারিষ্টার হতে, তাহলে পৃথিবীর অনেক উপকার হতো। কিন্তু বৃথা পরিশ্রম করছো—এ মামলা তোমার টিকবে না—কিছুতেই আমার কাছে ডিগ্রী পাবে না।

উর্ম্মিলা। (বিরস কণ্ঠে) এ আমার এমনই কি অন্যায় মামলা ঠাকুরপো, যে কিছুতেই টিকবে না?

শশী। অন্যায় না হলেও অনেক সময় মামলা টেকে না।

উর্ম্মিলা! সে তো অবিচার!

শশী। অবিচার নিশ্চয়ই—কিন্তু অবিচার করছে কে? যে জোর করে বিয়ে করাতে চাচ্ছে সে, না যে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না, সে? বিয়েটা যদি শুধু নিজেকে নিয়ে একটা ব্যাপার হতো, তা হলে তোমার কথায় আমি দিনের মধ্যে তিনবার বিয়ে করতাম। কিন্তু এ যে নিজের সুখ দুঃখ ভাগ্য অদৃষ্টের সঙ্গে অন্য একজনকে বাঁধতে হবে। আমাদের হিন্দুর ঘরে সে আবার এমনি বাঁধন যে কাটবে ছিঁড়বে কিন্তু খুলবে না।

উর্ম্মিলা। কিন্তু তোমাকে তো একদিন এ বাঁধনে পড়তেই হবে ঠাকুরপো!

শশী। কে বল্লে পড়তেই হবে। অবিশ্যি আমি এতবড় আহাম্মক নই যে হলপ নিয়ে বলবো, কখনও পড়তে পারিনে। তবে মনের বর্তমান অবস্থা থেকে অন্ততঃ এটুকু জোর করে বলতে পারি যে, না পড়তেও পারি।

উর্ম্মিলা (অনুযোগের সুরে) কিন্তু কখনও যদি বিয়ে কর, তখন তো মনে হবে যে বৌদিদির অনুরোধ রাখনি

শশী (হাসিয়া) বেশ তো, তখন না হয় দণ্ড স্বরূপ বিয়ে বন্ধ করে দিও।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) মন্দ কথা নয়! শাপে বর পেতে চাও! উপস্থিত আর তোমার পড়ার ক্ষতি করবো না—চল্লাম। কিন্তু মনে করো না যেন রণে ভঙ্গ দিয়ে চল্লাম।

শশী (হাসিয়া) না, তা কেন—সন্ধি স্থাপন করে চল্লে

(উর্ম্মিলার প্রস্থান। শশিনাথ পুনরায় তাহার পুস্তকে মনোনিবেশ করিল। কিয়ৎকাল পরে সোমনাথ এবং বরেন প্রবেশ করিল)

সোম। শশিনাথ!

শশি। দাদা! (বই হইতে মুখ তুলিল)

সোম। একটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় আলোচনা করবার জন্যে তোমার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে বাধ্য হলাম। আলোচনার মধ্যে বরেনকেও প্রয়োজন হতে পারে তাই ওকেও সঙ্গে করে এনেছি। তোমাদের এখনও কোন কথা বলা হয় নি। সব আগে এই চিঠিখানা পড়, তাহলেই ব্যাপার বুঝতে পারবে

(শশিনাথের হাতে একখানি পত্র দিল, শশিনাথ কিছুক্ষণ ধরিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিল)

সোম। (বরেনের প্রতি) হরিচরণবাবুর সঙ্গে বাবার যে কিরকম বন্ধুত্ব ছিল, তা শশিনাথের চেয়ে আমি আরও ভাল জানি বরেন! ও তখন ছোট, ওর হয়তো মনে নেই, কিন্তু আমি তো দেখেছি, বাবা তাঁকে কিরকম ভালোবাসতেন, আর আপনার মতো করে দেখতেন। তাঁকে আমরা চিরকাল কাকা বলে ডেকেছি। সেই পিতৃব্যতুল্য হরিচরণবাবু আজ বিপন্ন হয়ে তাঁর গ্রাম থেকে আমাদের সাহায্য চেয়েছেন—তাঁর চিঠি পড়ে আমি অত্যন্ত অস্থির বোধ করছি বরেণ!

বরেন। আপনাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না।

শশীর সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা এখনিই সব ঠিক করে ফেলছি।

শশী। (পত্র পাঠান্তে মুখ তুলিয়া) দাদা, বরেনকে সব কথা বলেছো?

সোম। না এখনও বলা হয়নি। বলবো বলেই তো ডেকে এনেছি। বরেন শুধু যে তোমার বন্ধু তাই নয়, ও আমার আর একটি ভাই। জান বরেন, আমাদের এই হরিচরণ কাকা ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত তেজী পুরুষ ছিলেন। যৌবনে তিনি বাড়ীর এবং সমাজের অমতে বিবাহ করে গ্রামের মধ্যে নিজের অংশে পৃথক ভাবে বসবাস করতে থাকেন। যতদিন তাঁর স্বাস্থ্য এবং বিত্ত ছিল ততদিন তাঁর সেই তেজোদৃপ্ত ব্যক্তিত্বের কাছে সমাজের কুচক্রীরা এগোতে সাহস করতো না। সম্প্রতি তাঁর ব্যবসা ফেল হয়ে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তার ওপর তাঁর স্বাস্থ্য গেছে ভেঙে। এখন সুবিধা বুঝে সমাজরক্ষকের দল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি অত্যাচার সুরু করেছে।

শশী। আমাদের সমাজে চিরকাল যা হয়ে আসছে, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

বরেন। হরিচরণ বাবুর কে আছেন?

সোম। একটিমাত্র মেয়ে। তাকে নিয়েই তাঁর যত বিপদ। কিছুদিন থেকেই তিনি মেয়েটির বিবাহ দেবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ভাঙচির প্রাবল্যে কোন পাত্রই এ পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারেন নি। তার উপর এখন তাঁর অসুখ; এ সময়ে সমাজের লোকেরা চক্রান্ত করে তাঁর ধোপা, নাপিত, ডাক্তার-বদ্যি পর্য্যন্ত বন্ধ করেছে।

বরেন। ইস্! কি ভয়ানক লোক এরা!

শশী। শোন বরেন, চিঠির শেষটা তোমায় পড়ে শোনাই—"আজন্ম-বন্ধু বিশ্বনাথের ছেলে তোমরা, জগতে একমাত্র তোমাদের কাছে কোন সাহায্য প্রার্থনা করতে আমার আত্ম-সম্মানে বাধে না। তাই তোমাদের জানাচ্ছি যে, যদি এখান থেকে অবিলম্বে কলকাতায় না যেতে পারি, তা হলে বিনা পথ্যে এবং বিনা চিকিৎসায় আমার মরণ আলিঙ্গন করতে হবে। তা করতে আমি ভয় পাইনে, কিন্তু এখানে শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটার কি গতি হবে, তাই ভেবে ভীত হয়ে উঠছি'। দাদা, এখন কি করবে ঠিক করেছো?

সোম। আমার তো মনে হয়, আমাদের কারুর সেখানে যাওয়া দরকার।

বরেন। মনে হওয়া নয় দাদা—যেতেই হবে।

শশী। ঠিক বলেছো বরেন। দাদা, আমি আর বরেন সেখানে যাব এবং হরিচরণ কাকাকে কলকাতায় নিয়ে আসবো। বরেন?

বরেন। আমি তৈরী আছি শশী!

শশী। দাদা, আমরা আজই যেতে চাই।

সোম। আজই যেতে গেলে, বিলাসপুরের ট্রেণ আছে সাড়ে আটটার সময়। কিন্তু তার তো আর মোট আধ ঘণ্টা সময় আছে। আজকে কি আর যাওয়া হবে?

বরেন। কেন হবে না দাদা, শশীতে আমাতে এখুনি বেরিয়ে পড়ি। খাওয়া-দাওয়া কোন রকমে ষ্টেশনেই সেরে নেবো অখন। ২৪ পরগণার বিলাসপুর তো দু'ঘণ্টার রাস্তা! আজকেই সন্ধ্যের সময় তাঁদের নিয়ে কলকাতায় ফিরতে পারবো। শশী তৈরী হয়ে নাও।

শশী। পাঁচ মিনিটে তৈরী হয়ে নিচ্ছি বরেন! দাদা, আজই আমরা যাবো।

সোম। তোমরা যখন ঝুঁকেছো, তখন যাও। প্রার্থনা করি, ভালোয় ভালোয় কাজ উদ্ধার করে ফিরে এসো। যদি আজকেই তাঁদের আনতে পারো তাহলে সোজাসুজি আমাদের জগৎসুর লেনের বাড়ীতে তাঁদের নিয়ে গিয়ে তুলবে। বাড়ীটা খালি থেকে সুবিধেই হয়েছে। আমি এখনই লোক পাঠিয়ে সব ঠিক করছি। বরেন, আমার এই পার্স্‌টা তোমার কাছে রাখো, এতে শতখানেক টাকা আছে। কি জানি বিদেশ-বিভুঁই জায়গা; সঙ্গে কিছু টাকা থাকা ভালো।

বরেন। শশীর কাছে দিন না দাদা।

সোম। ওর কাছে দেওয়া আর রাস্তায় ফেলে দেওয়া একই কথা, টাকাটা খোয়া যাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থেকে যায়। তুমিই রাখো, তোমার কাছে দিয়ে আমি ঢের বেশী নিশ্চিন্ত থাকবো।

(জামা গায়ে দিতে দিতে শশিনাথ হাসিল। বরেন সোমনাথের নিকট হইতে ব্যাগটি লইয়া নিজের কোটের ভিতরকার পকেটে রাখিল)

সোম। আমি ততক্ষণ একখানা ট্যাক্সী ডেকে আনাই। (প্রস্থান)

শশী। (প্রস্তুত হইতে হইতে) মনে মনে কি সিনেমার হিরোর মত থ্রিল অনুভব করছো নাকি?

বরেন। সত্যি শশী, আজকের দিনটা কি জানি কেন আমার ভারী চমৎকার লাগছে। মনে হচ্ছে একটা কি যেন অদ্ভুত কিছু করতে যাচ্ছি। নিত্যকার ধরা-বাঁধা জীবন কাটিয়ে, হঠাৎ যেন পুরোদস্তুর adventure-এর মধ্যে ঢুকে পড়েছি!

শশী। চমৎকার লাগছে নাকি? বটে! তা তাতে আর আশ্চর্য কি! কোনও দিনই তো এমন না খেয়ে-দেয়ে তরুণী উদ্ধার করতে ছোট না!

বরেন। তা সত্যি। কিন্তু দেখ, ব্যাপারটা romantic হতো, যদি তোমার জন্যে উদ্ধার করতে যেতাম। এ যেন একেবারে নিরস পরোপকার।

শশী। (হাসিয়া) আরও romantic হতো যদি নিজের জন্যে উদ্ধার করতে যেতে। চল, দেখি, তোমার হয়ে আমি সে কাজটা পারি কি না।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(এক সপ্তাহ পরে। প্রাতঃকাল। একই দৃশ্য। শশিনাথ এবং বরেন)

বরেন। হরিচরণ বাবুর অবস্থার কিন্তু মোটেই কোন উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, মিঃ গুপ্তের সঙ্গে consult করবার জন্যে তুমি একবার তোমাদের পরিচিত ব্রাউন সাহেবকে আনাও।

শশী। আজকের দিনটা যাক। কাল দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় ঠিক করবো। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলতো? আজ ৫।৬ দিন ধরে বৌদি তোমায় ডেকে পাঠাচ্ছেন—এতদিন বাদে আজ সময় পেলে? কিন্তু এদিকে জগৎসুর লেনে যখনই যাচ্ছি তখনই তোমাকে সেখানে হাজির দেখছি—ব্যাপারখানা কি?

বরেন। থাম, থাম—আর ফাজলামীতে কাজ নেই।

শশী। ফাজলামী করলাম আমি! তার ওপর কাল রাত্রে সেখানে বসে যে-খাওয়াটা খেলে, আমি তো দেখে অবাক! এমন করে লুচি দিয়ে ক্ষীর খাবার উৎসাহ তোমার তো আগে কখনও দেখিনি বরেন—বৌদিও তো দু'একদিন তোমায় খাইয়েছেন!

বরেন। না ভাই সত্যি—কাল ভারী ক্ষিদে পিয়েছিল। তার ওপর উনি পেড়াপিড়ী করতে লাগলেন, তাই যা খাই তার চেয়ে কিছু বেশীই খেয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও অসুখ করেনি! দিব্যি হজম হয়ে গেছে! তা ছাড়া কি চমৎকার রান্না!

শশী। তাতো দেখতেই পাচ্ছি। একদিন পাড়াগাঁ বেড়িয়ে এসেই চেঞ্জ লেগেছে।

বরেন। মিছে নয় হয়তো একটু চেঞ্জ লেগেছে!

শশী। কিংবা হয়তো ভাল লেগেছে!

বরেন। কি—রান্না?

শশী। কিংবা রাঁধুনী।

বরেন। তা যদি বলো, তোমার রান্নার চেয়ে রাঁধুনী আমার ঢের ভাল লেগেছে। যেমন রূপ, তেমনি বুদ্ধি। যেন বিলাসপুর পাকের পদ্মটি।

শশী। সরযূ মেয়েটি বাস্তবিকই অদ্ভুত, নইলে তোমার মত লোকের মুখ দিয়ে কাব্যের ভাষা বেরোয়!

বরেন। বাস্তবিকই এমন সেবায় লক্ষ্মী, অতিথি সৎকারে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি জীবনে খুব কমই দেখেছি। প্রথম দিনে বিলাসপুরে তাঁর হাতে যে যত্ন পেয়েছিলাম—কোনও দিন তা ভুলবো না।

শশী। (উচ্চ হাস্য করিয়া) বরেন, তোমার স্নায়ু যে এত দুর্বল, তা জানতাম না। তা হলে আজই গিয়ে ঘটকালী সুরু করি কি বলো?

বরেন। না—না—শশি, এ রকম করে বলা তোমার ভারী অন্যায়

শশী। মুখে প্রতিবাদ করলেও, মনে মনে আমার অন্যায় তো বিলক্ষণ উপভোগ করছো দেখছি।

বরেন। তোমার সঙ্গে পারা যাবে না। যতক্ষণ থাকবো ততক্ষণ এমনি করে অস্থির করবে তো? উঠলাম আমি। বৌদিকে বলো, ওবেলা এসে এখানে খাব।

(প্রস্থানোদ্যত)

শশী। কিন্তু ওবেলা যে সরযূ তোমাকে ওখানে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছে!

বরেন। You are incorrigible. (প্রস্থান)

(শশিনাথ খাতা-পত্র সাজাইয়া পেন্সিল কাটিতে লাগিল)

(সোমনাথের প্রবেশ)

সোম। (চেয়ারে বসিয়া) বরেণ এসেছিল না?

শশী। হ্যাঁ। এই মাত্র চলে গেল।

সোম। আমি কাল সন্ধ্যার পর জগৎসুর লেন-এর বাড়ীতে গিয়েছিলাম। হরিচরণ বাবুকে দেখে কিন্তু তেমন ভাল বুঝলাম না, শশি।

শশী। বরেনও সেই কথা বলছিল। কিন্তু কোনও ক্রমেই যেন আমাদের তরফ থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি না হয়। তারপর ফলাফলের ওপর যখন আমাদের হাত নেই, তখন আক্ষেপ করা ছাড়া আর কি করতে পারি!

সোম। ও কথা যাক! এদিকে তোমার বৌদিদি যে আমাকে ভারী বিপদে ফেলেছেন!

শশী। (ঈষৎ হাসিয়া) সে তো আর নতুন নয় দাদা। বৌদি তো প্রায়ই তোমাকে এমন বিপদে ফেলেন।

সোম। এবার একটু গুরুতর কথা—তুমি ভিন্ন এর মীমাংসা হবে না।

শশী। কি বল শুনি!

সোম। (ইতঃস্তত করিয়া) লীলার বিয়ের বিষয়ে তোমাকে অনুরোধ করতে বলেছে!

শশী। সে তো ভাল কথা—এর আবার অনুরোধ কি? লীলার জন্যে তো পাত্রের সন্ধান করছি। এই আজই একজনকে আসতে বলেছি—আমার একটি বন্ধু, তুমিও তাকে জানো—যদি সে আসে, তা হলে বৌদিকে দেখাবো, কেমন চমৎকার পাত্র!

সোম। তা নয়! তার ভারী ইচ্ছে, তুমি লীলাকে বিয়ে করো।

শশী। কিন্তু দাদা—বৌদিকে তো এ বিষয়ে আমি সমস্ত কথা বলেছি। বিবাহে আমার অমত আছে।

সোম। ও! তা অবিশ্যি লীলাকে যদি তোমার পছন্দ না হয়, তাহলে তোমাকে আমি কিছু বলতে চাইনে।

শশী। (মুখ তুলিয়া) ভাখো দাদা, তুমি যে-কথা বলছো, সে কথা একেবারেই উঠতে পারে না। তবে কি কারণে আমি বিয়ে করতে রাজী হচ্ছিনে, তা তোমার জানতে ইচ্ছা হতে পারে। প্রথমতঃ আমার মনে হয়, এতদিন ধরে যে সম্পর্কগুলো খাপ খেয়ে গেছে, সে গুলোকে একেবারে অদ্ভুতভাবে উল্‌টে দেওয়া হবে। দুটো সম্পর্কের কথা ভেবে দেখলে তোমার নিজেরই হাসি পাবে। শালী হবে ভাদ্র-বৌ আর ভাই হবে ভায়রা-ভাই!

সোম। এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তাহলে এ কোন কাজের আপত্তি নয়। আর কোনও আপত্তি আছে?

শশী। আমার দ্বিতীয় আপত্তি—যদিও এইটেই আমার প্রথম আপত্তি হওয়া উচিত ছিল - বিয়ে করবার কোন ইচ্ছে বা কল্পনা আমার একেবারেই নেই। আমি তো আইবুড়ো মেয়ে নই যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমার বিয়ে দিয়ে দায়ে খালাস হতে হবে!

সোম। তৃতীয় আপত্তি?

শশী। তৃতীয় আপত্তি—আমার মনে হয়, এমন সম্পর্ক করা উচিত নয়, যাতে আত্মীয়ের সংখ্যা না বেড়ে একই থেকে যায়। এই ধর, লীলার অন্য জায়গায় বিয়ে হলে, আমি তো তোমার ভাই থাকবোই—অধিকন্তু লীলার স্বামী তোমার ভায়রা-ভাই হবে; কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমি দুইকে এক করে দেবো। ঠিক নয় কি?

সোম। (মুখে বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া) যত সব ছেলেমানুষের পাল্লায় পড়া গেছে! আমি কিছু জানিনে —তোমার বৌদির সঙ্গে বোঝাপড়া কোরো।

(প্রস্থানোদ্যত)

শশী। দাদা—একটা কথা বৌদিকে জানিও যে তিনি যেন মনে না করেন আমি তাঁর চেয়ে লীলার কম হিতৈষী। আমি যদি দেখি, লীলার এমন কোনও পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে যে আমার চেয়ে কোনও অংশে হীন, তখন আমি সে বিয়ে ভেঙে দিয়ে লীলাকে বিয়ে করবো। কিন্তু তার আগে কেন? দেশে তো সৎ-পাত্রের অভাব নেই! লীলা যেন স্বপ্নেও একথা মনে না করে যে সে তোমার আশ্রয়ে আছে বলে তুমি সৎপাত্রের চেষ্টায় একবার রাস্তা পর্যন্ত মাড়ালে না, বাড়ী থেকেই সস্তা জিনিস ধরে দিতে যাচ্ছো!

সোম। (হাসিয়া) পাগল শুধু পাগলা-গারদেই থাকে না—বাইরেও থাকে দেখছি। (প্রস্থান)

(শশিনাথ পড়ায় মনঃসংযোগ করিল। কিয়ৎকাল পরে দরজার পরদার অপর দিকে লীলাকে দেখা গেল—হাতে চায়ের পেয়ালা)

লীলা। শশিদা—

শশী। (মুখ ফিরাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে) লীলা! এস!

(লীলা কাছে আসিয়া টিপাই-এর উপর কাপ রাখিল)

শশী। তুমি চা নিয়ে এলে যে? কালীচরণ কোথায় গেল?

লীলা। কাল রাত থেকে তার জ্বর হয়েছে, আজ যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারছে না।

শশী। বটে, তাই সকাল থেকে তাকে দেখতে পাই নি। চা-ও তাহলে তুমি করেছ?

লীলা। হ্যাঁ।

(শশিনাথ পেয়ালা তুলিয়া চায়ে চুমুক দিল)

লীলা। চিনি কি বেশী হয়েছে?

শশী। নাঃ! ঠিক হয়েছে! আর যদি একটু বেশীই হতো, তাহলেই বা কি এমন ক্ষতি ছিল? মানুষের জীবনটা এতই বড় যে, চায়ে একটু চিনি বেশী হল, কি পানে একটু চুণ কম হল—এ সব সামান্য ব্যাপার গুলোকে একেবারেই গ্রাহ্য করা উচিত নয়। এসব ছোট ব্যাপারগুলো কিন্তু বাস্তবিকই ছোট নয়, এই সব উপাদানের সাহায্যেই আমাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। আজ যেটা শুধু চায়ের চিনির মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, দুদিন পরে সেটাই হয়তো অন্নবস্ত্রের মধ্যে বিরাটরূপে দেখা দেবে। এ তুমি নিশ্চয়ই জেনো, মানুষের মধ্যে যেসব অভাব এবং অনুযোগ দেখতে পাওয়া যায়, বাইরের সঙ্গে তার সংস্রব নেই। সমস্তই মানুষ নিজের মধ্যে রচনা করে। সেই জন্যে মানুষের নিজেরই স্বার্থে প্রধান কর্তব্য, নিজেকে সংযত করা। নিজের মধ্যে এমন সব অভাব সৃজন করা উচিত নয়, যার জন্যে অবশেষে শুধু নিজেরই প্রতি অনুযোগ করতে হয়। আমি যে এ কথা বললাম, এ থেকে যেন মনে করোনা যে তোমার চায়েতে চিনি বেশী হয়েছে। চিনি তোমার ঠিকই হয়েছে। কয়েকদিন আগে বৌদির সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা হয়েছিল। চায়ের চিনির কথায় সেগুলো মনে পড়ে গেল। অথচ দুটো ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, তাও নয়। বৌদির সঙ্গে আমার যা কথা হয়েছে, তা যদি তোমার জানা থাকে, তাহলে আমার কথার তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারবে, আর তা যদি না হয়, তা হলে আমার কথার সহজ সত্যটুকু বুঝে জীবনের মধ্যে খাটাবার চেষ্টা করো। নিজে যেন নিজের অভাব এবং দুঃখের সৃষ্টি কোরো না।

(লীলা বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল)

শশী। চায়ের চিনি একটু বেশী হলে চা নষ্ট হয়ে গেল মনে করা যেমন ভুল, চায়ে পরিমাণের অতিরিক্ত চিনি দেওয়াও তেমনি অনুচিত। কিন্তু সে বিষয়ে তোমার বা আমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। কেন না, তুমি পরিমিত চিনিই দিয়েছো, এবং আমারও চা-টা বেশ ভাল লাগছে। (চা পান)

লীলা। (স্মিত মুখে) কিন্তু এ-সব কথা তুমি কেন বলছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে শশিদা!

শশী। যতটুকু বুঝতে পেরেছো, তার বেশী বোঝবার

এখন দরকার নেই। দরকার যখন হবে, তখন আমি আরও স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দোবো।

লীলা। দিদি তোমার জন্তে কচুরী ভাজছে, নিয়ে আসিগে।

(লীলার প্রস্থান। অল্পক্ষণ পরে বাহির হইতে ভৃত্যের প্রবেশ)

রঘু। ছোটবাবু! একটি বাবু আপনাকে ডাকছেন!

শশী। বাবু? কি রকম বাবু! কি নাম বল্লে?

রঘু। নাম বল্লেন, সুধীর বাবু! সুন্দর মতন বাবু! মটর গাড়ী থেকে এসে নামলেন।

শশী। ওঃ। ঠিক হয়েছে! যা, যা, রঘু, বাবুকে খাতির করে বাইরের ঘরে বসাগে যা। বল, আমি এখুনি যাচ্ছি।

(রঘুর প্রস্থান। শশী ভিতরের দরজার পরদা সরাইয়া)

বৌদি, বৌদি!

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। কেন ঠাকুরপো?

শশী। বৌদি, তোমার জন্তে একটি স্বর্ণ-মৃগ ধরে এনেছি! আমার সেই বন্ধু সুধীর—যার কথা আমার কাছে থেকে শুনেছিলে, সে আজ লীলাকে দেখতে এসেছে। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ, অর্থ—সব বিষয়ে এ যদি আমার চেয়ে ভাল না হয়, তাহলে তুমি আমাকে যা করতে বলবে তাই করবো।

উর্ম্মিলা। (ক্ষুণ্ণ স্বরে) ও আমি চাইনে!

শশী। আমার সঙ্গে তুলনা করেছি বলে মন উঠলো না বুঝি? তা'হলে সেটুকু শুধরে নিচ্ছি। দেখতে দাদার চেয়ে ভাল, লেখাপড়ায় দাদার চেয়ে ভাল, আর অর্থে দাদাকে তিনবার কিনতে পারে। মোটরটা রাস্তায় রয়েছে, দেখলেই বুঝতে পারবে। মাষ্টার বুইক—তিরিশ হাজার টাকা দাম।

উর্ম্মিলা। (কপট ক্রোধে) দাদার উপমা দিলেই মনে করেছো নাকি যে, আমি ভুলে যাবো?

শশী। ভোলা তো উচিত—পতিব্রতাদের লক্ষণই হ'ল তাই!

উর্ম্মিলা। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বল—কথার ধুকড়ী হচ্ছ তুমি।

শশী। অতএব কথা কাটাকাটি না করে চট ক'রে গিয়ে দাদাকে পাঠিয়ে দাও। বোলো, প্রিয় মুখুয্যের ছেলে—সুধীর! তাহলেই তিনি বুঝবেন, আর তোমারও তখন বুঝতে বাকী থাকবে না। হ্যাঁ, ভাখো, লীলাকে একবার এখানে পাঠিয়ে দাও তো, আর কচুরী না কি ভাজছিলে, তাই দিয়ে জলখাবার ঠিক করে রাখ।

(উর্ম্মিলার প্রস্থান। কিছুপরে লীলার প্রবেশ)

শশী। লীলা, তোমাকে আমি খুঁজছিলাম!

লীলা। কেন শশীদা?

শশী। (বারবার লীলার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) লীলা! তোমার সেই কাল রঙের মাদ্রাজী শাড়াটা আজ একবার পরলে কেমন হয়?

লীলা। (একটু নীরব থাকিয়া হাসিয়া ফেলিয়া) বাড়ীতে শুধু শুধু সে শাড়ী পরে কি হবে?

শশী। বাড়ীতে কেন? ধর, যদি একটু বেড়িয়েই আসা যায়। আমাদের বাড়ীর সামনে একটা মোটর দাঁড়িয়ে আছে—দেখেছো তো?

লীলা। না, দেখিনি তো! (জানালার ধারে গিয়া দেখিয়া) উঃ! খুব বড় মোটর তো! কার মোটর শশিদা?

শশী। ধর, মোটরটা আমাদেরই হবার উপক্রম হয়েছে!

লীলা। কেনা হবে নাকি?

শশী। হ্যাঁ, একরকম কেনাও বলা যেতে পারে!

লীলা। (হাসিয়া) শশিদার কাছ থেকে কখনো কোনো কথার যদি সোজা উত্তর পাওয়া যায়!

শশী। লীলা, তোমার সেই হীরের টাপটা বার করতে দেরী হবে কি?

লীলা। সেটাও পরতে হবে নাকি?

শশী। হ্যাঁ, মোটরের উপযোগী দুই একটা জিনিষ তো দেখানো চাই।

লীলা। (সহাস্তে) আর কিছু বলবার আছে?

শশী। আর? আর কাপড়ের সঙ্গে মানান করে সেই কালো ব্লাউজটাও পরো।

লীলা। দিদি, জামাইবাবু—এঁরাও সব যাবেন তো?

শশী। সে সব পরের কথা পরে হবে। তুমি তৈরী হ'লেই আমরা বৌদির কাছে যাবো। আমি একবার মোটরটা দেখে আসি, তুমি ততক্ষণ প্রস্তুত হয়ে নাও।

(শশিনাথ ও লীলার ভিন্ন দিকে প্রস্থান।
ভিতর হইতে সোমনাথ ও উর্ম্মিলার প্রবেশ)

সোম। অনেক পুণ্য থাকলে লীলার এ বিয়ে হবে। আমি বাইরে চললাম। তুমি লীলাকে একটু পরিষ্কার করে রাখ।

উর্ম্মিলা। লীলাকে সাজিয়ে দেখাবার কোন দরকার নেই। চোখে যদি লাগবার হয়, এমনি লাগবে।

সোম। নিজের ঘটনা থেকে দুঃসাহস জন্মে গেছে দেখছি। এ চোখজোড়া চুরি করে ছাতের ওপর থেকে যে বস্তু দেখতো, তুমি কি মনে কর জগতের সব বস্তু সেই একই রকম দেখতে?

উর্ম্মিলা। সে কথা নয়। চুরি করা জিনিষ মিষ্টি না হলেও মিষ্টি লাগে। চুরি করে দেখতে বলে ভালো লাগতো, বস্তুর কোন গুণ ছিল না।

সোম। (পত্নীর নাসিকা নাড়িয়া দিয়া) তা নয় গো, তা নয়। জগতের সব বস্তু সমান নয়। কোন বস্তু এমনিই সুন্দর দেখায়, আবার কোন বস্তু সোনায় মুড়ে দিলেও ভাল দেখায় না।

উর্ম্মিলা। সে তুমি আমাকে ভালবাস ব'লে দেখ, নইলে লীলা আমার চেয়ে দেখতে অনেক ভাল।

সোম। (গর্বিত স্বরে) তা'হলে বুঝতে পারছো লোকটা আমি কি রকম খাঁটি। স্ত্রীর চেয়ে শালীকে সুন্দর দেখে না এমন লোক বিরল।

উর্ম্মিলা। ঈশ্.! সাধুপুরুষ! আর ছাত থেকে যখন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখতে তখন কি হতো! তখন তো আমি স্ত্রীও ছিলাম না, শালীও ছিলাম না।

সোম। ছিলে না কিন্তু হলে তো?

উর্ম্মিলা। আর যদি না হতাম?

সোম। না হলে বুঝতাম—আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) সত্যি বলছি, তুমি যখন তাকিয়ে তাকিয়ে আমাকে দেখতে, তখন আমার লজ্জাও করতো, ভয়ও করতো আর—

সোম। আর কি?

উর্ম্মিলা। আর ভালোও লাগতো!

সোম। ভালোও লাগতো!! তখন তো আমি স্বামী ছিলাম না, যদি আমার সঙ্গে বিয়ে না হোত?

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) তাহলে বুঝতাম আমারও অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ!

(শশিনাথের প্রবেশ)

শশী। দাদা, সুধীর বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না বলছে। তুমি একবার দেখা কর।

সোম। হ্যাঁ। আমি এখনই যাচ্ছিলাম। শশি, তুমি ততক্ষণ লীলাকে প্রস্তুত করে রাখো।　　(প্রস্থান)

শশী। বৌদি, সত্যি করে বল, এ সম্বন্ধ তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।

উর্ম্মিলা। পছন্দ হয়েছে, তবে সত্যি কথা যদি চাও, তা হলে বলি, তুমি রাজী হলে আমি ও একটুও চাইনে।

শশি। (হাসিয়া) লীলার বিয়ের হাঙ্গামাটা আগে মিটে যাক্, তারপর ভালো ক'রে তোমার চিকিৎসা করাতে হবে। তোমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে।

উর্ম্মিলা। যদি বিশ্বাসই করবে না, তবে জিজ্ঞাসা করছো কেন?

শশি। তোমার কথা বিশ্বাস করছি বলেই তো বলছি, তোমার মাথার ঠিক নেই। যাক্, চুপ করো—লীলা আসছে।

(লীলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। (লীলার প্রতি চাহিয়া) ঠাকুরপো তো কম নও! এর মধ্যে লীলাকে কাপড় বদলিয়েছো! কাপড় বদলালে যে লীলা?

লীলা। শশিদা বল্লেন—মোটরে করে বেড়াতে যাওয়া হবে—আর আমাকে—

শশী। একটু ভুল হচ্ছে লীলা। মোটরে করে যেতে হবে তা তো বলিনি। আমি বলছিলাম, বেড়াতে যেতে হবে, আর বাইরে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। এদুটো জিনিষকে তুমি নিজেই যোগ করেছো।

লীলা। (সবিস্ময়ে) তুমি বল্লে না শশিদা, মোটরটা আমাদেরই হবে?

শশী। আমি তো এখনও বলছি, তার উপক্রম হয়েছে। আমাকে বিশ্বাস না হয়, বৌদিকে জিজ্ঞাসা কর।

উর্ম্মিলা। (হাসিয়া) উঃ! তুমি কি ঠক্ হয়েছ ঠাকুরপো! তুমি সব করতে পারো! তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও, আমি খাবার দু-থালা নিয়ে আসি।

লীলা। (বিস্মিত বিরক্ত মুখে) এখানে কার খাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে শশিদা?

শশী। জনৈক ভদ্রলোক, যিনি ওই মোটরটির মালিক এবং আমার বিশেষ বন্ধু—তার জন্যে। তাকে খাওয়ানোর ভার তোমাকে নিতে হবে।

লীলা। (হঠাৎ কঠিন হইয়া) তা আমি পারবো না।

শশী। পারবে না তুমি? কি করে বলছো লীলা পারবে না? পুরাকালে অতিথি সৎকার করবার জন্যে লোকে রাস্তা থেকে লোক ধরে আনতো। আর তুমি বলছো কিনা, আমার বন্ধুটিকে খাওয়ানোর ভার নিতে পারবে না! আচ্ছা, বলতো বৌদি, এটা কি রকম ভদ্রতা?

উর্ম্মিলা। (হাসিমুখে) আমার বোন কখনও কোন অভদ্রতা করতেই পারে না ঠাকুরপো? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তাছাড়া তোমার আদেশ লীলা কি কখনও অমান্য করেছে, যে আজ করবে। (লীলাকে) আয় আমার সঙ্গে।

[উর্ম্মিলা এবং লীলা ভিতরের দিকে—শশিনাথ বাহিরের দিকে প্রস্থান করিল। ক্ষণকাল পরে সুধীরকে লইয়া সোমনাথ ও শশিনাথের প্রবেশ। শশী পরম সমাদরে সুধীরকে চেয়ারে বসাইল]

সোম। (সুধীরকে উদ্দেশ করিয়া) তোমার কথা শশীর মুখে অনেকদিন শুনেছি। আজ তোমার সঙ্গে পরিচয় করে বুঝলাম, কোনও কথাই শশী অতিরঞ্জিত করে বলেনি। তোমার সঙ্গে আমাদের এই পরিচয় যদি আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথা হয়, তাহলে তাকে ভগবানের পরম আশীর্বাদ বলেই মনে করবো।

শশী। দাদা, তুমি ভেতরে গিয়ে বৌদিদিকে জলখাবার পাঠিয়ে দিতে বল। (সোমনাথের প্রস্থান)

শশী। তুমি দেখো সুধীর—লীলা মেয়েটি একটি অপূর্ব বস্তু। রূপের দিক থেকে বলছিনে—মানুষের প্রতি যত্নে, সেবায়, গৃহস্থালীর কাজে-কর্মে, বুদ্ধিতে এবং শিষ্টাচারে অমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে না। তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি ওকে নিয়ে আসি।

(শশিনাথের প্রস্থান এবং একটু পরে লীলাকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ। পিছনে রঘু দুই থালা খাবার লইয়া প্রবেশ করিল এবং তাহা টিপাই-এর উপর সাজাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল)

শশী। লীলা, ইনি আমার বন্ধু সুধীর মুখুয্যে—আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং ওর মত ছেলেকে বন্ধুরূপে পেয়ে আমি গর্বিত বোধ করি।

(লীলা নমস্কার করিতেই সুধীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতি-নমস্কার করিল)

শশী। সুধীর—এ হচ্ছে লীলা, যার কথা তুমি হয়তো এর আগেও আমার মুখ থেকে শুনেছ। এর সঙ্গে পরিচয় করলে তুমি যে খুশী হবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। এবং শুধু আলাপ-আলোচনায় নয়, কাজে কর্মেও লীলার পটুত্ব বড় সামান্য নয়। এই যে টেবল্ ক্লথটা দেখছো, এটা লীলার তৈরী; ওই দেওয়ালে রেশমের ছবি টাঙানো রয়েছে ওটা লীলা বুনেছে। লীলা শুধু ইংরেজী শিখেছে মনে করো না—সংস্কৃতে রঘুর তিন সর্গ ইতিমধ্যে শেষ করেছে। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন সুধীর, বোসো না।

(সুধীর নীরবে লীলার প্রতি ইঙ্গিত করিল)

শশী। (হাসিয়া) ওঃ হ্যাঁ হ্যাঁ—লীলা তুমি আসন

গ্রহণ না করলে সুধীর বসতে পাচ্ছে না। তুমি বোসো।

(লীলা কোনো রকমে একখানি চেয়ারে বসিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল)

শশী। (খাবারের থালা দেখাইয়া) সুধীর আরম্ভ করে দাও ভাই। না, না, আপত্তি চলবে না। এ সমস্ত লীলা নিজে হাতে যত্ন ক'রে তৈরী করেছে। শুধু রান্না-বান্নার কাজেই নয়, সঙ্গীতেও ও সিদ্ধিলাভ করেছে। বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাইছো। আচ্ছা, আমি তোমার অনুরোধ যথাস্থানে পৌঁছে দিচ্ছি।

(শশী লীলার কাছে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে তাহাকে একখানি গান গাহিতে বলিল। লীলা আপত্তি করিল)

শশী। লক্ষ্মীটি! আমার অনুরোধ, একখানা গান গেয়ে দাও ভাই, তা না হলে যে সুধীরের কাছে অপদস্থ হব। একখানি গান গেয়ে দিলেই তোমার ছুটি।

(লীলা উঠিয়া অর্গ্যান-এর সুমুখে বসিয়া একখানি গান গাহিল। তারপর ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। শশিনাথ ভিতর অবধি তাহার সঙ্গে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুধীরের পাশে বসিল)

শশী। কি হে, কেমন দেখলে বল?

সুধীর। (হাসিয়া) কবে দিন স্থির করছো বল?

শশী। আর কোন কথা নেই তো?

সুধীর। কোন কথা নেই। শুধু একটা অনুরোধ আছে। বিয়ের দিনটা যত শিগগির সম্ভব স্থির করো।

শশী। (হাসিয়া) লীলার যে এতটা ক্ষমতা আছে, তা জানতাম না। চিরকালের সুধীরকে যে এতটুকু সময়ের মধ্যে অধীর করে দিতে পারে, স্বীকার করতেই হবে, সে অসীম ক্ষমতা ধারণ করে।

সুধীর। আমি স্বীকার করছি ভাই, সত্যিই তিনি অসীম ক্ষমতা ধারণ করেন। এ বিষয়ে তোবার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। আমার সম্পূর্ণ মত আমি তোমাকে জানিয়ে চল্লাম, এখন তোমরা আমাকে বাংলা দেশের ঘরের দাঁড়ি-পাল্লায় বসিয়ে ওজন করে দেখ পছন্দ হয় কিনা। তারপর তোমাদের মতামত আমাকে জানিয়ে পাঠিও।

শশী। (সহাস্যে) এ বিনয় প্রকাশ না করলেই ভাল ছিল। কার মতামত তুমি চাওহে? লীলার মত? সেটা ফুলশয্যার রাত্রির জন্যে অপেক্ষা করে থাকো। আর আমাদের মতের যদি অপেক্ষা থাকতো, তাহলে অন্দর-মহলে তোমাকে নিয়ে এসে তোমার সামনে একটা নিরীহ প্রাণীকে এতক্ষণ ধরে পীড়ন করতাম না।

সুধীর। (উঠিয়া) আচ্ছা, কাল তাহলে গোপাল মামা আর ভটচাজ মশাইকে দিনস্থির করতে পাঠিয়ে দেবো।

শশী। কালই—আচ্ছা দিও।

(সুধীর প্রস্থান করিল)

(শশিনাথ সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। যেন কিছু ভাবিতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্যের অনুরূপ। তিনদিন পরে। শশিনাথ ও বরেন]

শশী। তুমি যদি সঙ্গে না থাকতে, তা হলে কাল রাত্রে হরিচরণ বাবুর কাছে তোমার সঙ্গে সরযুর বিয়ের কথাটা তুলে একেবারে পাকা কোরে নিতাম।

বরেন। (চাপা গলায়) না না, শশী, ছেলেমানুষী করোনি, ভালই হয়েছে। কাল ওঁদের ওখানে যাবার আগে তোমার সঙ্গে এসব কথা হবার পর আমি বেশ করে ভেবে দেখেছি, এখন হরিচরণ বাবুব কাছে এ সব কথা তোলা একেবারেই ভাল হবে না। যতদিন না তাঁদের দিক থেকে সরযূর বিয়ের কথা উঠছে ততদিন সে কথাটা আমাদের পক্ষ থেকে তোলা উচিত হবে না। রেঙ্গুন থেকে আমার ফিরে আসবার আগে এ-কথা তুলো না।

শশী। আমি ঠিক যখন একটি সংকল্প করলাম, তখন তার মুখে এমন ক'রে বাধা দেওয়াটা তোমার ভাল হ'ল না। এই সময় আবার তুমি রেঙ্গুন চল্লে। ফিরবে কবে?

বরেন। বোনকে ভগ্নীপতির কাছে পৌঁছে দিয়েই ফিরবো। সবশুদ্ধ দিন পনেরোর বেশী হবে না। কি করবো বল, ভগ্নীপতির অসুখের খবর শুনে পর্যন্ত বোনটি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বসে আছে।

শশী। কিন্তু আমাদের কাছে কথাটা তোলবার আগে হরিচরণ বাবু যদি অন্য জায়গায় সরযুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেন, তখন কি হবে!

বরেন। না, সেরকম কখনই হবে না। তোমার অজানায় এঁদের কোনও কাজ হবে না, তা একেবারে নিশ্চয়। আর একটা কথা, তোমার আমার দাবী উপেক্ষা করে এঁরা অন্য জায়গায় যাবেন না। প্রথমে আমাদেরই কাছে প্রস্তাব আসবে।

শশী। এ সিদ্ধান্ত তুমি কেমন করে করছ? তুমি কি মনে কর, আমাদের চেয়ে সৎপাত্র বাংলাদেশে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না?

বরেন। চট্ করে পাওয়া যাবে না—অন্তত আমার রেঙ্গুন থেকে ফিরে আসবার আগে পাওয়া যাবে না। আগে আমি ফিরে আসি, তারপর পরামর্শ করে যা'হয় করা যাবে।

শশী। কাল মিছে তুমি বাধা দিলে, নইলে কাল তোমার বিয়ের কথাটা পাকা করে নিতাম। কি জান, এ সব কাজ ফেলে রাখতে নেই। লোকে কথায় বলে শুভস্য শীঘ্রম্।

বরেন। (হাসিয়া) লোকের কথা শুনো না ভাই, সবুরে মেওয়া ফলে, লোকে তাও বলে।

শশী। মেওয়া ফলে বটে, কিন্তু কার মেওয়া ফলে, সেই হচ্ছে কথা। তুমি সবুর করলে, যদি আমার মেওয়া ফলে, তাহলেই তো সর্বনাশ!

বরেন। (হাসিয়া) সে ভয় করিনে। বৈরাগ্যের আগুনে ঝলসানো তোমার শুকনো গাছে মেওয়া ফলবে, তার সম্ভাবনা নেই।

শশী। (বরেণের কাঁধে হাত রাখিয়া) অতটা দুঃসাহস ভাল নয়, শীঘ্র শীঘ্র ফিরে এস। দেরী করে এসে যদি দেখো সেই অল্প সম্ভাবনার ফলটিই ফলেছে, তখন আর দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না।

বরেন। তা নিশ্চয়ই; কেন না বিস্ময়টাই সমস্ত জায়গা জুড়ে থাকবে।

শশী। (সহসা) আচ্ছা বরেণ, রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে যদি ছাখো, ইতিমধ্যে সরযুর সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে নিইছি, তখন আমার ওপর তোমার মনের অবস্থা কেমন হয়, সত্যি করে বলবে?

বরেন। বেশ রোমাঞ্চকর করে বলবো?

শশী। বল না!

বরেন। তোমাকে হত্যা করবার জন্যে দোকান থেকে ছোরা কিনে এনেছি শুনলে তোমার মনের অবস্থা যেমন হয়, ঠিক তেমনি!

শশী। (সহাস্যে) খুব চমৎকার উপমাটা দিয়েছো

বরেন। উঠ্লাম। কয়েকটা দরকারী জিনিষ কেনা বাকী আছে। দিন পনেরো পরে দেখা হবে। গুড্‌বাই।

শশী। Wish you God speed বরেন!

(বরেনের প্রস্থান। মিনিটখানেক পরে চায়ের পেয়ালা হাতে উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপো, চা খাও!

শশী। (ঈষৎ হাসিয়া) আজ যে বৌদি চা নিয়ে হাজির? কোন মতলব আছে বুঝি? বোসো, বোঝাই গেছে! (উর্ম্মিলা শশীনাথ-প্রদত্ত চেয়ারে বসিল) সম্ভবত বিয়ে সংক্রান্ত পরামর্শ?

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ ঠাকুরপো বিয়ে সংক্রান্তই বটে, কিন্তু বলতে আমার ভয় হচ্ছে, তুমি হয়তো বিরক্ত হবে।

শশী। (হাসিয়া) কিন্তু এত ভূমিকার পর এখন না বল্লে যে আরও বিরক্ত হব!

উর্ম্মিলা। আমার মনে হচ্ছে, এ বিয়েতে লীলা সুখী হবে না।

শশী। (বিস্মিত হইয়া হাসিয়া) তোমার সেটা শুধু মনে হচ্ছে, না, কেউ তোমাকে বলেছে?

উর্ম্মিলা। সে একরকম বলাই ধর।

শশী। কি রকম বলেছে, কে বলেছে না জানলে পরামর্শ দিই কি করে?

উর্ম্মিলা। (স্মিত মুখে) তুমি যদি অমন করে জেরা করো, তাহলে হয়তো বোঝাতে পারবো না। অনেক কথা বোঝা যায়, অথচ বোঝানো যায় না। আমি বুঝতে পেরেছি, এ বিয়েতে লীলা সুখী হবে না।

শশী। (চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া) কিন্তু একমাত্র তোমার কথা বিশ্বাস করা ছাড়া আমি যে অন্য কোন রকমে বুঝতে পাচ্ছি নে। লীলা কি তোমাকে কিছু বলেছে?

উর্ম্মিলা। স্পষ্ট কিছু বলেনি। কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে আকারে-প্রকারে কথায়-বার্ত্তায় সে একরকম বলেছে যে, এ বিয়ে সে চায় না।

শশী। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) কি চায় তাও বলেছে নাকি?

উর্ম্মিলা। তাও একরকম বলেছে।

শশী। (রুদ্ধ নিশ্বাসে) কি চায়?

উর্ম্মিলা। তোমাকেই চায়!

শশী। (কিছুক্ষণ পরে) না, তোমরা সকলে মিলে আমাকে পাগল করে ছাড়বে দেখছি। আমাকে চায় মানে কি? আমাকে সে ভালবাসে?

উর্ম্মিলা। বাসে।

শশী। বাসে তো বেশ করে! কিন্তু সে কি স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, সে সুধীরকে বিয়ে করতে চায় না—আর আমাকে বিয়ে করতে চায়?

উর্ম্মিলা। স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, সুধীরকে বিয়ে করতে চায় না—আর প্রকারান্তরে জানিয়েছে তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

শশী। ছাখো বৌদি, আগুন নিয়ে খেলা যেমন বিপদজনক, মানুষ নিয়ে আর মানুষের মন নিয়ে খেলা করাও তেমনি বিপদজনক! লীলার মনে বাস্তবিক যদি কোনরকম বিকার এসে থাকে—তার জন্যে তুমি আর দাদা দায়ী। আমাকে নিয়ে তোমরা কিছুদিন থেকে এমন উৎপাত লাগিয়েছো যে, লীলারও মনে হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, আমি হয়ত খুব একটা অদ্ভুত পদার্থ!

উর্ম্মিলা। এ মন্দ কথা নয় ঠাকুরপো! লীলা ভালবাসলে তোমাকে আর তার জন্যে দায়ী হলাম আমি আর তোমার দাদা, আর তুমি একেবারে দায়ে খালাস! চোর যে, সে হল সাধু—আর যাদের কাছে চোর ধরা পড়ল তারা হল অপরাধী!

শশী। তা তো নয়! চুরি করবার প্রলোভন দেখিয়ে সাধুকে যারা চোর করে তুলতে চায়, তারাই হল, অপরাধী। সে কথা যাক্, এখন তোমার মতলব কি বল। সুধীরের সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে দিতে বলছো?

উর্ম্মিলা। আমি কিছুই ভাঙ্‌তে গড়তে বলছি নে আসল কথা তোমাদের জানালাম, এখন তোমরা যা ভাল বিবেচনা হয় কর। আমি শুধু বলছিলাম তোমার সঙ্গে বিয়ে হলে লীলা সুখী হত!

শশী। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কাতর কণ্ঠে) দোহাই বৌদি, আমাকে তোমরা দয়া করে ছেড়ে দাও। আমি সন্ন্যাসী বৈরাগী মানুষ, বিয়ে করে নিজেও বিপদে পড়বো—অপরকেও সুখী করতে পারবো না। আমি কবে আছি কবে নেই—তার কোন ঠিক নেই। শুধু তোমার হাতের রান্নার জোরে সংসারে এতদিন টি'কে আছি, নইলে কবে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়ে যোগ দিতাম।

উর্ম্মিলা। না, না ঠাকুরপো! আমি তোমার ইচ্ছে বা মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে অনুরোধ করছিনে। লীলার মঙ্গল কামনা তোমার মনের মধ্যে কতখানি আছে, তা আমি জানি বলেই সব কথা তোমাকে খুলে বল্লাম। এখন ভাই যাতে লীলা জীবনে সুখী হতে পারে, তাই কর। যে কথা আমি তোমাকে জানাতে এসেছি, তার মূলে কতখানি সত্যি আছে, তা তুমি নিজে পরখ করে দেখতে হয় দেখ। তারপর, যা ভালো মনে হয় কোরো।

শশী। লীলার মঙ্গলের জন্যে যদি কোনও কাজ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও করতে হয় বৌদি—তাও করতে আমি সঙ্কুচিত হব না। আবার যখন ঠিক বুঝবো যে আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে লীলার জীবন বাস্তবিকই অসুখের হবে, তখন লীলাকে বিয়ে করতে এক মুহূর্ত্তও

দ্বিধা করবো না। কিন্তু যা আমি শুধু কর্তব্যের অনু-রোধেই করতে পারি, দোহাই তোমার, সখ করে আমাকে তা করতে বলো না।

উর্ম্মিলা। আমি আর তোমাকে কিছুই বলবো না—এখন থেকে লীলার সব ভার তোমার ওপর। তুমি যা ভাল বুঝবে তাতেই তার মঙ্গল হবে।

শশী। এত বড় দায়িত্বের ভার বহন করবার শক্তি কি আমার আছে বৌদি যে তুমি নিশ্চিন্ত মনে লীলার ইষ্টানিষ্টের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছ

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ, সে শক্তি একমাত্র তোমারই আছে। তুমি লীলাকে দেখ, শোন, বোঝো—তারপর যা ভাল মনে হয় কোরো। (শশিনাথ নীরব) এর মধ্যে ভাবার কি আছে ঠাকুরপো ? যেমন ভাল বুঝবে করবে।

শশী। না ভাবনার কিছুই নেই। লীলা নিজের মনই বা কি বোঝে, আর নিজের ভাল-মন্দই বা কি বোঝে ? আমি সব ঠিক করে নেব—তুমি কিছু ভোবো না বৌদি। তুমি গিয়ে একবার লীলাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাওতো।

(উর্ম্মিলার প্রস্থান ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে লীলার প্রবেশ)

শশী। এসো। (তাহার দিকে একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল) বোসো। ব্যস্ত ছিলে ?

লীলা। (বসিয়া) না।

শশী। আমি তোমার বৌদিকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। (পদচারণ করিতে করিতে) আচ্ছা লীলা, আমি যে তোমার একজন হিতৈষী, সব রকমে তোমার মঙ্গল-কামনা করি, সে ধারণা তোমার আছে তো ?

লীলা। আছে।

শশী। বেশ কথা। সে বিশ্বাস কখনও হারিওনা। আমার কাছ থেকে তুমি জেনে রেখো, কখনো তোমার সে বিশ্বাস হারাবার কারণ ঘটবে না।

লীলা। আমি কি এমনই অকৃতজ্ঞ শশিদা যে, আমাকে একথা জানিয়ে দিলে তবে আমি জানবো—তবে আমার মনে থাকবে ?

শশী। কৃতজ্ঞতার কথা কেন বলছো লীলা ? তুমি নিজের গুণে আর আত্মীয়তার জোরে আমাদের স্নেহ আকর্ষণ করেছ। তোমার পাওনার বেশী আমরা কিছুই দিইনে যার জন্যে তুমি কৃতজ্ঞ থাকতে পারো। (একটু ইতস্তত করিয়া) একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করছি। আশা করি তুমি অসঙ্কোচে তার যথার্থ ও সহজ উত্তর দেবে। একান্ত প্রয়োজন মনে না করলে তোমাকে কষ্ট দিতাম না।

(লীলা নীরব)

(একটু থামিয়া) তোমার কাছ থেকে যেমন সহজ ভাবে উত্তর চাচ্ছি, আমিও ঠিক তেমনি সহজ ভাবে কথাটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো। সুধীরের সঙ্গে তোমার বিয়ে কি তোমার মনঃপূত নয় ?—তুমি অসঙ্কোচে এ কথাটার উত্তর দাও—কোন কোন সময়ে লজ্জা-সঙ্কোচ চেষ্টা করেও দূর করতে হয়। (লীলাকে নীরব দেখিয়া) বল লীলা, বল, আমার কথার উত্তর দাও। এ বিয়ে কি তোমার মনঃপূত নয় ?

লীলা। না।

শশী। (এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া) বেশ কথা। আচ্ছা, আমার সঙ্গে বিয়ে হলে কি তুমি সুখী হও ? বল, লজ্জা করো না !

[লীলা ধীরে ধীরে মুখ নীচু করিল। কোন কথা বলিল না।]

শশী। তুমি যখন কিছুই বলছো না তখন আমি ধরে নিচ্ছি আমার সঙ্গে বিয়ে হলে তুমি সুখী হও এই তোমার ধারণা ! চায়ের চিনির প্রসঙ্গে সেদিন তোমাকে যে কথা বলেছিলাম, তা বোধ হয় তোমার মনে আছে। তুমি আমাকে ভালবাস জেনে খুবই সুখী হয়েছি, কিন্তু তুমিও জেনে রাখ—আমিও তোমাকে কম ভালবাসিনা। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) কিন্তু আমরা পরস্পরকে ভালবাসি বলেই যে আমাদের উভয়ের বিয়ে হওয়া দরকার

যা মঙ্গলকর, তা নাও হ'তে পারে তো লীলা? বিবাহিত জীবন কামনা করে তো আমাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মায় নি! তবে কেন সে ভালবাসাকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে বিবাহ একান্ত প্রয়োজন হবে? তোমার সঙ্গে যার বিয়ের কথা হচ্ছে, সে আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাকে আমি খুব ভাল রকম করেই জানি। বাংলা দেশে এমন একটিও মেয়ে নেই যে সুধীরকে পেয়ে ধন্য না মনে করবে। বিদ্যে বল, বুদ্ধি বল, রূপ বল, অর্থ বল,—সব বিষয়ে সে আমার চেয়ে অনেক ওপরে। দাদার এবং আমার বিশেষ আগ্রহ যাতে এ বিয়ে হয়—বৌদিরও তাই! এ তুমি ঠিক জেনো লীলা, পৃথিবীর মধ্যে যে তিনজন তোমার সবচেয়ে হিতৈষী, তারা তোমার জন্যে যে ব্যবস্থা করবে তাতে তোমার মঙ্গল হবেই। আর আমাকে তো তুমি জানো লীলা—আমি একরকম সন্ন্যাসী-বৈরাগী গোছের জীব, কবে দূরে সরে যেতাম, শুধু তোমাদের স্নেহের দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে রেখেছো, তাই আছি! আমাকে যতটুকু পেয়েছো ততটুকুই ভালো। তার বেশী পেতে গেলে দেখবে আমি একেবারে অকেজো জিনিস! মন তুমি একেবারে হাল্কা করে ফ্যালো! আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তুমি নিরাময় চিত্তে তোমার নতুন জীবনে প্রবেশ করো, তোমার বিবাহিত জীবন পুণ্যে আনন্দে সার্থক হোক! এর বেশী আমার আর বলবার কিছু নেই।

(কিছুক্ষণ পর্যন্ত দুইজনে নীরব হইয়া রহিল। তারপর)

শশী। লীলা।

লীলা। (যেন চৈতন্য লাভ করিয়া) কি বলছ?

শশী। আমি যা বললাম, বুঝেছো?

লীলা বুঝেছি।

শশী। তাহলে সুধীরের সঙ্গে বিয়েতে আর তোমার কোন অমত নেই তো?

লীলা। (রুদ্ধ নিশ্বাসে) না!

শশী। (আনন্দিত হইয়া) লক্ষ্মী মেয়ে! আজ তুমি আমাকে যে সুখী করলে ভাই, তা তোমাকে আর কি বলবো! আশীর্বাদ করি, তুমি চির সৌভাগ্যবতী হও!!

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[কয়েকদিন পরে। ড্রয়িংরুম। সোমনাথ এবং উর্ম্মিলা দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিল]

সোম। সরযূ কোথায়? সে কি খুব ভেঙে পড়েছে নাকি?

উর্মিলা। তা আর পড়বে না! খুব চাপা মেয়ে তাই—নইলে হয়তো কেঁদে কেটে অনর্থ করতো। মায়ের যত্ন জীবনে পেলে না, জগতে এক বাপ ছিল, তাঁকেও এই বয়সেই হারালো। ওকে দেখলে মায়া হয়।

সোম। হরিচরণবাবু যেদিন মারা গেলেন, সেদিন তো আর তুমি যাওনি; সে দিনটা যে কি করে ওখানে কেটেছে, তা এখন আর ভাবতেও পারিনে!

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপোর হাতে সরযূকে সঁপে দেবার পর হরিচরণবাবু আর কতক্ষণ ছিলেন?

সোম। ঘণ্টা দুয়েক বড় জোর। কিন্তু আর কথা কইতে পারেন নি। সেই সময়টা সরযূ বড় উতলা হয়ে পড়েছিল। লীলা সেই সময় ওকে খুব সামলেছে।

উর্ম্মিলা। সরযূ মেয়েটিকে আমার গোড়া থেকেই খুব ভালো লেগেছে! ওকে যে এমন করে ভগবান আমাদের সংসারে পাঠাবেন, তা কল্পনাও করতে পারিনি। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, ঠাকুরপো ও'কে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে?

সোম। তখন কি করে বুঝবো! সমস্ত দিন অজ্ঞান হয়ে থেকে হরিচরণবাবু তখন সবেমাত্র চোখ মেলেছেন। তাড়াতাড়ি মুখে ওষুধ দিতে গেলাম—খেলেন না। বল্লেন—শশীনাথ কৈ, শশীনাথ! তারপর শশীনাথের হাত ধরে খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন। ও-পাশে সরযূ

বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে হাত বাড়িয়ে সরযুর একখানা হাত টেনে নিয়ে শশীনাথ আর সরযুর হাত নিজের বুকের ওপর শশীনাথের দিকে চেয়ে বল্লেন—বল!

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপো কি বল্লে?

সোম। শশী বল্লে—কি বলবো বলুন! হরিচরণবাবু তার মুখের পানে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বল্লেন—বল, গ্রহণ করলে?

উর্ম্মিলা। (সাগ্রহে) তারপর!

সোম। শশীনাথ বেশ জোর করেই বল্লে—সরযুর সব ভার আমি নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

উর্ম্মিলা। দেখ, আমার মনে হয়, সরযুকে ঠাকুরপোর হাতে দেবার কল্পনা হরিচরণবাবুর মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। এতদিন সাহস করে বলতে পারেন নি।

সোম। আমারও তাই বিশ্বাস। ইদানীং উনি আমার কাছে যখনই সরযুর বিয়ের কথা পাড়তেন, তখনই তাঁর ভাব-ভঙ্গীতে মনে হ'ত যেন আমাকে কি একটা কথা বলতে চাইছেন—অথচ বলতে পারছেন না।

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপোর কথা শুনে তিনি আর কিছু বল্লেন?

সোম। না:। কোনও কথা বলতে পারলেন না; শুধু মুখ দিয়ে একটা তৃপ্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এলো, এবং বোধ হল চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।

উর্ম্মিলা। আচ্ছা, লীলা তখন সেইখানেই বসেছিল?

সোম। ছিল বৈকি! হঠাৎ ও-কথা জিজ্ঞেসা করলে যে?

উর্ম্মিলা। না এমনিই। যাই হোক—এখন পরশুদিন লীলার বিয়ে চুকে গেলেই আমি বাঁচি। তারপর ও-মাসে ঠাকুরপোর সঙ্গে সরযুর চারহাত এক করে দিতে পারলেই শাশুড়ীর কাছে আমি দায়ে খালাস হই। জান তো, ঠাকুরপোকে সংসারী করবার ভার মা আমার ওপর দিয়ে গেছেন। যে একগুঁয়ে ছেলে—এত সহজে যে রাজী হবে, তা ভাবিনি। যাই হোক, সরযু ঠাকুরপোর অযোগ্য হবে না।

সোম। কদিন ধরে ভারী পরিশ্রম যাচ্ছে—পরশুদিনের হাঙ্গামটা মিটলেই বাঁচি! তুমি যাও, সুধার সঙ্গে বসে খুচরো জিনিষের ফর্দটা তৈরী করে ফেলো; আমি একবার বাজারটা ঘুরে আসি!

[ভিন্ন ভিন্ন দিকে উভয়ের প্রস্থান]

[লীলা ও সরযুর প্রবেশ]

লীলা। আমার বিশ্বাস সরযু, তোমার দুঃখের পালা ভগবান আগেই সেরে দিচ্ছেন। সুখের দিন তোমার শীগগিরই আসবে।

(লীলা সরযুকে একখানি ইজিচেয়ারে বসাইয়া নিজে আর একখানি সোফায় বসিল)

সরযু। কি জানি ভাই, সে ভরসা তো আমার একটুও হয় না। কত রকমের দুঃখ আর দণ্ড আমাকে এরই মধ্যে ভোগ করতে হয়েছে—তা তুমি একটু একটু জেনেছো। শেষ আশ্রয় আর অবলম্বন ছিলেন, বাবা। তাও তো আমার দুরদৃষ্টে সইলো না।

লীলা। কাকা তোমায় নিরাশ্রয় করে যাননি সরযু। আশ্রয় ভাঙ্‌বার ঠিক আগেই তিনি তোমার আশ্রয় গড়ে দিয়ে গেছেন। (সহসা) আচ্ছা সরযু, তুমি ছেলেবেলায় শিব পূজো করেছিলে?

সরযু। (বিস্মিত হইয়া) না। কেন ভাই?

লীলা আর কোন ব্রতপূজা, যাতে—(লীলা থামিয়া গেল)।

সরযু। যাতে কি হয় লীলা?

লীলা। (ধীরে ধীরে) যাতে শশীদা তোমার স্বামী হতে পারেন?

সরযু। এ-জন্মে তো কিছু করিনি ভাই, পূর্ব্ব জন্মে যদি কিছু করে থাকি!

লীলা। এ-জন্মে যদি না করে থাকো, তাহলে নিশ্চয় জেনো, পূর্ব্ব জন্মে তোমার অনেক পুণ্য ছিল—তা না হলে এ কখনো হতে পারে না শশীদার আশ্রয়ে তোমার সব দুঃখ শেষ হবে সরযু।

সরযু। (আরক্ত নতমুখে) ভয় হয় ভাই, আমার কপাল এতই মন্দ যে এতটা সুখ আমার ভাগ্যে সম্ভব বলে মনে হয় না। তোমার শশীদাদা তো মানুষ নয় লীলা,

তিনি দেবতা! আমি এমন কি করেছি ভাই, যে তাঁর পায়ে চিরদিনের আশ্রয় পাবো!

লীলা। তাঁর নিজের দয়ায় আশ্রয় পাবে। তিনি করুণা কোরে তোমাকে আশ্রয় দেবেন। তুমি তাঁকে খুব বেশী না জেনেও ঠিক বলেছো সরযূ, তিনি দেবতার মত দয়ালু। ঠিক বলেছো তুমি, বাস্তবিকই তিনি মানুষ নন। তিনি মানুষের অনেক ওপরে—মানুষের সঙ্গে তাঁর দেওয়া-নেওয়ার কারবার নেই—তিনি শুধু দিতেই জানেন—নিতে তিনি কিছু চান না।

সরযূ। (সহসা) আচ্ছা লীলা, তোমার শশীদাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে বেশ ভাল হতো, না?

লীলা। (বিহ্বল কণ্ঠে) ছিঃ ভাই—ওকি কথা। তাছাড়া সরযূ, একজনের সঙ্গে আমার বিয়ে স্থির হয়ে গেছে—এখন এসব কথা বলতে নেই ভাই!

সরযূ। (লজ্জিত হইয়া) আর বলবো না। আচ্ছা, সুধীরবাবুকে তুমি দেখেছো তো লীলা?

লীলা। দেখেছি।

সরযূ। শুনেছি, রূপে গুণে ধনে সব বিষয়ে তিনি সমান।

লীলা। আমিও তাই শুনেছি।

সরযূ। তিনি তোমাকে প্রথম দিন দেখে, শুনলাম মুগ্ধ হয়ে গিছলেন?

লীলা। আমিও সেই রকম শুনেছি।

সরযূ। আচ্ছা লীলা?

লীলা। কি?

সরযূ। তোমার মনটা ভাই কোথায় থাকে, কিছুতেই তার নাগাল পাব না কি?

লীলা। (হাসিয়া) আমার মনের নাগাল পাবার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত? আচ্ছা, তোমার কি আন্দাজ সরযূ, আমার মন কোথায় থাকে?

সরযূ। তা আমি আন্দাজ করতে পারিনে—একবার যা মনে করি, পরমুহূর্ত্তেই তা ভুল বলে মনে হয়।

লীলা। কিন্তু তোমার মনের সন্ধান আমি ঠিক জানি—আন্দাজ নয়—একেবারে ঠিক কথা। বলতো কোথায় থাকে?

সরযূ। (দ্বিধাভরে) বল!

লীলা। মুখে বলবো না। একখানি গান গেয়ে তোমার মনের কথা তোমাকেই শুনিয়ে দেব।

সরযূ। সে তো আরও ভাল।

[লীলা উঠিয়া আসিয়া অর্গ্যানের সুমুখে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল। গান চলিতেছে এমন সময় শশীনাথের প্রবেশ। লীলা তাহাকে দেখিতে পাইল না; সরযূ দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, শশীনাথ ইঙ্গিতে তাহাকে উঠিতে বারণ করিল। গান চলিতে লাগিল। শশীনাথ লীলার পিছনে দাঁড়াইয়া গান শুনিতে লাগিল।]

শশী। (গান থামিলে) লীলা, এ গানখানি তুমি কবে শিখেছো?

(সহসা শশীনাথকে দেখিয়া লীলা লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অল্পক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর)

লীলা। সরযূ! এমন করে শশিদার সামনে আমায় অপ্রস্তুত করা তোমার ভারী অন্যায়। কেন তুমি আমায় বল্লে না! (দ্রুত প্রস্থান)

শশী। (অবাক হইয়া) একে আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলাম না, সরযূ! হঠাৎ কখন কি কারণে যে লীলা রেগে ওঠে তা আমার কাছে দুর্বোধ রহস্যের মতো জটিল বলে মনে হয়! (ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া) তোমার জন্যে লীলার পাশের ঘরটি বৌদি সাজিয়ে রেখেছেন। তোমার পড়বার জন্যে রামায়ণ মহাভারত থেকে আরম্ভ করে গীতাঞ্জলি পর্য্যন্ত কুড়ি-পঁচিশখানা বই কিনে আনিয়েছেন। তোমার এখানে কোনও অসুবিধা হবে না সরযূ।

সরযূ। (দ্বিধাযুক্ত কণ্ঠে) আপনাদের এখানে আমার কোন অসুবিধা হবে না তা জানি। কিন্তু আমিই যেন সকলকে বিব্রত করছি। তার চেয়ে আমি যদি কিছুদিনের জন্যে বিলাসপুরে—

শশী। কিন্তু তাতে যদি আমরা বিব্রত মনে করি? কিসে আমরা বেশী বিব্রত হব, সেটা তোমার চেয়ে

আমরা বেশী বুঝিনে কি? তাছাড়া, শুধু আমাদের বেশী বিব্রত হবার কথাই এর মধ্যে নেই। তুমি কোথায় বেশী বিব্রত হবে? একা বিলাসপুরে, না, লীলা আর বৌদির কাছে এখানে? (সরযূ নীরব) কাকার কাছ থেকে আমি যে অধিকার পেয়েছি, সেকি ভুলে গেছ সরযূ? এখন এ পৃথিবীর মধ্যে তোমার ওপর আমার অধিকার সকলের চেয়ে বেশী। আমার সেই অধিকার খাটাতে তুমি যদি বাধা দাও, তাহলে বুঝবো আমার অধিকার তুমি অস্বীকার করতে চাও। তুমি নিজের বিষয় সব রকম ভাবনা চিন্তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত কোরে আমার ওপর একান্ত নিশ্চিন্ত ভাবে সব ছেড়ে দাও। আমি তোমার যা ব্যবস্থা করবো, তাতে তোমার নিজের কাছে বা জগতের কাছে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবার কারণ হবে না।

সরযূ। আমি আর কোন বিষয়ে নিজের বিবেচনা খাটাবো না—আপনি যা করবেন তাই হবে। আমি এখানেই থাকবো।

শশী। খুব ভালো কথা; শুনে সুখী হলাম। এখন যাও, গিয়ে একবার লীলাকে পাঠিয়ে দাও।

(সরযূর প্রস্থান)

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপো! তোমাকে আমি চারদিকে গরু খোঁজা ক'রে বেড়াচ্ছি! ময়রা এসেছে—ওকে অর্ডারগুলো লিখিয়ে দেবে এসো—তোমার দাদা বাড়ী নেই!

শশী। বৌদির আনন্দ যে আজ আর ধরে না দেখছি! কিন্তু তোমার এ আনন্দ আজ কোথায় থাকতো বৌদি, যদি তোমার একগুঁয়েমীকে প্রশ্রয় দিতাম?

উর্ম্মিলা। এ আনন্দ আজ এই রকমই হ'ত—তবে ফাল্গুন মাসের আনন্দটা বাদ পড়তো। তা যা হয়েছে ভালই হয়েছে ঠাকুরপো—আমার আর কোন দুঃখ নেই। সরযূকে পেয়ে আমি বুঝেছি যে, আমরা যখন দুর্ভাবনায় আকুল হয়েছিলাম, তখন ভগবান আমাদের মঙ্গলই করেছেন। সরযূ মেয়েটি একটি অদ্ভুত জিনিষ। একেবারে আসল হীরে, যত মাজবে ঘষবে তত চক্‌চকে হবে—কোনখানে একটুও ময়লা নেই। তোমার ভাগ্য ভাল ঠাকুরপো।

শশী। ভাগ্য আমার নিশ্চয়ই ভালো বৌদি, তোমাকে যখন প্রসন্ন করতে পেরেছি। ফাল্গুন মাসেও তোমাকে ঠিক এই রকম প্রসন্ন করতে পারবো—কারণ সৎপাত্রের ভাণ্ডার ফুরিয়ে যায়নি। তবে পাত্রটির সময় জ্ঞানের একান্ত অভাব—পনেরো দিন বলে ফিরতে একমাস পার কোরে ছায়। কিন্তু সে-সব পরের কথা পরে হবে; উপস্থিত তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ আছে। তোমরা যে ব্যবস্থা করেছো পুরুত লীলাকে দান করবে, তা আমার একটুও ভাল বোধ হচ্ছে না। বাড়ীতে লোক থাকতে পুরুতে দান করবে কেন?

উর্ম্মিলা। কে করবে বল? তোমার দাদার যা শরীর, তিনি তো পারবেন না!

শশী। আমি করবো?

উর্ম্মিলা। তুমি!! না ঠাকুরপো, তোমার দান করা হতেই পারে না, আর যে কেউ হোক করবে—তুমি না।

শশী। (ক্ষণেক পরে) তা হলে তুমি করো না?

উর্ম্মিলা। শাস্ত্র কি তা তোমরা জানো; আমার মনে হয় দান করবার অধিকার আমার নেই।

শশী। না থাকলে কিনে নিলেই হবে। পয়সা দিলে তোমাদের শাস্ত্রে সবই তো কিনতে পাওয়া যায়।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মা, বাবু এসেছেন।

উর্ম্মিলা। চল্ যাই। তোমার দাদাকে দিয়েই তাহলে ময়রার ফর্দ্দ করে দিই—তুমি বরঞ্চ নেমন্তন্নর ফর্দ্দটা লিখে নাও।

শশী। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে ফর্দ্দ তৈরী করে ফেলছি। (উর্ম্মিলার প্রস্থান। ভিন্ন দিক দিয়া লীলার প্রবেশ)

শশী। এস! তোমায় আমি ডাকতে পাঠিয়েছিলাম। (লীলা নীরব) তোমার শরীর কি ভাল নেই লীলা?

লীলা। কেন ডাকছিলে শশীদা?

শশী। (ইতস্তত ভাবে হাতের মখমল কেশটি খুলিয়া) পরশু তোমাকে এটা আমি উপহার দেব—তোমার গলায় ঠিক হবে কি না তাই দেখতে এলাম।

(মুক্তার কণ্ঠি বাহির করিল)

লীলা। (সহসা উত্তেজিত কণ্ঠে) আমাকে আর কতরকমে অপমান করবার সখ আছে শশিদা?—যা আছে সব মিটিয়ে নাও—আর কত রকমে শাস্তি দেবার আছে দাও।

শশী। (অবাক হইয়া) আমি তোমাকে অপমান করছি—আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি?

লীলা। (চাপা গলায়) হাঁ্যা তুমি! তুমি আমাকে অপমান করছো—তুমি আমাকে শাস্তি দিচ্ছ! শুনলে? এখন যাও—আমি আর পারছিনে! (দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া পিছন ফিরিল। তারপর) তোমরা কি মনে করেছো—আমি একটা কাঠের পুতুল যে তুমি যেখানে রাখবে, সেইখানেই থাকবো, যেমন সাজাবে, তেমনি সাজবো? আমার শরীরে কি রক্ত-মাংস নেই যে তুমি যত আঘাতই দাও না কেন, আমি চুপ করে থাকবো?

শশী। (কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া) এমনিই ভুল বুঝলে লীলা? কেবল আঘাত, কেবল অপমান, কেবল শাস্তি? ছ'বছর আগে যেদিন প্রথম এ বাড়ীতে এসে ঢুকেছিলে, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত কেবল কি তাই পেয়েছো—আর কিছু নয়?

লীলা। জানি তোমরা অনেক দয়া করেছো—এই আবর্জনার পিছনে তোমরা অনেক টাকা নষ্ট করেছো—কিন্তু এখন তার ব্যবস্থাও তো হয়েছে। খুব বড়লোকের ঘরে আমার বিয়ে দিচ্ছ। এখন থেকে চক্রবৃদ্ধি সুদে তোমাদের ঋণ শোধ দিলেও চলবে না কি?

শশী। তা হয়তো হবে। কিন্তু শুধু টাকার ঋণটাই তো ঋণ নয় লীলা—ঋণ পাওয়ারও তো একটা ঋণ আছে—সেটা কি এই মুহূর্তে এমনি করে শোধ করছো।

লীলা। হাঁ্যা, এমন করেই তা শোধ করছি—এমনি করে তোমাদের দাসীত্ব স্বীকার করে—তোমাদের সব হুকুম, সব জবরদস্তি মাথায় তুলে নিয়ে! এখনো যদি কিছু বাকী থাকে তো বল, আর কি করতে হবে?

শশী। (গভীর বদ্ধস্বরে) তোমারও যা বলবার বাকী আছে বলে নাও লীলা, যত ভীষণ কথা, যত কঠিন শব্দ—তা সে যত মিথ্যা যত নিষ্ঠুরই হোক না কেন। উঃ! এ তুমি কি করছো লীলা?

(এইবার লীলা আর নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিল না। কাতর কণ্ঠে অস্ফুট শব্দ করিয়া সে ধীরে ধীরে চেতনা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। শশিনাথ প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। যখন বুঝিল, লীলা মূর্চ্ছা গিয়াছে তখন সে ত্বরিত পদে দ্বারের অর্গল লাগাইয়া দিয়া লীলার বিকল লঘুদেহ দুই বাহুর মধ্যে উঠাইয়া লইয়া সোফার উপর স্থাপন করিল, তারপর পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল এবং মুখে-চোখে অল্প অল্প জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে লীলা চক্ষু উন্মিলীত করিয়া উঠিয়া বসিল)।

শশী। (একটু দূরে সরিয়া গিয়া) কাউকে ডাকবো? এখনও কি শরীর দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে?

লীলা। (মুখ নত করিয়া) না। (মুখ তুলিয়া) দরজাটা খুলে দাও শশীদা।

শশী। (দ্বার খুলিয়া দিয়া) এখনি উঠছো? তাহলে নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করগে, আর তারই সঙ্গে নিজের মনকে শান্ত কোরে নাও গে! আমি আর বেশী কি বলবো তোমাকে—ভগবান তোমার মনে শান্তি দিন! না জেনে যদি কিছু অন্যায় করে থাকি ভাই—ক্ষমা কোরো! এর বেশী আমার কিছু বলবার নেই!

(ধীরে ধীরে লীলা প্রস্থান করিল। শশিনাথ সোফায় আসিয়া বসিয়া দুই করতলে মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্ম নিশ্চল হইয়া রহিল। উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপো! (শশিনাথ চকিত হইয়া মুখ তুলিল) কি হয়েছে তোমার ঠাকুরপো?

শশী। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) কিছু হয়নি তো।

উর্শ্মিলা। তবে মুখ অমন শুকনো কেন ?

শশী। ভাবনা-চিন্তে কি কম বৌদি! একটা বিয়ের কথা, সোজা তো নয়! (ক্ষণেক পরে) বৌদি!

উর্শ্মিলা। কি বল দেখি!

শশী। (এক মুহূর্ত্ত ইতঃস্তত করিয়া) তোমার কথা না শুনে কি জানি হয়তো ভাল হল না!

উর্শ্মিলা। আমি তো বুঝতে পারছিনে ঠাকুরপো, কি ভাল হলো না!

শশী। সুধীরের সঙ্গে বিয়ে হলে লীলা যদি সুখী না হয় বৌদি? এখন কি আর সেকথা ভেবে দেখবার সময় নেই বৌদি ?

উর্শ্মিলা। (ক্ষণেক চিন্তার পর) না ঠাকুরপো! এখন আর সময় নেই। এখন উল্টো-পাল্টা করতে গেলে একটা ভীষণ গোলমালের সৃষ্টি হবে।

শশী। কিন্তু লীলা যদি অসুখী হয় ?

উর্শ্মিলা। হবে না।

শশী। আন্দাজ করছ ?

উর্শ্মিলা। না—আমার বিশ্বাস তাই।

শশী। (অন্যমনস্ক হইয়া) তা'হলেই ভাল—কিন্তু এখনো—

(নেপথ্যে—"শশি কোথায় গেলে হে"—বলিতে বলিতে পরক্ষণেই বরেনের প্রবেশ)

বরেন। এই যে, বৌদিদিও এখানে।

(উর্শ্মিলার পদধুলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশিনাথের পিঠে বরেন সজোরে কীল মারিল)

উর্শ্মিলা। বাঁচলাম বরেন ঠাকুরপো! তোমার আসতে দেরী হচ্ছিল দেখে আমার এমনি ভাবনা হচ্ছিল! খবর সব ভাল ? এত দেরী হলো যে ?

বরেন। প্রথমটা খবর ভাল ছিল না। এখন ভালোই। সেরে উঠে ভগ্নিপতিটি কি সহজে ছেড়ে দিতে চায়। অনেক করে পালিয়ে এসেছি।

(শশিনাথ বরেনের প্রতি চাহিয়া মৃদুহাস্য করিল)

শশী। বৌদি, শিগগির বরেনের খাবার ব্যবস্থা কর—ওর বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাওয়া হয়নি!

উর্শ্মিলা। আমি এখনই চল্লাম—বরেন ঠাকুরপো বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নাও।

বরেন। ব্যস্ত হয়ো না বৌদি! আমি বাড়ী থেকে জলটল খেয়ে আসছি। তারপর? তোমাদের এখানকার খবর সব ভাল? শশীর কাছ থেকে চিঠিতে হরিচরণ বাবুর মৃত্যুর খবর শুনলাম। সে সময়টা তোমাদের খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে কেটেছে তাহলে? হরিচরণ বাবুর মেয়ে—সরযূ—তিনি ভাল আছেন ?

উর্শ্মিলা। হ্যাঁ। ভাল আছে। বেচারার চোটটা বড় বেশী রকমই লেগেছিল—এই বিয়ের গোলমালে একটু সামলে উঠেছে মনে হয়। তুমি সরযূর সঙ্গে দেখা করবে না বরেন ঠাকুরপো ?

বরেন। দেখা করবো বৈকি!

উর্শ্মিলা। আচ্ছা আমি তাকে নিয়ে আসছি।

(প্রস্থান)

শশী। (মৃদু হাস্যে) সরযূর সঙ্গে দেখা সেরে একবার আমার ঘরে এসো বরেন। আমি ঘরেই থাকবো।

বরেন। তুমি থাক না!

শশী। না! আমি আমার ঘরে চল্লাম। তুমি এসো। (প্রস্থান)

(উর্শ্মিলা ও সরযূর প্রবেশ)

বরেন (সরযূর প্রতি) ভাল আছেন ?

সরযূ। (ঘাড় নাড়িয়া) আপনি ভাল আছেন? আপনার ভগ্নিপতি ?

বরেন। আমি বেশ ভালই আছি। ভগ্নিপতি সেরে উঠেছেন।

উর্শ্মিলা। (সরযূর শোকক্লিষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া) এই ছেলেমানুষের ওপর দিয়ে, বরেন ঠাকুরপো এরই মধ্যে এত ঝড় বয়েছে যে, একে যেন ভগবানের কৃপায় আর কখনো দুঃখের মুখ না দেখতে হয়।

বরেন। (সহানুভূতির স্বরে) এইটেই বৌদিদি কিছুতেই বুঝতে পারিনে যে, ভগবান যদি আছেন তোবু

এ অবিচার অন্যায়ের রাজত্ব গড়ে তাঁর কি উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে? যে নিষ্পাপ পবিত্র তার প্রাণে দুঃখের আগুন জ্বেলে তিনি কি সুবিচার করেন—আর যার হৃদয় অন্যায় অনাচার পাপের কারখানা, তাকে সুখ ঐশ্বর্য্যের সিংহাসনে বসিয়ে রেখে তিনি কি ইষ্ট সাধন করেন?

উর্ম্মিলা। এসব বড় বড় কথার মীমাংসা আমরা মেয়েমানুষ হয়ে তোমাদের কাছে কি করবো ঠাকুরপো! তবে আমার মনে হয়—এমনি দুঃখ-ভোগের মানুষের হয়তো প্রয়োজন আছে। মনের যে ময়লা চোখে পড়ে না—চোখের জলের মধ্যে তা হয়তো কাটে।

বরেন। (হাসিয়া) তোমার বৌদি যেমন মন তেমনি কথা বলেছো। কিন্তু এ হলো বিশ্বাসের কথা, এ যুক্তির কথা নয়।

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মা! বড়বাবু আপনাকে একবার ডাকচেন

উর্ম্মিলা। তোমরা গল্প করো আমি এখনই আসছি

(প্রস্থান)

সরযূ। বাবার মৃত্যুর পর রেঙ্গুন থেকে আপনি আমাকে যে চিঠিখানি দিয়েছিলেন, সেখানি পড়ে পড়ে দুঃখের মধ্যে আমি অনেকটা শান্তি পেতাম। আপনার সে চিঠিখানি আমি বোধ হয় কুড়িবার পড়েছি।

বরেন। (সাগ্রহে) আর সেই চিঠির উত্তরে যেচিঠি আপনি আমাকে লিখেছিলেন, তা বোধহয় আমি পঞ্চাশবার পড়েছি! (কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল) আপনার সে চিঠিখানিতে পিতৃ-ভক্তির আর স্থিরবুদ্ধির এমন সুন্দর পরিচয় পেতাম যে, প্রতিবারই পড়ে আমি মুগ্ধ হতাম।

সরযূ। (ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া) আর আমাকে আপনি ব'লে ডাকা আপনার উচিত হয় না।

বরেন। (রুদ্ধ নিঃশ্বাসে) কেন?

সরযূ। (স্মিতমুখে) এখনো কি আপনি মনে করেন আমাকে তুমি বলবার অধিকার আপনার হয়নি?

বরেন। আপনি শব্দটা কি এতই কর্কশ?

সরযূ। সম্পর্ক হিসাবে কর্কশ লাগে। আগে যখন আপনি প্রতিদিন আমাকে আপনি বলে ডাকতেন, অভ্যাসের জন্যে তত খারাপ লাগতো না—আজ রেঙ্গুন থেকে এতদিনের পর এসে "আপনি" বলাতে কানে বড় লাগছে।

বরেন আমারও তো ঠিক সেই রকম লাগতে পারে।

সরযূ। তা পারে। কিন্তু আপনাকে আমি 'আপনি' বল্লে অন্যায় হয় না—কিন্তু আপনি যদি আমাকে 'আপনি' বলেন তাহলে হয়।

বরেন। (ঈষৎ নীরব থাকিয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে) তুমি যখন আমাদের এ অধিকার স্বীকার করচো তখন আজ থেকে তোমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবো—আর তোমাকে ডাকতে হ'লে সরযূ বলেই ডাকবো—কি বল?

সরযূ। (লজ্জারঞ্জিত মুখে) নিশ্চয়ই। এর অনেক আগেই তাই করা উচিত ছিল। আপনি যখন আপনার কর্ত্তব্য কিছুতেই করলেন না—তখন কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে আমি আপনাকে কর্ত্তব্য পালন করাতে বাধ্য করল'ম।

বরেন। ভাগ্যে কর্ত্তব্যটা নিজে থেকে করিনি—তা'হলে তোমার দ্বারা বাধ্য হবার এ সুখটুকু তো পেতাম না সরযূ!

সরযূ। কর্ত্তব্য ক'রে আপনার সুখ হয় না? কেউ করিয়ে দিলে তবে সুখ হয়?

বরেন। সকলে নয় সরযূ! তুমি করিয়ে দিলেই হয়! তুমি এমনি করে আমার সকল কর্ত্তব্যের কার্য্যকরী শক্তি হোয়ো—আমার তুচ্ছ জীবনকে সফল কোরো—আমার জীবনের ধ্রুবতারা হোয়ো সরযূ। এ আমার আজকের তৈরী কল্পনায় নয় সরযূ—এ অনেক দুঃখে অনেক সুখে অনেক দিনের গড়া আশা! বল একবার—এ আমার শুধু স্বপ্ন নয়?

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। তুমি বলেছিলে বরেন ঠাকুরপো বিশ্বাসের কথা। আমার মনে হয়, সত্যের সঙ্গে বিশ্বাসের এত

বেশী যোগ আছে যে, যা আমরা ঠিক বিশ্বাস করি, সেটা অনেক সময়েই সত্যি হয়। ভগবান আছেন বলে যখন চিরদিন ধরে প্রায় সকল মানুষেরই বিশ্বাস তখন বুঝতেই হবে সত্যি সত্যিই ভগবান আছেন। আমি চলে যাওয়ার পর তোমাদের কি এই কথাই হচ্ছিল বরেন ঠাকুরপো?

বরেন। না, আমাদের সে কথা হচ্ছিল না। কিন্তু তুমি যা বলছো তাই ঠিক বৌদি; বিশ্বাস ঠিক যেন আলো। যুক্তি যেখানে মাথা ঠুকে মরে—বিশ্বাস সেখানে একেবারে পরিষ্কার করে দেয়।

উর্ম্মিলা। সেই জন্তেই তো তোমার সম্বন্ধে আমার মনে হচ্ছে যে বোশেখ মাসের লগ্নটাও আমাদের ফাঁক যাবে না।

বরেন। কেন বল দেখি?

উর্ম্মিলা। সুবাসিনীর কাছে শুনেছি—তোমার বোশেখেই বিয়ে।

বরেন। (সরযূর প্রতি চাহিয়া) এত ধৈর্য্য আমার থাকবে কি? কেন ফাল্গুন মাস কি অপরাধ করলে বৌদি?

উর্ম্মিলা। (সহাস্তে) এত অধীর হয়ে পড়েছো বরেন ঠাকুরপো? কিন্তু আর একজন যদি তোমার চেয়েও বেশী অধীর হয়ে থাকে?

বরেন। তা'হলে সে একজনকে বোলো বৌদি, তেমন অবস্থায় এই মাঘ মাসেও আমার আপত্তি নেই!

উর্ম্মিলা। এ বিবাদ কি আমার দ্বারা মিটবে বরেন ঠাকুরপো? তোমরা দুজনে মিলে এর যা'হয় একটা মীমাংসা কোরো—আচ্ছা, বোসো, ঠাকুরপোকে আমি ডেকে নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

বরেন। (আবেগপূর্ণ কণ্ঠে) শশী এর কি মীমাংসা করবে সরযূ! এ মীমাংসা তোমাতে আমাতে করবো। কিন্তু এ বিষয়ে তুমি যা বলবে তাই হবে সরযূ। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি বলবো—কালকেরই লগ্নে! নিজের সৌভাগ্য থেকে কে দূরে থাকতে চায় সরযূ?

(সরযূ মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না)

(উর্ম্মিলার প্রবেশ)

বরেন। কি হলো বৌদি—শশী এলো না?

উর্ম্মিলা। না—তার কাছে গেলাম না। ঠাকুরপো আবার তার নিজের বিয়ের দিন নিজে ঠিক করবে!! কোন রকমে তার বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে এই ঢের!

বরেন। (দুঃসহ বিস্ময়ে) শশীর বিয়ে নাকি?

উর্ম্মিলা। কেন—ফাল্গুন মাসে ঠাকুরপোর সঙ্গে সরযূর বিয়ে! তুমি জান না?

বরেন। না—

উর্ম্মিলা। জানবেই বা কেমন করে বল; মনের দুঃখে কোন কথা তো কোথাও লেখা হয়নি! আর তা ছাড়া হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল। কাকা শেষ সময়ে সরযূকে ঠাকুরপোর হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন আর ঠাকুরপোও রাজী হয়েছে! খুব সুখবর নয় বরেন ঠাকুরপো?

বরেন। (হাসিবার চেষ্টা করিয়া) খুব! (উঠিয়া) বৌদি, আজ আমি এখন বাড়ী চল্লাম—কাল আবার আসবো!

উর্ম্মিলা। (ব্যস্ত হইয়া) সেকি? তুমি খাবে না?

বরেন। না বৌদি—কয়েকদিন ঘুম হয় নি—আজ একটু ভালো করে ঘুমুবো। তুমি তো জানো—আমি সহজে খাওয়া বাদ দিইনে!

উর্ম্মিলা। তবে একটু মিষ্টি খেয়ে যাও!

বরেন। তাও আজ থাক বৌদি। আচ্ছা বৌদি না জেনে অপরাধ করলে—ক্ষমা পাওয়া যায় না কি?

উর্ম্মিলা। নিশ্চয় পাওয়া যায়। কিন্তু একথা বলছো কেন বরেন ঠাকুরপো?

বরেন। সে আর একদিন বলবো—ঘুম পাচ্ছে বৌদি—আজ চল্লাম।

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা করে যাবে না?

বরেন। কাল করবো। (প্রস্থান)

উর্ম্মিলা। চল সরযূ—আমরা ভাঁড়ার ঘর বন্ধ করে ওপরে যাই। লীলা বোধ হয় এতক্ষণ শুয়ে পড়েছে—রাত্ত বড় কম হয়নি। (উভয়ের প্রস্থান)

ধীরে ধীরে রঙ্গমঞ্চের আলোক কমিয়া গেল। বাহির হইতে রাত্রিবেলাকার আলোর অভাব পাওয়া যাইতে লাগিল। বহুদূর হইতে যন্ত্র সঙ্গীতের ক্ষীণসুর ভাসিয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে শশীনাথ প্রবেশ করিল। দু'একবার পদ-চারণা করিয়া সে ইজি-চেয়ারটায় আশ্রয় করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত্ত এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। তারপর দ্বারের বাহিরে কাহার সাড়া পাইয়া শশীনাথ বলিল—কে? দ্বারের বাহিরে শব্দ হইল—শশীদা—আমি লীলা!

শশী! (উঠিয়া নিকটে গিয়া) তুমি যে এত রাত্রে এসেছো লীলা?

লীলা। একটা কথা বলতে এসেছি।

শশী। আচ্ছা, ভেতরে এসো। (লীলা ভিতরে আসিল) বোসো।

লীলা। বসবার আগে তোমাকে—

[লীলা শশীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। শশিনাথ তাড়াতাড়ি তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া চেয়ারে বসাইল]

শশী। ছিঃ লীলা! এত অধীর হচ্ছ কেন? স্থির হও। চুপ কোরে একটু বোসো—এখন কিছুক্ষণ কথা কোয়ো না।

লীলা। (কিয়ৎকাল পরে) আমাকে ক্ষমা কর শশিদা, আমি তখন বড় অন্যায় করেছি!

শশী। ক্ষমা কাকে করবো লীলা? তোমার ওপর আমার একটুও রাগ নেই—তখনো ছিল না! আমি শুধু এই ভাবছি যে, অন্যায় তুমি করেছো, না, তোমার ওপর করা হয়েছে!

লীলা। নিশ্চয় আমি অন্যায় করেছি! এতবড় অন্যায় জীবনে আমি কখনো করিনি—কেউ বোধ হয় করে না। তোমার অসীম দয়া আমি ভাল করে শোধ দিয়েছি!

শশী। অন্যায় তুমি তখন করোনি লীলা—অন্যায় এখন করছো! তুমি আমাকে তখন যে-সব কথা যেমন করে বলেছিলে, খুব আপনার লোকেরই খুব আপনার লোককে তা' অমন করে বলবার অধিকার থাকে। কিন্তু এখন তুমি যা মানিয়ে গুছিয়ে বলতে এসেছো, তা আমার একটুও ভাল লাগছে না। বাস্তবিকই আমাকে তা কষ্ট দিচ্ছে!

লীলা। আমি জানি শশীদা, তুমি সব জিনিষ ক্ষমা করতে পারো, শুধু ক্ষমা চাওয়াকেই ক্ষমা করতে পারো না। কিন্তু সে হল অন্য কথা। আমি শুধু এই ভেবে মরে যাচ্ছি যে, চিরদিন তোমার কাছে শিক্ষা পেয়ে এসে আজ আমার এতটা অসংযম হল কেমন করে!

শশী। নিজের মন সব সময় ঠিক বোঝা যায় না লীলা—সব সময় সব জিনিষ ঠিক ওজন কোরেও দেখা যায় না। আমি নিজেও আমার মনের পরিচয় দু'দিন আগে পাইনি—তাই আজ বুকের ওপর যাঁতার মতো একটা দুঃখের ভার বসেছে। এ দুঃখ আঘাত পেয়ে নয় লীলা, আঘাত দিয়ে!

লীলা। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) আমি যে কথা বলতে এসেছি, শুনলে না তো শশীদা!

শশী। (অধীর আগ্রহে) কি বল?

লীলা। তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আর তোমাকে জানাতে এসেছি যে, তোমার শিক্ষা একবার নিষ্ফল হোয়েছে বলে বারে বারে হবে না। আমি বেশ ভালো করে মন ঠিক করে নিয়েছি। আর কখনো আমার অসংযম দেখতে পাবে না।

শশী। কখনো নয়?

লীলা। কখন নয়।

শশী। ঠিক তো?

লীলা। ঠিক।

শশী। (নিরুৎসাহ কণ্ঠে) বেশ ভাই বেশ! আমি সর্বান্তঃকরণে কামনা করি, তোমার সংযম আর শিক্ষা যেন চিরদিন তোমাকে জীবনের সুপথ দিয়ে নিয়ে যায়। কোনও দিন যেন কাঁটাকাঁকর তোমার পায়ে না ফোটে

লীলা। তা হলে চল্লাম শশীদা!

পুনরায় লীলা শশিনাথকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তারপর নতনেত্রে বাহির হইয়া গেল। শশিনাথ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ম চঞ্চল হইয়া উঠিল; একবার মনে হইল যেন সে লীলাকে ডাকিতে গেল; কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। পাথরের মূর্ত্তি মতো নিশ্চল হইয়া সে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাতঃকাল। সোমনাথের ঘর। নেপথ্য হইতে সানাইয়ের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। একজন ভৃত্য একটি ট্রাঙ্ক লইয়া প্রবেশ করিল। পশ্চাতে উর্ম্মিলা।

উর্ম্মিলা। এইখানে রাখ, (ভৃত্য ট্রাঙ্ক রাখিল) ছোটবাবুকে ডেকে দে—এক্ষুনি যেন আসে।

(ভৃত্যের প্রস্থান। উর্ম্মিলা ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড়-চোপড় গুছাইয়া রাখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে শশিনাথের প্রবেশ)

শশী। ডেকেছো কেন বৌদি?

উর্ম্মিলা। ঠাকুরপো! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

শশী। (উদ্বিগ্ন) কি হয়েছে বৌদি?

উর্ম্মিলা। (ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে কয়েকটা বস্ত্র তুলিয়া তাহার ভিতরে শশিনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) এই দেখ!

শশী। (অবাক হইয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল তারপর ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে একজোড়া মখমলের চটি বাহির করিয়া লইল) এতো আমার পুরোনো চটি, এখানে কে আনলে?

উর্ম্মিলা। লীলার ট্রাঙ্কটা গোছোতে গিয়ে তার তলায় দেখলাম এই চটি রয়েছে। (শশিনাথ নীরব) ঠাকুরপো! এতো তোমাকেই আটকাতে হবে ভাই। তুমি ছাড়া কেউ তাকে সামলাতে পারবে না। কাল বাদে পরশু লীলা শ্বশুরঘর করতে যাবে—সেখানে বিয়ের কনের ট্রাঙ্ক থেকে পুরুষ মানুষের ব্যবহার করা জুতো বেরুলে কি কাণ্ড হবে বুঝতেই তো পারছো!

শশী। তোমার কোন ভয় নেই বৌদি! আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি! লীলা এখন আছে কোথায়?

উর্ম্মিলা। শোবার ঘরে। কাল থেকে তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেছে ঠাকুরপো!

শশী। কিছু ভয় কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি একবার লীলাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

(উর্ম্মিলার প্রস্থান)

(শশিনাথ জুতাজোড়াটির প্রতি বারেক সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া ঘরের কোণে আড়ালে রাখিল। তারপর ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে লীলার প্রবেশ)

শশী। লীলা! এসো। তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাই ভাই! ঠিক বলবে তো?

লীলা। কি কথা বল?

শশী। দ্বিতীয় ভাগ পড়েছো তো?

লীলা। (অবাক হইয়া) পড়েছি!

শশী। পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে কি করা হয়? (লীলা নীরব) বল? পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে কি করা হয়?

লীলা। চুরি করা হয়।

শশী। পরের চটি জুতো না বলিয়া লইলে কি করা হয় লীলা? (লীলা নীরব; নিশ্চল) বল না লীলা! পরের চটি জুতো না বলিয়া লইলে কি করা হয়?

লীলা। (মুখ তুলিয়া শশিনাথের মুখের পানে চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে) চটি জুতো ফেরত চাও শশিদা!

শশী। নিশ্চয়ই চাই। ওটা আমার ভারী সখের জিনিষ! বিশেষ যত্ন করে রাখতে হবে। কিন্তু আর পায়ে দেওয়া হবে না।

লীলা। কেন?

শশী। পায়ে দেবার মতো ওটা আর কমদামী বলে মনে হচ্ছে না।

লীলা। আচ্ছা, চটি তোমার আমি এখনই ফেরত দিচ্ছি! কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। আমার মনটাও কি আটকে রাখবে মনে করেছো?

শশী। না তা করিনি। মনটা দেহের সঙ্গেই যাবে।

লীলা। আচ্ছা, তাই যদি, তবে আমার শ্বশুরবাড়ীতে কি করে তোমরা আমায় আটকাবে? এই ধর, কথার কথা বলছি, যদি সকালে উঠে সব কাজের আগে একটা কাগজে প্রত্যহ তোমার নাম একশো আটবার লিখি, তাহলে কি করবে? রোজ সকালে সেখানে গিয়ে সে কাগজ পকেটে পুরে নিয়ে আসবে? না—আমার দোয়াত কলম কাগজ কেড়ে নেবে? কি করবে বল?

(শশিনাথ বিস্ময় বিমূঢ়) বল না শশিদা, সেখানে তুমি কি ব্যবস্থা করবে?

শশী। তা আমি জানিনে। কিন্তু তোমার ওপর এই আদেশ লীলা, তুমি সেখানে এসব ছেলেমানুষী একেবারে করতে পাবে না, বুঝলে?

লীলা। (বিকৃত হাস্যে) না—ঠিক বুঝলাম না। আমার ওপর সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে এখন এতবড় আদেশ করছো কোন অধিকারে?

শশী। আত্মীয়তার অধিকারে!

লীলা। কিন্তু তোমার সঙ্গে এখন আমার আত্মীয়তা কত সামান্য, তা জানো? আমি তোমার বৌদিদির বোন, কিংবা তোমার দাদার শ্যালী, বড় জোর তোমার বন্ধুর—

(লীলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

শশী। আচ্ছা, সম্পর্কের কথা ছেড়েই দিলাম! কিন্তু তোমার নিজের মনে তো ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দর বিচার আছে? একটা আত্ম-সম্ভ্রম, মান-মর্য্যাদার জ্ঞান নেই কি?

লীলা। (বিক্ষুব্ধকণ্ঠে) বোধ হয় নেই। থাকলে কি আজ এমন সাজগোজ করে পরের বাড়ী যেতে পারতাম!

শশী। ছিঃ লীলা! এ-সব তুমি কি বলছো? কোনও নাটকের মধ্যেও এমন সব কথা থাকলে বাড়াবাড়ি বলে মনে হোত!

লীলা। তা আমিও বুঝতে পারছি শশিদা! কিন্তু তুমি যদি আমাকে দিয়ে জোর করে নাটক করিয়ে নাও তো আমি কি করতে পারি! আমি তো চুপ করেই আছি—কথা কইতে চাইনে—কিন্তু তুমি যে বারবার সাঁড়াশী দিয়ে আমার মুখ থেকে কথা টেনে বার করছো!

শশী। (শান্ত কণ্ঠে) তোমার কাছে আজ আমার একটা প্রার্থনা আছে লীলা। যদি তুমি কখনো আমার কাছে কোন সুশিক্ষা পেয়ে থাকো, কোনও দিন যদি আমাকে তোমার একজন শুভানুধ্যায়ী বলে মনে হয়ে থাকে, যদি কোনও সময়ে তোমার উপদেশটা মনে করে আমাকে একটুও শ্রদ্ধা করে থাকো তো আজ তুমি যাবার আগে তার দক্ষিণা আমাকে দিয়ে যাও! এটা যদি আমাকে কোনও অধিকার বলে না দাও তো—ভিক্ষের মতো দাও ভাই!

লীলা। কি বল?

শশী। আমাকে এই আশ্বাসটুকু দিয়ে যাও যে, তুমি নিজেকে আর নিজের অবস্থাকে ঠিক মনে রাখবে! এ তুমি কিছুতেই ভুলবে না যে তুমি একজন ভদ্র হিন্দু ঘরের মেয়ে। বহু বর্ষের পর বর্ষ আর বহু বংশের পর বংশ তার যে সব সংস্কার রক্তের সঙ্গে মিশে তোমার দেহে আশ্রয় নিয়েছে, সেগুলোকে সব রকমে বাঁচিয়ে রাখাই তোমার ধর্ম্ম।

লীলা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) আমি এত হীন নই যে তোমাকে এই আশ্বাস দিয়ে নিজেকে অপমানিত করবো! তুমি আমাকে যা মনে কর, আমি তার অনেক ওপরে! দোহাই তোমার শশিদা, আর বেশী দেবতা-গিরি ফলিও না। এত অহঙ্কার সইবে না।

শশী। আমি দেবতা, সে কথা কে বললে লীলা?

লীলা। তুমি—তুমি বলেছো! তুমি সাধু! তুমি ঋষি! তুমি দেবতা! স্বর্গের দেবতাকেও তুমি এগিয়ে গিয়েছো। একটি অভাগিনীর কথা মনে করে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে দিয়েই তোমার এ-দেবত্ব শেষ হোক্! তুমি মানুষ হও! তোমার দেবত্ব দিয়ে সে-বেচারাকে যেন আর গুঁড়ো করোনা!

শশী। কে সে লীলা?

লীলা। আমি জানিনে! আর আমি পারছিনে—আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও! তোমার মখমলের চটি

জুতো তোমার ঘরে পৌঁছে দিয়ে তবে আমি যাব—তার ওপর আমার একটুও লোভ নেই!

(প্রস্থান। শশিনাথ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইবার ধীরে ধীরে সোফার উপর বসিয়া দুই করতলে মাথা রাখিল। কিছুক্ষণ পরে বরেনের প্রবেশ)

বরেন। শশি!

শশী। (মাথা তুলিয়া সাগ্রহে) এসো—এসো! কাল দেখা পেলাম না কেন? আচ্ছা লোক তো তুমি!

(বরেন তাহার পাশে বসিয়া নীরবে হাসিতে লাগিল)

শশী। তোমার হয়েছে কি বলতো?

বরেন। সহর্ষ বিস্ময়—কিংবা সবিস্ময় হর্ষ!

শশী। কেন শুনি?

বরেন। তোমার বিয়ের খবর শুনে।

শশী। আমার বিয়ে?—কার সঙ্গে?

বরেন। শ্রীমতী সরযুবালার সঙ্গে।

শশী। (এক মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া সহাস্যে) ওঃ! তাই তোমার সহর্ষ-বিস্ময় কিংবা সবিস্ময়-হর্ষ হয়েছে বলছো? আচ্ছা বরেন! কেমন করে এমন একটা মিথ্যে কথা বললে বলতো! আমার বিয়ের খবর শুনে তোমার সবিষাদ-বিদ্বেষ কিংবা সবিদ্বেষ-বিষাদ হয়েছে বল?

বরেন। আমার ভালবাসা কি তুমি এত অগভীর মনে করো?

শশী। না, তা করিনে বলেই তো বলছি। প্রেমটা যত গভীর হয়, ঈর্ষা ঠিক সেই রকম উঁচু হয়। একটা দিয়ে অপরটাকে মাপা যায়। এ মনস্তত্ত্ব মান কি না?

বরেন। (হাসিয়া) আবার প্রেমটা যত বিস্তৃত হয়, আত্মোৎসর্গের শক্তি তত প্রবল হয়। এ মনস্তত্ত্ব মান কি না?

শশী। কিন্তু তোমার প্রেম যে গভীর বলছো?

বরেন। আমার প্রেম সাগরের মতো—যেমন গভীর, তেমনি বিস্তৃত।

শশী। আর আমার প্রেম হচ্ছে বায়ু-রাশির মতো—যেমন উদার তেমনি উদাস! সর্বদা সাগরের জলরাশিকে ছুঁয়ে আছে, কিন্তু কোথাও আটকে নেই!

বরেন। কিন্তু আমার ধর্মতো তা নয় ভাই! তোমার মধ্যে ঝড় উঠলে, আমার মধ্যেও যে বড় বড় তরঙ্গ উঠতে থাকে!

শশী। কিন্তু আমি যখন শান্ত আছি, তুমি তখন প্রশান্ত থাকো! তোমার কোনও ভয় নেই। উত্তাল তরঙ্গ নয়, কিন্তু যথাসময়ে তোমার মাঝে মৃদু তরঙ্গ উঠ্‌বে—আমার ঝড়ে নয়—সরযুর প্রেমের সুমন্দ হিল্লোলে।

বরেন। না শশি, এ তুমি অন্যায় করছো! পরিহাস করতে হয় কর, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এ ভাবে সরযুকে নিয়ে আর পরিহাস করা চলে না।

শশী। কেন শুনি, সরযু তোমার স্ত্রী হবে বলে নাকি?

বরেন। না, সে কারণে নয়। সরযু তোমার স্ত্রী হবে, স্থির হয়ে গিয়েছে বলে!

শশী। স্থির হয়ে গেছে নাকি? বাঃ বাঃ! তা তো জানতাম না। এ যে রাম বাদ দিয়ে রামায়ণ! এমন পাকা খবরটি পেলে কোথায়?

বরেন। (পরিহাস সহকারে) বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হলাম।

শশী। সূত্র তোমার পাকা কি কাঁচা, রেশমের কি পশমের, তা জানবার আমার একটুও আগ্রহ নেই। শুনে তুমি আশ্বস্ত হও যে বিশ্বস্তসূত্র তোমাকে একেবারে বাজে কথা বলেছেন, যার কোন ভিত্তি নেই।

বরেন। (স্নিগ্ধ কণ্ঠে) ভিত্তি এ কথার খুবই দৃঢ় ভাই, এর ইঁট-পাথর হচ্ছে, মৃত্যু-শয্যার প্রতিজ্ঞা, আর চুণ-সুরকী হচ্ছে একটি বালিকা-হৃদয়ের অটুট ভালবাসা। এত দৃঢ় যে, এর ওপর মিলনের রাজপ্রাসাদ অনায়াসে ওঠানো যেতে পারে।

শশী। (কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া) সরযুকে বিয়ে করবো বলে আমি কি মৃত্যুশয্যায় প্রতিজ্ঞা করেছি নাকি?

বরেন। (হাসিয়া) কি প্রতিজ্ঞা করেছো তা তুমিই জানো, আমি তো তা বলতে পারিনে। কিন্তু যদি সে রকম

কোন প্রতিজ্ঞা করেই থাকো, তাতে তো আমি কোনও দোষ দেখতে পাইনে! কি রকম অবস্থায় তোমাকে পড়তে হয়েছিল, তা বৌদির কাছে শুনেছি। তুমি যে ইচ্ছে করে কোন প্রতিজ্ঞা করোনি, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।

শশী। না, তুমি তা বুঝতে পারছো না! যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছিলাম, তা ইচ্ছা করেই করেছিলাম, বাধ্য হয়ে করিনি। কিন্তু কি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম? সরযুকে বিয়ে করব? না, একেবারেই তা নয়। আমি শুধু সরযুর ভার গ্রহণ করলাম তাই জানিয়েছিলাম।

বরেন। তা হোক্। যাঁকে জানিয়েছিলে আর যাঁদের সাক্ষাতে জানিয়েছিলে, তাঁরা সকলেই তোমার কথায় জেনেছিলেন যে, সরযুকে বিয়ে করবার অঙ্গীকারই তুমি করলে। এ ধারণা সরযুর তখনও হয়েছিল, এখনও আছে।

শশী। তাহলে সে ধারণা সরযুর আর থাকবে না, যখন তোমার সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়ে যাবে। দোহাই ভাই, দুদিন সবুর করো, লীলার বিয়ের হাঙ্গামাটা চুকে যাক তারপর তোমার বিয়ের ব্যবস্থায় লাগবো। অত অধীর হোয়ো না। শিগগিরই তুমি সরযু-রত্নের অধিকার পাবে।

বরেন। (মৃদু হাসিয়া) অধীর আমি হচ্ছিনে; কিন্তু অধিকার আমি পাই কেমন করে? তুমি যে আগেই অধিকার পেয়ে বসে আছো!

শশী। তাই যদি হয়ে থাকে, তবুও তুমি পাবে।

বরেন। চুরী করে না ডাকাতি করে?

শশী। তার চেয়ে ঢের সহজে। স্বেচ্ছায়, অন্যের বিনা প্ররোচনায় আমি অধিকারচ্যুত হবো।

বরেন। দানসূত্রে নাকি? দোহাই শশি, আর সব জিনিষ দেওয়া নেওয়া চলে, স্ত্রী চলে না ভাই! তার চেয়ে চুরী ডাকাতি করে নেওয়াও ভালো!

শশী। তোমার অধিকার নেই, একথা কেন বলছ বরেন? তোমার চেয়ে বেশী অধিকার সরযুর ওপর আর কারোর নেই। অন্য কেউ জানুক বা না জানুক, আমি তো জানি, সরযুর ওপর তোমার কতখানি ভালবাসা আছে। সেই ভালবাসাই তোমার চরম অধিকার।

বরেন। আচ্ছা মানলাম, সরযুর ওপর আমার ভালবাসার একটা অধিকার আছে। কিন্তু সরযুরও যদি ঠিক সেই রকম ভালবাসার অধিকার তোমার ওপর থাকে, তাহলে তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও? কার অধিকারকে বড় করবে? সরযুর, না আমার?

শশী। একটা কাল্পনিক অবস্থা নিয়ে মাথা খারাপ করে লাভ কি, যখন এ ক্ষেত্রে অধিকারের কোনও লড়াই নেই। অধিকার একমাত্র তোমারই আছে, আর কারো নেই। তোমার ভালবাসা ব্যর্থ হবার মতো সামান্য নয়।

বরেন। আমার ভালবাসা সরযুকে অসুখী করবার মতো সামান্যও নয়। আমার দ্বারা যদি সরযু অসুখী হয়, তাহলেই বুঝবো, আমার ভালবাসা ব্যর্থ হলো! (একটু চুপ করিয়া থাকিয়া) আর এ কথাও আমি খুব সহজে বলতে পারি শশি, তুমি সরযুর স্বামী হ'লে তোমার ওপর আমার ভালবাসা বাড়বে বৈ কমবে না। (শশিনাথ নির্বাক) চুপ করে রইলে কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছো—অসম্ভব?

শশী। (বিহ্বল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) অসম্ভব—অসম্ভব—বাস্তবিকই অসম্ভব? তোমরা সকলে মিলে যদি এমন করে আমাকে পাগল কোরে তোল, তাহলে তোমাদের সঙ্গে চলা একেবারেই অসম্ভব! (প্রস্থান)

(বরেন কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর প্রস্থান করিবার জন্য উঠিয়াছে এমন সময় সরযুকে লইয়া উর্ম্মিলার প্রবেশ)

উর্ম্মিলা। এই যে বরেন ঠাকুরপো! বেশ যা হোক তুমি! তোমার ওপর আমি নির্ভর করে রয়েছি—আর সমস্ত দিন তুমি ডুব মেরে আছো। বোসো বলছি!

বরেন। (বসিয়া) এই বস্‌লাম। এখন কি তোমার আদেশ বল!

উর্ম্মিলা। কাল তো বিয়ে—কালকের কথা ছেড়ে দাও; পরশুও অনেক কাজ! তাই লীলার ফুলশয্যের তত্ত্বের ছোটোখাটো জিনিষগুলো তুমি এনে ফেলো!

বরেন। এই কথা। দাও ফর্দ—আমি এখনি বেরিয়ে পড়ি

উর্ম্মিলা। রোস! অত ব্যস্ত হবার কাজ নয়—ফর্দ্দটা একবার মিলিয়ে নিতে হবে। কটা জিনিষ হয়েছে সরযূ?

সরযূ। (হাতের ফর্দ্দ দেখিয়া) পঁচিশটা।

উর্ম্মিলা। আরও পঁচিশটা হবে ঠাকুরপো।

বরেন। যত পঁচিশই হোক না কেন; আমি চোখ বুজে এক এক কোরে সমস্তগুলো কিনে যাবো। উপস্থিত আমি একটু ঘুরে আসি. তুমি ততক্ষণ ফর্দ্দ আর টাকা ঠিক করে রাখো বৌদি।

উর্ম্মিলা। না না, এখন আর যেও না ঠাকুরপো—ফর্দ্দটা তুমি লিখে নাও, আমি বলে যাচ্ছি। টাকা আমার কাছেই আছে।

বরেন। (টেবিল হইতে কাগজ পেনসিল লইয়া) আচ্ছা! বল!

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। মা, বাবু এসেছেন! (প্রস্থান)

উর্ম্মিলা। আচ্ছা—আমি যাচ্ছি। ফর্দ্দটা তোমরা দু'জনে মেলাও ঠাকুরপো—আমি এলাম বলে। (প্রস্থান)

বরেন। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) দেখুন, আপনি এইখানটায় এসে আগে বসুন। তারপর, ফর্দ্দ থেকে একটা একটা ক'রে পড়ে যান আর আমি লিখে নি।

(সরযূ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বরেন প্রদত্ত চেয়ারে বসিল)

বরেন। নিন। এইবার বলুন!

সরযূ। উৎকৃষ্ট গোলাপ জল—চার বোতল!

বরেন। (লিখিতে লিখিতে) একেবারে চারবোতল গোলাপ জল? আচ্ছা, বলুন! ফর্দ্দটা প্রথমে লিখে নেওয়া যাক্!

সরযূ। কেস ওয়াশ—এক বোতল!

বরেন। (লিখিতে লিখিতে) আচ্ছা।

সরযূ। ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার—বড় দুশিশি!

বরেন। আচ্ছা!

সরযূ। ভিনোলীয়া ক্রীম—দু কৌটো!

বরেন। আচ্ছা!

সরযূ। হ্যাজেলিন—

বরেন। (বাধা দিয়া) দাঁড়ান, একটা কথা সেরে নিই! দেখুন, ভুল করা মানুষের অন্যায় বটে; কিন্তু ভুল বুঝতে পেরে সেটাকে সংশোধন না করা তার চেয়েও বড়ো অন্যায়! সেদিন আমি না বুঝে নির্ব্বোধের মত আচরণ করে আপনাকে একটু বিব্রত করে তুলেছিলাম—সেজন্যে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। ব্যাপারটা একটা ভুলকে আশ্রয় করে হয়েছিল। ভুলটা কি, তা আপনার জানবার দরকার নেই বলেই বললাম না। যাই হোক্, আপনি সে কথাটা এমন কিছু নয় মনে করে ভুলে যাবেন। বলুন, তারপর কি।

সরযূ। (ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে) হ্যাজেলিন স্নো—দুশিশি!

বরেন। হ্যাজেলিন স্নো—দুশিশি!

সরযূ। এসেন্স—আটরকম।

বরেন (লিখিতে লিখতে) আটরকম।

সরযূ। ফেস্ পাউডার—তিনরকম।

বরেন। তিনরকম। দেখুন! আমার জন্যে আপনি একটুও ভাববেন না। আমি বেশ আছি! ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বভাবটা কি রকম জানেন? সেই যে একরকম পুতুল পাওয়া যায়—সব রকম অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকে, শুইয়ে ছেড়ে দিলেও টপ্ করে উঠে দাঁড়ায়—সেই রকম। সব রকম অবস্থাতেই আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারি! আমার জন্যে আপনি ভাববেন না! অন্য কেউ হলে আমি এ কথা বলতাম না—আপনাকে জানি বলেই বললাম; পরের জন্যে আপনি ভারী ভাবেন! বলুন, তারপর কি?

সরযূ। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) সুবাসিত তরল আলতা—দুশিশি!

বরেন। দুশিশি! কি আশ্চর্য্য! তরল আলতাও দুশিশি চাই? এক শিশি সুধীরের জন্যে নাকি? আচ্ছা—তারপর—

সরযূ। বড় হাত আয়না—দু'খানি!

বরেন। দু'খানি!

সরযূ। চিরুণী, ব্রুশ, কাঁকুই—ড্রসেট্!

বরেন। ড্রসেট্! একটু অপেক্ষা করুন! একটা কথা বলি! শশীকে আমি কি রকম ভালবাসি, তা আপনি ঠিক জানেন না! দরকার হলে তার জন্যে প্রাণ দিতেও আমি কুণ্ঠিত হইনে! সে-ও আমাকে সেই রকমই ভালবাসে। কাজেই বুঝতে পারছেন—তার সঙ্গে আপনার বিয়ের কথা শুনে আমার কত খুসী হওয়া সম্ভব! এ বেশ হয়েছে—ভারী চমৎকার হয়েছে—কিন্তু আপনাকে আমার একটা অনুরোধ আছে—শশী যেন কোনও রকমে আমার সেদিন সন্ধ্যের পাগলামীর কথা টের না পায়! বিয়ে হয়ে গেলে তখন না হয় বলা যেতে পারবে—তখন ভারী একটা হাসির ব্যাপার হবে! বুঝলেন কিনা? আচ্ছা বলুন, আর কি আছে! চিরুণী, ব্রুশ, কাঁকুই—ড্রসেট! তারপর?

(সরযূ নিরুত্তরে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত)

বরেন। (শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে) আপনার চোখে বোধ হয় কিছু পড়েছে। বাইরে গিয়ে একটু জল দিন। আচ্ছা, আমিই না হয় একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তিনদিনপরে। সময়—অপরাহ্ন। গত পরশু লীলার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শশিনাথ শ্রান্ত দেহে নিজের ঘরে একখানি ইজি চেয়ারে শুইয়া ছিল। অত্যন্ত ক্লান্ত এবং অবসন্ন ভাব। কিয়ৎকাল পরে ব্যস্তভাবে সোমনাথ প্রবেশ করিল। তাহার মুখ বিবর্ণ। দুই চোখে আতঙ্কের ছায়া।

সোম। শশিনাথ!

শশী। (মুখ তুলিয়া) দাদা!

সোম। শশি! সর্ব্বনাশ হয়েছে!

শশী। কি হয়েছে দাদা? (উঠিয়া বসিল)

সোম। (চেয়ারে বসিয়া) লীলার অদৃষ্ট যে এত মন্দ তা জানতাম না শশি! তার কপাল একেবারে পুড়েছে!

শশী। তার মানে?

সোম আজ ওদের কুশণ্ডিকা হবার কথা! সে-সব কিছু হয়নি! শেষ পর্য্যন্ত বিয়ে পাকা হোলো না শশি, সুধীর লীলাকে গ্রহণ করবে না বলেছে।

শশী। সুধীর লীলাকে গ্রহণ করবে না বলেছে! কেন এমন বলেছে?

সোম। সুধীর খবর পেয়েছে, লীলার জন্মের ইতিহাস নাকি ভালো নয়!

শশী। সে কি! এ যে অসম্ভব!

সোম। সেই অসম্ভবই হয়তো সম্ভব হয়েছে শশি! সুধীরের খবর মিথ্যে নয়। তার সঙ্গে আজ পথে আমার দেখা হয়েছিল! প্রথমটা তার কথা শুনে আমার বিশ্বাস হয়নি। তারপর তার কথামত দুজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাত করে যা জানতে পারলাম তার ওপর আর বলবার কিছু নেই!

শশী। সমস্ত কথা আমায় খুলে বল দাদা! আমার মথায় যে কিছুই ঢুকছে না।

সোম। সুধীরের কাছ থেকে যা শুনলাম এবং সুধীরের পরিচিত দুজন লোকের মুখ থেকে যে খবর পেলাম, সেই কথাই তাহলে তোমায় বলি?

শশী। হ্যাঁ বল।

সোম। (একটু ইতস্তত করিয়া) উর্ম্মিলা আর লীলা সহোদরা বোন নয়!

শশী। (সাশ্চর্যে) নয়?

সোম। না! আমার শাশুড়ী অল্পবয়সে একটি মেয়ে প্রসব কোরে মারা যান! সেই মেয়েটি হচ্ছে উর্ম্মিলা। স্ত্রীমারা যাবার পরে শ্বশুর মশায় মেয়েটিকে মানুষ করবার উদ্দেশ্যে এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবাকে এনে নিজের বাড়ীতে রাখেন! কিছুদিন পরে সেই বিধবার—

শশী। হ্যাঁ, তারপর—

সোম। শ্বশুর মশায় মরবার সময় উর্ম্মিলাকে আর লীলাকে তাঁর এক বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুর হাতে সঁপে দিয়ে যান! এঁকে লীলার মা দাদা বলে ডাকতেন, সেই জন্যেই তিনি মামার পরিচয়ে দুই বোনকে প্রতিপালন

করেন। এই মামারই এক আত্মীয় সুধীরের জমিদারীতে কাজ করে। তার কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেছে! এই ব্যাপারে সুধীর অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়েছে! আজ সন্ধ্যের পর সে তোমাকে একবার যেতে বলেছে। আসবার সময়ে লীলাকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

শশী। সুধীর কি লীলাকে ত্যাগ করবেই ঠিক করেছে?

সোম। এ-অবস্থায় ত্যাগ না করে আর উপায় কি?

শশী। কেন? লীলার কোন্ অপরাধে সে তাকে ত্যাগ করবে? এ-কথা যখন সে আগে জানতে পারেনি, তখন পরে জানা আর না জানা দুই-ই সমান।

সোম। লীলাকে ত্যাগ না করলে সুধীরকে সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে; অতটা ত্যাগ স্বীকার করতে সে রাজী নয়!

শশী। (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) কিন্তু লীলাকে গ্রহণ না করলে, লীলাকে সমাজ থেকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে—ততটা নির্দয়তা করতে সে রাজী তো?

সোম। তার নির্দয়তা কেন বলছো শশি? ঘটনা সত্যি হলে সমাজের মধ্যে লীলার আর স্থান কোথায়?

শশী। (দীপ্তস্বরে) তাহলে তোমার বাড়ীর মধ্যেও তো তার স্থান নেই? দেখ দাদা, কলকাতা সহরে ইট-চুণ শুরকী রাজমিস্ত্রির অভাব নেই—কালই এ বাড়ীর মাঝখানে পাঁচীল পড়ে যাবে। তোমার অংশে সমাজের গোয়াল বেঁধো—আমার অংশে লীলা বাস করবে!

সোম। (ক্ষুব্ধকণ্ঠে) আমি কি তাই বলছি শশি! এ তোমার অন্যায় রাগ করা!

শশী। আমি রাগারাগি করতে চাইনে দাদা! তোমাদের পচা সমাজতন্ত্রের বিষয়ে বক্তৃতা করা বা বক্তৃতা শোনার সময় এবং ধৈর্য আমার নেই! আর তা ছাড়া, এ বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে বসে জটলা করে পরামর্শ করতেও চাইনে। আমি চল্লাম। আমার মাথায় যা আসে তাই করবো।

সোম। ভাখো শশি! তুমি লীলাকে ভালবাসো তা আমি জানি, কিন্তু আমিও তার শত্রু নই—তার একটা ভালরকম ব্যবস্থা আমরা করবোই! তুমি অধীর হোয়ে অবিবেচনার কোন কাজ যেন করে বসো না। তাতে সকলের চেয়ে লীলারই ক্ষতি বেশী হবে! বিপদের সময় বুদ্ধি স্থির রাখতে না পারাও একটা মস্ত বিপদ!

শশী। সে ভয় নেই দাদা! আর আমার দ্বারা লীলার কোনও ক্ষতি হবে না। এর আগে তোমাদের কথা না শুনে তার যে ক্ষতি করেছি, তার জন্যে যদি তোমার সামনে নাকে-খৎ দিতে বল তো এখুনি দিচ্ছি। কিন্তু আর কোনও ক্ষতি হবে না। লীলা তোমার ভাদ্র-বৌ হবে। আমি তাকে বিয়ে করবো!

সোম। (বিস্ময় এবং উদ্বেগ সহকারে) তুমি!

শশী। হ্যাঁ আমি—ওই যে বৌদি আসছেন। এসব কথা বৌদিকে জানিয়েছো দাদা?

(সোমনাথ সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িল।
উর্ম্মিলার প্রবেশ)

এসো বৌদি! একি! কেঁদে কেঁদে তোমার দুচোখ যে একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে! আচ্ছা বৌদি, এ সংবাদ কি এতই ভীষণ যে এত কেঁদেছো? (উর্ম্মিলা নীরব) এত দুঃখ কিসের বৌদি! নিয়তি কপালে যতটুকু লিখেছে, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না—তুমিও না, আমিও না। লীলাকে আমরা যেমন জোর করে বিদায় করেছিলাম, তেমনি জোরের সঙ্গে সে আবার ফিরে আসছে—বাইরে যাবার সমস্ত সম্ভাবনা এবারে সে কাটিয়ে দিয়েছে! সে ভারী অভিমানী—দেখো বৌদি, কোন রকমে যেন সে মনে কষ্ট না পায়!

(সোমনাথের প্রস্থান)

উর্ম্মিলা। (অশ্রুনিরুদ্ধ কণ্ঠে) আমি আর কি বলবো ভাই, দয়া করে তাকে পায়ে একটু স্থান দিও। সে বড় দুঃখিনী।

শশী। হৃদয়টা কি আমার একদিনও দেখতে পাও নি বৌদি যে, পায়ে স্থান দেবার কথা বলছো? সে কি এত সামান্য, এত অবহেলার সামগ্রী যে দয়া ভিন্ন সে আমার কাছ থেকে আর কিছু পেতে পারে না?

উর্ম্মিলা। তা আমি জানি ঠাকুরপো, তুমি ভিন্ন তার আর কেউ নেই!

শশী। (মৃদু হাসিয়া) ঠিক উল্‌টো বলছো বৌদি। সে ভিন্ন আমার আর কেউ নেই—তাই আমার কাছ থেকে এত দুঃখ পেয়ে আবার আমারি কাছে সে ফিরে আসছে! তোমরা তাকে দয়া করতে হয় কোরো—কিন্তু সে আমাকে দয়া করবে কিনা জানিনে!

উর্ম্মিলা। সে আবার দয়া করবে কি ঠাকুরপো! আর কি তাকে আগেকার তেজে দেখতে পাবে? সে এবার এসে, কাউকে আর মুখ দেখাবে না, একদিকে মুচড়ে ভেঙে পড়ে থাকবে।

শশী। (তীক্ষ্ণ স্বরে) কেন বল তো? কার ভয়ে? তুমি যদি বোন বলে তাকে অস্বীকার করো—তোমার বোন বলে সে যদি এ বাড়ীতে আগের মতো সম্মান আর না পায়—তাতে কিছু এসে যাবে না। এবার সে এ বাড়ীর বৌ হয়ে থাকবে—তোমার জা হয়ে সে এবার সম্মান পাবে।

উর্ম্মিলা। (ভয়ে বিস্ময়ে) সেকি ঠাকুরপো।

শশী। যা বলছি ঠিক তাই। এর মধ্যে আর অন্য কোনও কথা নেই! তোমার ওপর যদি একটুও স্নেহের দাবী করতে পারি, তাহলে আজ আমাকে এই আশীর্বাদ করো বৌদি—যেন সে দয়া করে আমাকে গ্রহণ করে—আমার অপরাধের দণ্ড সে যেন নিজের হাতে না দেয়। আমি তাকে খুব চিনি আর বড় ভয় করি!

উর্ম্মিলা। না, না, ঠাকুরপো, এ ব্যাপার এইখানেই শেষ হোক। একে আর বাড়িয়ে তুলো না। কেউ কারুর কিছু করতে পারে না ভাই—সকলেই নিজের নিজের কপালে ভোগ করে। লীলার কপালে বিধাতা সুখ লেখেন নি তাই সে কষ্ট পাচ্ছে! লীলার জন্যে সরযুকে অসুখী করো না ঠাকুরপো—সে তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না।

শশী। তা আমি জানিনে বৌদি! আমিও লীলাকে ছাড়া আর কিছু জানি নে! সরযু আমার কেউ নয়। সে কষ্ট পায় তো নিজের কপালেই কষ্ট পাবে। লীলাকে সুখী করার জন্যে আমি তত ব্যস্ত হইনি—যত নিজের জন্যে হয়েছি! লীলা ভিন্ন আমার পরিত্রাণ নাই। আমি এখন চল্লাম তাকে আনতে। সে এলে তোমারা যেন কোন রকমে তার মনে কষ্ট দিও না। (প্রস্থান)

(ভিন্ন দিক দিয়া সোমনাথের প্রবেশ)

সোম। উর্ম্মিলা! শশী বুঝি লীলাকে আনতে গেল? আমার ভয় হচ্ছে—কোনও রকম একটা অনর্থ না সে ঘটিয়ে ফেলে! শশী কি বলে জানো? বলে লীলাকে বিয়ে করবে! দেখ দেখি? একি ছেলেমানুষী কথা! এটা কি ভাল বলে তোমার বোধ হয়?

উর্ম্মিলা। না।

সোম! আমারও ঠিক তাই মত। স্রোতের বিরুদ্ধে গেলে যেমন ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে ডুবে যেতেই হবে তেমনি সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করলে অবশেষে সর্বনাশ হবেই। লীলার জন্যে আমরা সকলেই দুঃখিত! কিন্তু সুখের পথে তাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলেই সে সুখী হবে না। তাতে তাকে আরও কষ্ট দেওয়া হবে। (উর্ম্মিলা নীরব) উর্ম্মিলা।

উর্ম্মিলা। বল।

সোম। শশী যদি কারুর কথা শোনে তো একমাত্র তোমারই কথা শুনবে। তুমি তাকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো। এ বিপদ থেকে তুমি তাকে বাঁচাও! বল, আমার একথা তুমি রাখবে? সুধীর যদি নিজের বংশ মর্যাদার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তো আমাদের বংশই বা তার চেয়ে কম কিসে যে আমরা তাকে কলুষিত করবো? বল, তুমি এ বিষয়ে চেষ্টা করবে?

উর্ম্মিলা। (রুদ্ধ নিঃশ্বাসে) করবো!

সোম। বেশ! আর লীলাকেও তুমি একথা বেশ করে বুঝিয়ে দিও! সে বুদ্ধিমতী; কখনই সে নিজের সুখের জন্যে একটা পরিবারকে বিপন্ন করতে চাইবে না, এ আমি জোর করে বলতে পারি! তাছাড়া তার খোরপোষের ব্যবস্থা সে তো আমরা—

উর্ম্মিলা। দেখো, আমি নিজের মন দিয়ে বুঝতে

পারছি, লীলাকে এত বোঝাবার দরকার হবে না। সে কখনই এতটা—

(কান্নার আবেগে তাহার কথা রুদ্ধ হইল)

সোম। কাঁদছো কেন উর্ম্মিলা? আমি কি তোমার মনে কষ্ট দিলাম? তোমার মনে কষ্ট দেবার জন্যে তো আমি কোন কথা বলিনি।

উর্ম্মিলা। (নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া) আমি তোমার সব আদেশ রাখবো—কিন্তু আমার একটা কথা রাখবে? আমার একটা কথার জবাব দেবে?

সোম। কি?

উর্ম্মিলা। আমি যদি লীলার আপন বোন হতাম, তাহলে আমাকে নিয়ে তুমি কি করতে? আমাকে রাখতে না ত্যাগ করতে?

সোম। (সন্ত্রাসে) এ কথা কেন উর্ম্মিলা?

উর্ম্মিলা। (স্বামীর হাত ধরিয়া) তাই জিজ্ঞাসা করছি, সত্যি বল না, কি করতে? ত্যাগ করতে?

সোম। (মূহুর্ত্তকাল ইতস্তত করিয়া) তোমাকে ত্যাগ না করলেও, সমাজ ত্যাগ করতাম, আর অপবিত্র সন্তানের মা হওয়ার সম্ভাবনা থেকে তোমাকে রক্ষা করতাম। সমাজের মধ্যে কখনো ব্যভিচার আনতাম না। সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু সমাজকে নষ্ট করবার অধিকার কারো নেই!

উর্ম্মিলা। (কম্পিত কণ্ঠে) আর বিয়ের ঠিক আগে যদি জানতে পারতে, তাহলে?

সোম। তাহলে কখনই তোমাকে বিয়ে করে তোমার আর আমার দুজনের জীবন বিড়ম্বিত করতাম না।

উর্ম্মিলা। (সভয়ে) সমাজ কি এতই ভয়ের জিনিষ?

সোম। (শান্তভাবে) হাঁ। সমাজ এতই ভালবাসার বস্তু! তার জন্যে সব রকম ত্যাগ স্বীকার করা যায়। কিন্তু তুমি তো পবিত্র উর্ম্মিলা, তুমি—ওকি! তুমি অমন করছো কেন?

উর্ম্মিলা। ও কিছু না, বুকের মধ্যে কেমন ধড়কড় করে উঠল!

(নীচু হইয়া সোমনাথের পায়ের ধুলা লইয়া) আমাকে ক্ষমা করো। তুমি যা বলছো, তাই ঠিক, আর সেই রকমই হবে।

(সোমনাথ আকুল আবেগে উর্ম্মিলাকে নিজের কাছে টানিয়া লইল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

এক সপ্তাহ পরে। মধ্যাহ্ন কাল। নিজের ঘরে একাকিনী লীলা বসিয়া একখানি বই পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল।

এমন সময় পিছন দিক হইতে শশিনাথ প্রবেশ করিল। তাহার সাড়া পাইয়া লীলা বই বন্ধ করিল

শশী। এই যে তুমি এখানে রয়েছো, আর আমি সারা বাড়ীময় তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি!

লীলা। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) কেন আমায় খুঁজছিলে শশিদা!

শশী। বলছি! কিন্তু তুমি উঠে পড়লে কেন? বস!

লীলা। (বসিয়া) তুমি কি এইমাত্র বাড়ী ফিরলে?

শশী। হাঁ, এইমাত্র।

লীলা। তিন চারদিন ধরে কোথায় গিয়েছিলে শশীদা?

শশী। নবদ্বীপ আর ভাটপাড়ায়।

লীলা। যেখানেই যাও—বলে গেলে তো আর বাড়ীর লোক এমন করে দগ্ধ হতো না।

শশী। কে দগ্ধ হয়েছিল লীলা—তুমি?

লীলা। (অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) দিদি তো কেঁদে কেটে সমস্তদিন—

শশী। আর তুমি কি সারাদিন হেসে-খেলে কাটিয়েছিলে? দিদির কথা তো দিদির কাছে শুনে এসেছি—তোমার কথা কি তাই বল না? (লীলা নীরব) তা বলতেও কি তোমার নিষ্ঠায় বাধে লীলা?

লীলা। (স্খলিত কণ্ঠে) নিষ্ঠার কথা বলে আমাকে কি ঠাট্টা করা হয় না শশিদা?

শশী। না, হয় না। হাজার বার বলছি হয় না—

তবু সেই এক কথা? তুমি জানো কোন্ কথা বললে আমি মনে ব্যথা পাই, তাই ইচ্ছে করে আমাকে কষ্ট দেবার জন্যে সেই কথা বার বার বলো। তোমার প্রকৃতির মধ্যে কি ভয়ানক একটা নিষ্ঠুরতা আছে, তা যদি তুমি বুঝতে লীলা! (ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া শান্ত করুণ স্বরে) আমি ভুল করেছি, আমি গুরুতর অপরাধ করেছি, কিন্তু তাই বলে কি এমনি কঠোর ভাবে শাস্তি দেবে? এত দুঃখেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো না?

লীলা। (ভগ্নকণ্ঠে) তুমিও ঠিক জানো শশিদা, এই সব দণ্ড পাপের কথা বল্লে আমি মনে কষ্ট পাই—তাই তুমি এসব কথা বলো। তুমি আমার কাছে অপরাধ করেছো, সেটা যেমন মিথ্যে, আমি তোমাকে শাস্তি দিচ্ছি, সেটাও তেমনি ভুল

শশী। (স্নিগ্ধ ব্যথিত কণ্ঠে) আচ্ছা, পাপ-পুণ্যের বিচার না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কি জন্যে নবদ্বীপ-ভাটপাড়ায় গিয়েছিলাম তা তো জিজ্ঞাসা করলে না?

লীলা। (শান্ত কণ্ঠে) দরকার ছিল তাই গিয়েছিলে!

শশী। (উৎফুল্ল স্বরে) খুব দরকার ছিল লীলা, আর সে দরকারী কাজে সম্পূর্ণ সফল হয়ে এসেছি। (পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া) এই দেখ, ভাটপাড়া আর নবদ্বীপ থেকে পঁচিশখানা ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এসেছি। এগুলো পড়ে দেখো, সমাজের যাঁরা মাথা, মহামহোপাধ্যায়, সার্বভৌম, বিদ্যারত্ন, স্মৃতিভূষণ, বড় বড় সব পণ্ডিত, মুক্তকণ্ঠে তাঁরা বলেছেন—তোমার সে বিয়ে বিয়েই নয়। আবার যথাশাস্ত্র তোমার বিয়ে হবার পক্ষে কোন বাধা নেই। এখন আমার প্রার্থনা মঞ্জুর তো? (লীলা নীরব) তাহলে মঞ্জুর? লক্ষ্মীটি, একবার খুলে বল। আর যদি আরও ভাল করে সন্তুষ্ট হয়ে নিতে চাও, এগুলো তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি, পড়ে দেখো। আমি ঘণ্টাখানেক পরে আসবো!

লীলা। (ব্যবস্থাপত্রগুলি সরাইয়া দিয়া) এর আমি একটাও পড়তে চাইনে। এসব মতের কোন মূল্য নেই —কারণ, আমার জন্মের ইতিহাসটা প্রকাশ করে যদি বলতে, তাহলে এর একটা মতও তুমি পেতে না। তাছাড়া, এসব পয়সা দিয়ে কেনা মতের চেয়ে তোমার মতকে আমি অনেক ওপরে স্থান দিই। তুমি যদি বল আবার আমার বিয়ে করা চলে, তাই যথেষ্ট। কিন্তু—

শশী। আবার 'কিন্তু' কি?

লীলা। একটা কিছু করা যেতে পারে বলেই তো করা যায় না।

শশী। কেন করা যায় না লীলা? তাহলে একজনকে দুঃখের অতল থেকে উদ্ধার করা হয় বলে করা যায় না? এত নির্দয়তা তোমার কেন?

লীলা। নির্দয়তা নয় শশিদা, এ আমার অনেক দুঃখের সঙ্কল্প। মাস দুই তিনের মধ্যে আমি যা ভুগেছি—একে দুঃখ বল, দুর্ভাগ্য বল, যাই বল না কেন—এ আমি নিজের অদৃষ্টে ভুগেছি, এর জন্যে আমি কাউকে দায়ী করিনে—তোমাকে তো নয়ই! তুমি আমাকে চিরদিন যেমন স্নেহ-দয়া করেছো তেমনিই কোরো। তোমার দয়া আমি মাথায় কোরে রাখবো। তার বেশী আমি চাইনে!

শশী। আর আমার প্রেমটা কি কিছুই নয়? তাকে এমনি কোরে পদদলিত করবে?

লীলা। (দুইহাত কপালে ঠেকাইয়া মৃদু আর্তনাদে) যা-তা কথা বলো না শশিদা—শুনলেও পাপ হয়! কিন্তু প্রেম বলে আমাকে যা তুমি দিতে চাচ্ছ, তা প্রেম নয়, ওটা তোমার দয়া আর আত্মোৎসর্গ! আমার ওপর তোমার এত দয়া বলে আমি কি নির্দয় হয়ে—

শশী। (ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) থামো লীলা থামো! আমি জানি মুখে তোমার অনেক কথা জোটে, কিন্তু মনে তোমার একটুও দয়া নেই। তা থাকলে, আজকে আমাকে এমন করে অপমান করতে না! তুমি যে পাষাণ।—তোমার কি হৃদয় আছে? কেমন কোরে বোঝাবো, এ-দয়া নয়, করুণা নয়, ক্ষতিপূরণ নয়, আত্মোৎসর্গ নয়! তুমি বিশ্বাস করবে না, সেইজন্যে তোমাকে বলতে প্রবৃত্তি হয় না—কিন্তু একথা নিতান্ত সত্যি, দয়া বলে যাকে তুমি কলুষিত করছো, আমার সেই প্রেম, সেই গভীর নিবিড় প্রেম প্রথম টের পেলাম সেইদিন যেদিন সুধীরের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল।

তারপর যেদিন তোমার বিয়ে হোল, সেদিন অন্তরের মধ্যে কি ঝড় বয়েছিল তা তুমি কি জানবে—কিন্তু তখন কোনো উপায় ছিল না। তারপর সকলের চেয়ে ভীষণ কথা শুনবে? যখন শুনলাম, সুধীর তোমাকে পরিত্যাগ করেছে তখন অসহ্য রাগের মধ্যেও মনে একটা ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠেছিল! সেই আলো তুমি চিরদিনের জন্যে নিভিয়ে দিতে চাও লীলা?

লীলা। (ক্ষণেক পরে সকাতর মিনতিপূর্ণকণ্ঠে) এ ভাল নয় শশিদা! বাস্তবিকই ভাল নয়! এমন করে প্রলুব্ধ করা ভাল নয়। আমি একজন সামান্য মেয়েমানুষ, কতক্ষণ পারবো বল?

শশী। (হাসিয়া) তুমি সামান্য মেয়েমানুষ? মিথ্যে কথা। তোমার মতো কঠিন মেয়েমানুষ আর দ্বিতীয় নেই। তোমার মায়া নেই, দয়া নেই, ক্ষমা নেই! তুমি আবার সামান্য মেয়েমানুষ কোথায়?

লীলা। (সজল কণ্ঠে) সে কি কম দুঃখে শশিদা, সেকি কম কষ্টে! (মুহূর্ত্ত পরে) পূর্বজন্মের অনেক পুণ্য ছিল তাই কলঙ্ক-কাহিনী প্রকাশ হয়ে গেল, নইলে তো —(কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল)

শশী। নইলে কি হোত লীলা?

লীলা। থাক, তা আর শুনে কাজ নেই। (ক্ষণেক নীরব থাকিয়া) শশিদা!

শশী। কি বল?

লীলা। তুমি সরযূর কথা একবারও ভাব?

শশী। সরযূর কি কথা, লীলা?

লীলা। সরযূকে বিয়ে করবে বলে তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো, আর সরযূ তোমাকে স্বামী মনে ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে এই বাড়িতে বাস করছে—সেই কথা?

(ক্ষণকালের জন্য শশীনাথ বিহ্বল বোধ করিল)

শশী। (মাথা নাড়িয়া সজোরে) সরযূকে বিয়ে করব বলে তো আমি প্রতিজ্ঞা করিনি—আমি শুধু তার ভার নিয়েছিলাম।

লীলা। (বিস্মিত চকিত নেত্রে) কি বলছ শশীদা! তুমি প্রতিজ্ঞা করনি? আমি যে নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

শশী। কিন্তু আমি তো জানি, কি কথা ব্যবহার করেছিলাম। আমি বলেছিলাম—আজ থেকে সরযূর ভার নিলাম। বিয়ে করব, তা বলিনি।

লীলা। কথার মানে কিছুই নয়, তুমি যা বুঝিয়েছিলে তাই সকলে বুঝেছিল।

শশী। তারা ভুল বুঝেছিল। একথা অবিশ্যি তখন কারুর কাছে বলা হয়নি, কিন্তু বরেনের সঙ্গে সরযূর বিয়ে হবে। বরেন সরযূকে স্নেহ করে। বরেনের ভালবাসা ব্যর্থ হবার মতো সামান্য নয়। তার সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধে পাকা কথা হয়ে গেছে। সেসব কথা না জেনে যদি সকলে ভুল বোঝে, সেজন্যে আমি দায়ী নই।

লীলা। আমাকে ক্ষমা করো শশীদা, তার জন্যে তুমিই দায়ী। সরযূ জানে, তোমার সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। সে কম দুর্ভাগিনী নয়, শশীদা, সেও আমার চেয়ে কম কষ্ট পায়নি, তার প্রতি তুমি নির্দয় হয়ো না। আমার জীবনের মধ্যে অনেক গোল দাঁড়িয়েছে, সে আর এ জীবনে শোধরাবে না। সরযূর এখনো সব ঠিক আছে—তার জীবনটা নষ্ট করো না—তার প্রতি দয়া কর।

শশী। আর আমার জীবনটা কি কিছুই নয়? আমি শুধু আছি, যাতে অন্যের জীবন নষ্ট না হয়, সেই-জন্যে? আমি শুধু মালমশলা? রক্ত মাংস নই?

লীলা। (স্নিগ্ধ স্বরে) সেকথা তো এক হিসেবে সত্যি শশীদা। তোমরা কঠিন, তোমরা শক্ত। তোমরা যদি আমাদের রক্ষা না করবে তো আমরা দুর্বল, বাঁচবো কেমন করে?

শশী। (আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে) তোমরা দুর্বল? কে বলে? তোমরা বজ্রের চেয়েও কঠিন, পাষাণের চেয়েও কঠোর। তোমাদের দয়ামায়া নেই। তোমরা নির্মম, নিষ্ঠুর!

(শশীনাথ দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। লীলা ব্যাকুল হইয়া দুই হাত মুখে স্থাপন করিয়া কান্নার বেগ রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল)

তৃতীয় দৃশ্য

[কয়েকদিন পর। রাত্রিকাল। শশীনাথের ঘর। কপালের উপর হাত রাখিয়া শশীনাথ ইজিচেয়ারে শুইয়াছিল। তাহার বুকের উপর একখানা বই খোলা। বোধ হয় বই পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পরে দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ আওয়াজ হইল]

শশী। (উঠিয়া) কে ?

লীলা। (নেপথ্যে) আমি, শশীদা।

(শশীনাথ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল)

লীলা। ভিতরে আসবো।

শশী। এসো।

(লীলা ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল)

লীলা। একটা বিশেষ কথা বলবার জন্যে তোমায় বিরক্ত করলাম।

শশী। কি কথা বল।

লীলা। আজ আমি তোমার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, শশীদা। এই বোধ হয় তোমার কাছে আমার জীবনের শেষ প্রার্থনা।

শশী। (ম্লান হাসিয়া) তাই যদি হয় তাহলে এ প্রার্থনা আজ না করে আমার অন্তিম দিনের জন্য রেখো, প্রাণটা এখনো কিছুদিন তো দেহে থাকতে পারে।

লীলা। (দুঃখিত কণ্ঠে) এসব কথা বললে মেয়েরা মনে কষ্ট পায় বলেই কি তোমরা এসব কথা বল! তা যাই বল না কেন, আজ আমাকে ফাঁকি দিলে চলবে না, আজ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে।

শশী। কি তোমার প্রার্থনা, শুনি ?

লীলা। (ক্ষণেক থামিয়া) প্রথমত আমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে হবে, দ্বিতীয়ত কাল সকালবেলা আমাকে বিদায় দিতে হবে!

শশী। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) ক্ষমা করার কথাটা পরে হবে। বিদায় দেওয়ার কথাটা কি শুনি। একেবারে ইহজীবনের মত নাকি ?

লীলা। (নত নেত্রে) বলা যায় না—তাও হতে পারে।

শশী। কথাটা আরও স্পষ্ট করে না বললে বুঝতে পারছি নে।

(লীলা আঁচলের তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া শশিনাথের হাতে দিল)

লীলা। এই চিঠিখানা পড়লেই বুঝতে পারবে।

(অধীর আগ্রহে শশিনাথ পত্রখানা পড়িল)

শশী। (পত্রখানি মুড়িয়া) এ নিকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় কে ? বরেনের ভগ্নিপতি ?

লীলা। হ্যাঁ।

শশী। গোপনে গোপনে রেঙ্গুনে চাকরি ঠিক করেছ। আমি এখন আর তাহলে আমাদের লীলার সঙ্গে কথা কচ্ছি নে, আমি কথা কচ্ছি, রেঙ্গুন বেঙ্গলি গার্লস্‌ স্কুলের হেডমিস্‌ট্রেসের সঙ্গে—মাসে তিনশো টাকা মাইনে—স্বাধীন, স্বতন্ত্র, আমাদের সব রকম শাসন বাঁধনের বাইরে। বাঃ।

(একবার লীলার অতি নিকটে গিয়া শশীনাথ তাহাকে দেখিল, তারপর সরিয়া আসিল)

লীলা। (শশীনাথের কাছে গিয়া) তা হচ্ছে না, শশীদা, বাজে কথা বলে ফাঁকি দিলে চলবে না, আজ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করতেই হবে।

শশী। চমৎকার, লীলা, চমৎকার। এ অতি সুন্দর ব্যবহার। মূর্তিমতী কৃতজ্ঞতা তুমি। সেদিন চক্রবৃদ্ধিহারে ধার শোধ করার কথা তুলেছিলে, তার আর কিছু বাকী রাখলে না—একেবারে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিলে। চমৎকার।

লীলা। সেদিন আমার ঘাড়ে শয়তান চেপেছিল, তাই ওকথা বলেছিলাম। তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করবার নয়, শশীদা।

শশী। (তীব্র কটাক্ষে) তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তাই একেবারে দেউলের মত মহাজনের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে চাচ্ছ!

লীলা। (দুঃখের হাসি হাসিয়া) কি করব! মহাজন যে সর্বদা দেহ গ্রেপ্তারের ভয় দেখায়!

শশী। (বিদ্রূপসহকারে) তাই নাকি দেহটা নতুন মহাজনের হাতে সমর্পণ করছ? জাহাজে তিনিও তোমার সঙ্গে থাকবেন তো?

লীলা। (সবিস্ময়ে) কে?

শশী। তোমার গুপ্তমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক বরেন?

লীলা। না, না, শশীদা, বরেনবাবু আমার গুপ্তমন্ত্রী নন, বিশ্বাসঘাতকও নন, তিনি কেন আমার সঙ্গে জাহাজে থাকবেন? কালই আমি যাচ্ছি, এখবরও বোধহয় তিনি জানেন না। বরেনবাবু আমার একান্ত অনুরোধে তোমায় কোন কথা জানান নি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমিই সব ব্যবস্থা করেছিলাম। বরেনবাবুর মুখে শুনেছিলাম, নিকুঞ্জবাবুই নিয়োগকর্তা, তাই বরেন বাবু আমায় এই পরিচয়পত্রটি দিয়েছেন, তার বেশী কিছু নয়।

শশী। (তীব্রকণ্ঠে) বরেন তোমার কি জানে! পরিচয়পত্র আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিলে না কেন? আমি লিখে দিতাম, একজন হৃদয়হীনা পাষাণীকে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি, দয়ামমতার সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক নেই, ইনি আপনাদের মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী হলে মেয়েরা বেশ লায়েক হয়ে উঠবে।

লীলা। (করুণ কণ্ঠে) না, না, শশীদা, এতে ভালই হবে, এতে তুমি বাধা দিও না। বাস্তবিকই আমি পাষাণী কিন্তু তুমি নির্দয় হয়ে পাষাণের মধ্যে লোভ জাগিয়ে তুলো না।

শশী। (হাসিয়া) নির্দয় হয়ে? কিন্তু তোমার দয়া সেদিন কোথায় ছিল লীলা, যেদিন চটিজুতো চুরি করে আমার মনে লোভের আগুন জেলে দিয়েছিলে? শ্বশুরবাড়ীতে রোজ সকালে আমার একশো আট নাম লিখবে বলে যেদিন আমার মনকে মাতাল করে তুলেছিলে, সেদিন তোমার দয়া কোথায় ছিল?

লীলা। আমার সে দুর্বুদ্ধিকে ক্ষমা কর শশীদা।

শশী। ক্ষমা? কিছুতেই নয়। তার আমি দস্তুর মতো প্রতিশোধ দিতে চাই। কি ক'রে—তা দেখ।

(শশীনাথ ঘরের কোণে রাখা আলমারির কাছে গিয়া আলমারি খুলিয়া একখানি বড় আকারের ফ্রেমে-বাঁধা ছবি বাহির করিয়া আনিল এবং ছবিখানিকে টেবিল-ল্যাম্পের আলোর পাশে ছোট টেবিলের উপর রাখিল। ছবির উপর আলো পড়িল। দেখা গেল, কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে পাশাপাশি দুইখানি ফটোগ্রাফ, একটি শশিনাথের অপরটি লীলার। ফ্রেমটির গায়ে কর্পূরের মালা জড়ানো। ছবি দেখিয়া লীলা শিহরিয়া উঠিল। শশীনাথ লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে ছবির কাছে লইয়া গেল)

শশী। এই দেখ তোমার জুতো চুরির প্রতিশোধ। দেখ, বাস্তব জীবনে যে দুটি প্রাণী উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পড়ে কাছাকাছি থেকেও পাশাপাশি হতে পারছে না, ছবির জীবনে তারা কেমন পরম নিশ্চিন্তভাবে পাশাপাশি রয়েছে, কোন উদ্বেগ নেই, কোন উৎকণ্ঠা নেই। কেমন লাগছে লীলা? ভারী বিশ্রী কি?

লীলা। (ব্যাকুল ভাবে) দাও, শশিদা দাও, তোমাকে মিনতি করে বলছি, এ ফটোগ্রাফ আমায় ফিরিয়ে দাও। আমি তো তোমার চটিজুতো ফিরিয়ে দিয়েছিলাম।

শশী। অসম্ভব। তাহলে একশো আট নামের প্রতিশোধ দেব কেমন করে?

লীলা। (শিহরিয়া) ছি ছি ছি! একজন সামান্য মেয়েমানুষের জন্যে তুমি নিজেকে অত নীচু করো না শশিদা।

শশী। একজন সামান্য পুরুষের জন্যে তুমি কতো নীচু হয়েছিলে, তা তো আমার মনে আছে লীলা। স্বামীর বাড়িতেও তুমি তার একশো আট নাম লেখবার কথা তুলেছিলে। তুমি রেঙ্গুন চলে গেলে সে ও রোজ রাত্রে একশো আটবারেই তার প্রতিশোধ নেবে। কি করে, তা নিজের চোখে একবার দেখে যাও!

(শশীনাথ সন্তর্পণে ফ্রেম হইতে লীলার ফটোখানা বাহির করিয়া বুকের উপর রাখিল)

লীলা। (আর্তকণ্ঠে) না, না, না।

(ছুটিয়া শশিনাথের কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিল)

শশী। হ্যাঁ, এমনি করে। এই রকম করে প্রতিশোধ নেব।

(অধীর উন্মত্ত আবেগে শশিনাথ ছবির উপর চুম্বন করিতে লাগিল। সে দৃশ্য লীলা বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। তাহার দুই চক্ষু স্তিমিত হইয়া আসিল এবং শশিনাথের দেহের উপরেই তাহার বিবশ দেহ ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়িল)

॥ যবনিকা ॥

ভাগ্যের লেখা

ডক্টর হরেন্দ্রনাথ রায়

তারাশঙ্করের হাত দেখিয়া একদা কোন এক জ্যোতিষী-প্রবর বলিয়াছিলেন যে তারাশঙ্করের ভাগ্যে লেখা আছে বিধবা রমণীর প্রেম। জ্যোতিষ শাস্ত্র মন্থন করিয়া জ্যোতিষী-প্রবর হয়ত আরও অনেক গুপ্ত তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সব কথা তারাশঙ্করের মনে ছিল কি না জানি না, কিন্তু মনে ছিল তাহার এই বিধবা রমণীর প্রেমের কথা। সুতরাং ফল ফলিল এই যে বিধবা রমণী মাত্রই হইয়া দাঁড়াইল তাহার ভীতির কারণ। সংক্রামক রোগ ভীত মানুষ যেমন রোগ এবং রোগিণীর সান্নিধ্য এড়াইয়া দূরে দূরে সরিয়া থাকে তারাশঙ্করও তেমনি সরিয়া রহিল, বিধবা রমণীদের সংস্পর্শ হইতে।

অথচ তারাশঙ্করের বাল্যের এবং প্রারম্ভ যৌবনের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায়, দেখা যায় যে বিধবাদের প্রতি রাগানুরাগের কোন অস্তিত্বই সেখানে নাই! কিন্তু প্রারম্ভে যাহা ছিল না, তাহা আত্মপ্রকাশ করিল মাঝপথে। এবং তাহারই আবর্তে পড়িয়া তারাশঙ্করের জীবনে এক জটীল সমস্যার উদ্ভব হইল। জীবনে এমন মুহূর্তও আসে যেখান হইতে তাহার ধারাটাই ভিন্ন খাতে বহিতে সুরু করে। তারাশঙ্করের জীবনে সেই মুহূর্তের উদয় হইল। জ্যোতিষী-প্রবরের বাণী মনের আসল তন্ত্রীর উপর ঠিক সময়ে ঘা মারিয়া প্রতিক্রিয়া সুরু করিয়া দিল। তখন হইতেই বিধবা রমণীর সান্নিধ্যে তারাশঙ্করের মন শঙ্কা ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

তারাশঙ্কর কৃতি পুরুষ। অল্প বয়সেই গভর্ণমেণ্টের বড় চাকরীতে সে বহাল। কিন্তু উন্নতির সকল লক্ষণ তাহার মধ্যে জাজ্বল্যমান থাকিলেও এক বিষয়ে সে ভাগ্যহীন। গৃহীর গৃহিণী না থাকিলে তাহাকে যদি লক্ষ্মীছাড়া বলা চলে, তাহলে তারাশঙ্কর লক্ষ্মীছাড়া। সে বিপত্নীক। বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে, স্ত্রী ছিল সুন্দরী, কিন্তু ভাগ্যে টিকিল না বেশীদিন। উপলক্ষ্য এমন কিছু নয়, সামান্য একটু জ্বর, তাহাই হইল কাল। শ্বশুর শাশুড়ী তারাশঙ্করকে ভাল বাসিতেন ছেলের মত, এ বিপর্যায়ে সে ভালবাসায় শৈথিল্য দেখা দিল না। বরঞ্চ মেয়ে নাই বলিয়া পাছে জামাই পর হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় শ্বশুর বাড়ী হইতে তারাশঙ্করের নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল ঘন ঘন। স্ত্রী থাকিলে যদি বা আপত্তি কিছুটা থাকিত এখন সে কারণ নাই। সুতরাং বিনা সঙ্কোচেই তারাশঙ্কর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিল। শ্বশুর বাড়ীর প্রধান আকর্ষণ ছিল তাহার বড় শ্যালীকা মাধুরী। মেয়েটি ভাল। লীলা চঞ্চল, বুদ্ধিমতী মেয়ে। রঙ্গ-রসিকতায়, হাসি-গল্পে মজাইয়া রাখিত তারাশঙ্করকে। মুখ টিপিয়া বলিত, তোমার নামটি ভাই বড়, একটু ছোট করে নিতে চাই। তারাশঙ্কর উত্তর দিত, বেশ ত, আপনাদেরই ত জিনিষ, যেমন ক'রে নিলে পছন্দ হয় করে নিন।

—তাই নেব। আর বড্ড সেকেলে নাম।

—কমিয়ে টমিয়ে চকচকে করে একেলে করে নিন।

—সেই কথাই ভাবছি। সিঁদুর আলতা ছুঁইয়ে একেবারে ভোল পাল্টে দেব, চিনতে পারবে না কেউ।

তারাশঙ্কর সহাস্যে বলিত, আর কারো চেনবার প্রয়োজন নেই দিদি, আপনি চিনতে পারলেই হ'ল।

মাধুরীও হটিবার মেয়ে নয়। বলিল, আমার জিনিষ, আমি না চিনলে, চিনবে কে? তবে ভয়ও হয় মাঝে মাঝে।

—হারিয়ে যাবার?

—উঁহু, কপালে চিহ্ন দিয়ে রাখব। ভয় ভেঙে যাবার।

তারাশঙ্কর বলিত, আমি কি এতই ঠুনকো দিদি?

—বেজায়। একেবারে কাচের বাসন। চীনে মাটির হ'লে ভয় ছিল না এত।

—তা হলে সাবধানে তুলে রেখে দিন। ভাঙবার ভয় থাকবে না কিছু।

—তা ত হয় না। তুলেই যদি রাখব, তবে বাঁচব কি নিয়ে। নেড়ে চেড়েই ত আনন্দ। কাজ নেই আমার অভয়ে। এর চেয়ে ভয় ঢের ভাল।

এমনই মধুর সম্বন্ধ দুজনার। কিন্তু এ সম্বন্ধেও ছেদ পড়িল। একদিন, যে দিন অদৃষ্টের ফেরে মাধুরী সিঁদুর এবং হাতের লোহা খোয়াইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

সে দিন হইতে তারাশঙ্করেরও শ্বশুর বাড়ী যাওয়া বন্ধ হইল। জ্যোতিষীর বাণী স্মরণ করিয়া মাধুরীর সহিত দেখা করিবার মত মনের বল সে পাইল না। শ্বশুর শাশুড়ী, ছুটিয়া আসিলেন। চিঠির পর চিঠি লিখিল মাধুরী। কিন্তু তারাশঙ্কর অটল। নানা অজুহাতে সে সমস্ত অনুরোধ উপরোধ এড়াইয়া গেল। সুতরাং হাল ছাড়িলেন শ্বশুর শাশুড়ী, আর হাল ছাড়িল মাধুরী।

পুত্রের পুনরায় বিবাহের জন্য পিতা মাতা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছেলের বয়স অল্প। এত অল্প যে বিবাহিতের সংজ্ঞা অপেক্ষা অবিবাহিতের সংজ্ঞায় তাহাকে মানায় বেশী। সুতরাং পাত্রীর অভাব হইল না। দেশের যত সৎ পাত্রীর পিতা একে একে সকলেই দ্বারস্থ হইতে লাগিলেন। তারাশঙ্করের দিক দিয়াও বিবাহ বীতরাগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। মৃত স্ত্রীর ক্ষণিক স্মৃতিকে মনের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়া প্রেমের রাজ্যে তাজমহলের মত কিছু একটা অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া যাইবে এ বাসনা তাহার কোন দিনই ছিল না, আজও নাই। অতএব বিহাহের কথাবার্তা একপ্রকার স্থির হইয়া গেল। অনূঢ়া, অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি এবং রায়বাহাদুরের কন্যা। লেখা পড়ায়, নাচে গানে, আধুনিকতায় অতুলনীয়া। পাত্রী তারাশঙ্করের মনোমত। সুতরাং উপলক্ষের বিশেষ কিছু বাকী রহিল না। কেবল দু হাত এক হইতে বিলম্ব যা। এমন সময় গোল বাধিল। রায়বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিধবা এবং পিতামাতার কাছে থাকিয়াই লালিত পালিত হইতেছে। কথাটা যে কোন কারণেই হ'ক, এতদিন তারাশঙ্করের কানে যায় নাই। কিন্তু যে মুহূর্তে শুনিল, সেই মুহূর্তেই মায়ের কাছে গিয়া জিদ ধরিল, ওখানে আমি বিয়ে করব না মা।

—কেন রে? মা শঙ্কিত মুখে তাকান পুত্রের দিকে।

—না মা বিয়ে এখন থাক। আমার ইচ্ছে নেই।

—সে কি? ইচ্ছে নেই বললেই ত হয় না বাবা সব যে ঠিক। দিনক্ষণ, এমন কি লগ্নটি পর্যন্ত।

—তা হ'ক মা। এ বিয়ে বন্ধ করে দাও।

—করতে হয় তুই কর। আমার দ্বারা হবে না। মা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু তারাশঙ্কর গোঁ বজায় রাখিল। রায়বাহাদুরের বাড়ীতে সে বিবাহ করিল না।

কথা রাখিতে পারিলেন না বলিয়া পিতা লজ্জিত হইলেন, মা মুখ অন্ধকার করিয়া বসিলেন।

রায়বাহাদুরের কন্যা, পাওনার দিক দিয়া ত বটেই, মানের দিক দিয়াও অনেকখানি সম্মানিত হইতেন তাঁহারা। পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় পণ্ড হইল সব।

দিন যেমন কাটা উচিত তেমনই কাটিতেছিল। এমনি সময় অকস্মাৎ আর এক দুর্বিপাক দেখা দিল। বার এবং তিথির যোগাযোগে গ্রহরাজের কক্ষে কয়েকটি প্রধান প্রধান গ্রহের আবির্ভাবে পার্থিব জগতে বেশ একটা সোরগোল পড়িয়া গেল। কলিযুগে মর্তলোকে ইতিপূর্বে এতবড় যোগ নাকি আর সংঘটিত হয় নাই। বিগত যুগে অর্থাৎ দ্বাপরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন আরোহণের অনতিপূর্বে ইহারা একবার এই ভাবে মিলিত হইয়াছিল বটে কিন্তু তারপর কত শত শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছে, এইসব মহারথীদের একত্রে মর্তবাসীদের দর্শন দানে সময় এবং সুবিধা কোনটাই হয় নাই। সুতরাং এখন যদি হইয়াছে, মর্ত-বাসীরাই বা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করিবে কেন? অতএব পবিত্র গঙ্গোদকে পার্থিব পাপের ভার লাঘব করিবার একটা প্রতিযোগিতা পুণ্যার্থীদের মধ্যে বেশ সতেজে চলিতে লাগিল। সেই সঙ্গে আত্মীয়দের বাড়ীতে চড়াও হইয়া তাহাদের স্কন্ধে চাপিয়া গঙ্গানীড়ে পাপ বিসর্জন দিবার বাসনা দূর প্রবাসীদিগকেও সক্রিয় করিয়া তুলিল। যাহাদের আশ্রয় ছিল, তাহারা পাপ বিনাশন ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হইল। যাহাদের ছিল না তাহারা অপরের সহিত মিতালী গজাইবার ফিকির খুঁজিতে লাগিল। তারাশঙ্করের মাসিমাকে ফিকির খুঁজিতে হইল না, তিনি শুধু ভগ্নীকে নিজের সাধু সংকল্প জানাইয়া ক্ষান্ত হইলেন। সেই সঙ্গে আর একটু জানাইলেন, যে পুণ্যার্থীনীদের সংখ্যা নগণ্য না হইলেও, কুটুম বাড়ীতে অযথা ভিড় বাড়াইবার পক্ষপাতী তিনি নন। তবে একান্তই যাহারা অপরিহার্য তাহাদের সমভিব্যহারে নির্দিষ্ট দিনের পূর্বাহ্নেই তিনি ভগ্নীর বাড়ীতে শুভ পদার্পণ করিবেন। এ বিষয়ে তাহারা যেন নিশ্চিন্ত থাকেন।

চিঠিখানা পড়িল তারাশঙ্করের হাতে। সে হিসাব করিয়া দেখিল অতিথিদের সংখ্যা কম করিয়াও জন দশেক হইবে। সকলেই যে তাহার পরিচিত তাহা নয়, তবে যে বেশী পরিচিত সে শীলা—মাসীমার ননদের বড় মেয়ে। শীলা বিধবা। তারাশঙ্করের মনে পড়ে, শীলা যখন কুমারী এবং নিজেও সে যখন অবিবাহিত তখন দুজনকে কেন্দ্র করিয়া মাসীমার দয়ায় একটা অস্ফুট গুঞ্জরণ এ বাড়ীতে ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু কি একটা কারণে তাহা মিলাইয়া গেল। তারপর বিবাহিত শীলার আগমন তাহাদের বাড়ীতে একাধিকবার ঘটিয়াছে; তাহারা সরলভাবে মেলামেশা, আলাপ-আলোচনা করিয়াছে, কোথাও ব্যতিক্রম দেখা দেয় নাই; ব্যতিক্রম দেখা দিল শুধু আজ। কুমারী বা সধবা শীলা তাহার ভীতিস্থল ছিল না, কিন্তু বিধবা শীলা তাহার হৃদ্‌কম্পের সৃষ্টি করিল। মাসীমাকে নিবৃত্ত করা যায় না, সেটা শোভনীয় নয়। শোভনীয় হয় শুধু কোন অছিলায় নিজেকে আড়ালে রাখা। এ ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি হইল না। তারাশঙ্করের বন্ধু ঝাড়গ্রামের মুন্সেফ। তাহার ছেলের অন্নপ্রাসন। ঝাড়গ্রাম হইতে 'তার' আসিল তাহার নামে। তারাশঙ্কর কয়েকদিনের ছুটি লইয়া রওনা হইল ঝাড়গ্রামের দিকে। ঠিক যে সময় শীলাদের গাড়ী আসিয়া থামিল তারাশঙ্করদের বাড়ীর দরজায়, সেই সময়ে তাহার ট্রেন ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে রওনা হইয়া গেল ঝাড়গ্রামের উদ্দেশ্যে। তারাশঙ্কর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু এত করিয়াও গ্রহ কাটিল না। এক দিন সকাল হইতেই রায়বাহাদুর অকস্মাৎ বিশেষরূপে সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কন্যা অনিতার খুঁত যে কোনখানে, এবং খুঁত না থাকিলে কেন যে তারাশঙ্কর এ বিবাহে অরাজি; এ সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং আসিয়া গবেষণা জুড়িয়া দিলেন তারাশঙ্করের পিতার সঙ্গে। পিতার ভাবগতি বুঝিয়া তারাশঙ্কর প্রমাদ গণিল। কয়েকদিন পর একদিন অপিস হইতে ফিরিয়া

সে ঘোষণা করিল, জরুরী কাজে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে বদলী করিয়াছেন পূর্ববঙ্গের কোন এক জিলায়। অপ্রত্যাশিত সংবাদ। বাপ মায়ের মনে কতখানি বাজিল তা অন্তর্য্যামীই জানেন, কিন্তু রায়বাহাদুর মুষড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার সব আশা নিরাশায় পরিণত হইল। বাপ মায়ের মুখ দিয়া একটা ক্ষীণ প্রতিবাদ নির্গত হইল বটে, কিন্তু চাকরী! এখানে বাদ প্রতিবাদ শোভনীয় নয় বলিয়া সকলে চুপ করিয়া গেলেন। তারাশঙ্করও নির্দিষ্ট দিনে বাপ মায়ের আশীর্বাদ এবং পদধূলি একসঙ্গে মাথায় লইয়া দুর্গানাম জপিতে জপিতে কর্মস্থলে রওনা হইয়া গেল।

তারাশঙ্করের অদৃষ্ট ভাল, তাই বিদেশে বাড়ীখানা জুটিল ভাল। ছোটখাট বাংলো ফ্যাসানের বাড়ী। এতদিন তালা বন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, আজ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া নবশ্রী ধারণ করিল। তারাশঙ্করের চাকর অবিনাশ ঘরদোর পরিষ্কার করিয়া বেডিং খুলিয়া মনিবের জন্য বিছানা পাতিয়া দিল। তারপর মুখ ধুইবার জল এবং তোয়ালে গুছাইয়া রাখিয়া রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তারাশঙ্কর সত্য সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু বিপর্যয় কাণ্ড বাধিল বিকালের দিকে। অবিনাশ গিয়াছিল বাজারে। ফিরিল অনেক বিলম্বে মাথায় ব্যাণ্ডেজ লইয়া। ভয়ে তারাশঙ্করের মুখ শুকাইয়া উঠিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যেটুকু সে জানিল তাহার মর্ম দাঁড়াইল এই, কোন এক জিনিষের মূল্যকে কেন্দ্র করিয়া এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত। দোকানী নিম্নশ্রেণীর এবং অসৎ প্রকৃতির লোক। ভদ্রলোকের সহিত ভদ্র ব্যবহারে অনভ্যস্ত। অর্দ্ধমূল্যের জিনিষকে সে বেচিতে চায় চারগুণ দামে। অবিনাশ নিরীহ লোক, কিন্তু কলিকাতার লোক। সুতরাং কোন জিনিষের কি মূল্য সব তাহার নখদর্পণে। তাই দাম লইয়া সুরু হইল বচসার। এবং তারই শেষ পরিণতি হইল হাতাহাতিতে। আগে ভাগে মহড়া লইয়াছিল বলিয়াই সর্বরক্ষে, সে একাই তিনজনকে ঘায়েল করিতে পারিয়াছে। তবে শত্রুরা সংখ্যায় একাধিক বলিয়া শেষ পর্যন্ত সে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইল। পিছন হইতে লৌহদণ্ডের আঘাতে সে ঘায়েল হইয়া পড়িল।

কাহিনী শুনিয়া তারাশঙ্করের শঙ্কা কমিল না। অবিনাশের শূন্য হাতে আস্ফালন যতই রোমাঞ্চকর হ'ক না কেন কথাটা বড় ভাল নয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ হাঙ্গামায় না পড়িতে হয়। তারাশঙ্কর থানায় একটা ডায়েরী করে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করিল। কিন্তু থানায় যাইয়া যাহা শুনিল তাহাতে তাহার আত্মা খাঁচা ছাড়া হইবার উপক্রম করিল। প্রতিপক্ষেরা এতক্ষণ নিশ্চুপ থাকে নাই। মেলা সাক্ষীসাবুদ সহ তাহারা ইতিমধ্যেই বেশ ফলাও করিয়া অবিনাশের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ নালিশ ঠুকিয়া গিয়াছে। দোকানের মধ্যে চড়াও হইয়া অনধিকার প্রবেশ, রাহাজানি, মারামারি এমন কি ছুরি ছোরা চালান পর্যন্ত কোনটাই বাদ রাখে নাই! নালিশের মধ্যে কোথাও গলদ নাই। সবদিক দিয়া আঁট ঘাট বাঁধিয়া পাকা বন্দোবস্তর সহিত একাজ করা হইয়াছে। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া তারাশঙ্কর প্রমাদ গণিল। একজন পাকা উকিলের পরামর্শের জন্য সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। উকীলেরও সন্ধান মিলিল। উকীল লোক ভাল। মামলার বিবরণ শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, দুশ্চিন্তার কথাই ত তারাশঙ্করবাবু। প্রথম দিনের সম্বর্দ্ধনা যদি এরকম হয়, বাকী দিনগুলি ত সবই রয়ে গেছে। সেগুলির সম্বর্দ্ধনা কেমন হবে তা ভাববার কথাই বটে। তবে জায়গাটা যত মন্দ ভাবছেন, ততটা নয়। এ একটা ব্যতিক্রম মাত্র। তত্রাচ তারাশঙ্করের দুর্ভাবনা কাটিল না। বলিল, হতেও পারে। তবে আরও কয়েকদিন আপনাকে বিরক্ত করে যাব সুবোধবাবু। ঘটনার গতি কোনদিকে যায়, সেটাও আপনার জানা প্রয়োজন।

সুবোধবাবু তেমনি হাসিমুখেই বলিলেন, বিলক্ষণ, মাঝে মাঝে কেন, রোজই আসবেন আপনি, খুশি হব। বল্‌ছেন ত একা আছেন। সন্ধ্যেটা না হয় এখানে এসেই কাটিয়ে যাবেন। গান বাজনার সখ একটু আছে। তারই আসর বসে সাঁঝে। এই নিয়েই আছি। নির্বান্ধব পুরী অপেক্ষা এটা আপনার পক্ষে মন্দ হবে না।

এ আমন্ত্রণ অনুপেক্ষণীয়। তারাশঙ্কর উপেক্ষা করে না। তৎক্ষণাৎ সম্মতিসূচক ভঙ্গীতে জানায়, আসব বৈকি! নিশ্চয়ই আসব। আপনি যখন বলছেন, না বলব না। সময় পেলেই এসে বিরক্ত করে যাব।

—তাই যাবেন। আমি আরও খুশী হ'ব। আর মামলার ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এসব কেশের পরমায়ু ঐ ডায়েরী পর্যন্ত। তার বেশী নয়।

সেদিনের পর হইতে সুবোধবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ হইতে তারাশঙ্করের বেশী সময় লাগিল না। সুবোধবাবু মিশুকে লোক আর তারাশঙ্কর একা তায় বড় চাকুরে, সুতরাং খাতির আছে। সুবোধবাবু গান বাজনার চর্চা করেন বটে কিন্তু যশ নাই! তারাশঙ্করের চর্চা নাই কিন্তু যশ আছে। গলার সুর আছে আর তান লয়ে মাথা আছে। এদিক দিয়াও মিলিল ভাল। প্রবাসে নিঃসঙ্গ জীবন, সঙ্গ পাইলেই অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। এ দুজনের মধ্যেও অন্তরঙ্গতা জমিয়া উঠিল। বাড়ীতে তারাশঙ্কর যেটুকু থাকে, অবিনাশকে লইয়াই থাকে। বাড়ার বাহিরে সুবোধবাবুর পরামর্শের প্রয়োজন হয়। এইভাবে বিদেশে তারাশঙ্করের দিনগুলি ভালয় মন্দয় একরকম কাটিতে লাগিল।

সেদিন কি একটা উৎসব উপলক্ষে ছুটি ছিল। সকাল থেকে সুবোধবাবুর বাড়ী যাই যাই করিয়াও তারাশঙ্করের যাওয়া হয় নাই। বৈকালের দিকে সেই উদ্দেশ্যে সকাল সকাল বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরের ঘরে সুবোধবাবুর গলা পাওয়া গেল। কাহার সহিত কি একটা বিতর্কমূলক আলোচনায় ব্যাপৃত! প্রতিপক্ষের গলা না পাওয়াতে তারাশঙ্কর বুঝিল সওয়াল করিতেছেন সুবোধবাবু। তাই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া একটু দ্রুতপদে ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সে সহাস্যমুখে কহিল, নমস্কার, আসতে পারি—। কিন্তু শেষের কথাটি গলার মধ্যে আটকাইয়া গেল। বাহির হইল না। সামনেই একটি মেয়ে বসিয়া হাসিমুখে সুবোধবাবুর কথা শুনিতেছিল। তাহার সহিত চোখাচোখি হইতেই তারাশঙ্কর থমকাইয়া পড়িল। মেয়েটিও অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল।

সুবোধবাবু ফিরিয়া দেখিলেন। সাদর আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, এস তারাশঙ্কর, এস। তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। ভাগ্যবান পুরুষ বটে তুমি। আমার অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তারাশঙ্কর বুঝিল না কিছুই। শুধু অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল! সুবোধবাবু বলিয়া চলিলেন, কত মধুসংক্রান্তির ব্রতই না তুমি করেছিলে ভায়া, তাত জানাওনি কোনদিন। তাই না কণ্ঠে তোমার এত মধু। প্রমীলার মুখে তোমার সুখ্যাতি আর ধরে না। বলে, গলা বলতে হয় ত তারাশঙ্করবাবুর। অমন গলা না হ'লে কি গান গাওয়া সাজে, না মানায়। অর্থাৎ যেহেতু আমার কণ্ঠস্বর ওর কানে মধুবর্ষী নয়, সেই হেতু আমার গলা গলাই নয়। বোঝাতে চাইলুম, গলা ভগবানের দান। তার ওপর যখন হাত নেই কারও তখন গান গাইব না কেন। ক্ষতি কি? বলে, ক্ষতি নয়, অপরাধ। পরের শান্তিভঙ্গ জনিত অপরাধ। সুতরাং এ অপরাধের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। শুনে পর্যন্ত ভায়া কি যে অস্বস্তি বোধ করছি মনে মনে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গান গাওয়া অপরাধ? তুমিই বল, এ আমার অপরাধ, না দেবী প্রমীলার নিছক পরশ্রীকাতরতা।

তারাশঙ্কর মহা বিব্রত বোধ করে। এ মেয়েটি যে কে, সে জানে না। ইতিপূর্বে চাক্ষুষ দেখেও নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে কি যে মন্তব্য করা উচিত বুঝিতে না পারিয়া সে পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

সুবোধবাবু তাড়া দিলেন, নিজের সুখ্যাতি শুনে তুমিও যে বোবা হয়ে গেলে দেখছি। এ সব তোমাদের ষড়যন্ত্র।

তারাশঙ্কর হাসিমুখে বলে, আইনজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে বে-আইনীর প্রশ্রয় দিচ্ছেন সুবোধবাবু। ষড়যন্ত্র করবার সময় দিলেন কোথায় যে ষড়যন্ত্র করব। গান গাইলে অপরের যদি শান্তিভঙ্গ হয়, আইন আর বে-আইন ত আপনাদের হাতের মধ্যে। আইনে না পেলে সব অপরাধ খণ্ডন করে দেবেন। তাব'লে গান গাইবেন না অপরাধের ভয়ে! বলিতে বলিতে তারাশঙ্কর থামিয়া গেল। দেখিল মেয়েটি নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহার মুখটি অপর দিকে ফিরান ছিল বলিয়া সে সঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু কেমন যেন খট্‌কা লাগিল যে মেয়েটি হাসি গোপন করিবার জন্যই মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে।

সুবোধবাবু বসিয়াছিলেন এদিকে মুখ করিয়া, তাই প্রমীলার নিঃশব্দ প্রস্থান জানিতে পারেন নাই। তারাশঙ্করের মন্তব্য শুনিয়া উল্লাসভরে কহিলেন, শুনলে ত প্রমালা। এর ওপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। গান গাইবার অধিকার সকলেরই আছে তা সে তোমার মত কিন্নরকণ্ঠি হ'ক বা না হ'ক। বলিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিলেন, প্রমীলা দরজা দিয়া অন্তর্হিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর আর এক পর্দায় চড়াইয়া কহিলেন, রাগ করে যাও কেন ছোট গিন্নী। বাকীটুকু শুনে যাও। বলিতে বলিতে নিজেই প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

তারাশঙ্কর কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুবোধবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমার বৌদিদির ছোট বোন, প্রমালা। কলকাতায় বি, এ, পড়ে। ছুটিতে বেড়াতে এসেছে। ছুটি হ'লে প্রায় এখানে এসে দিদির কাছে দিনকতক কাটিয়ে যায়। নিজের শালী বলে বলছি না, ভারী বুদ্ধিমতী মেয়ে।

তারাশঙ্কর সহাস্যমুখে বলে, আপনি ভাগ্যবান। শুধু গুণবতী শালীর ভগ্নিপতি বলে নয়—।

—তারই ভগ্নীর পতি বলে, এইটাই বলতে চাইছ ত? কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেল যে। শুনি সাত বছরে ল্যাংড়া আমও নাকি টক হয়ে যায়। এত সাত দুগুণে চৌদ্দ। বলিয়া নিজেই জোর করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইদানীং সুবোধবাবুর সান্ধ্য মজলিসের আসর বেশ খানিকটা ফাঁকা হইয়া আসিল। যাহারা আসিতেন, শীতের আকস্মিক প্রকোপে তাহারাও হাজিরায় কৃপণতা আরম্ভ করিলেন। শেষে অবস্থা দাঁড়াইল এমনই যে তারাশঙ্কর ব্যতীত সে মজলিসে আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সাংসারিক মানুষ সকলেই। মজলিসে না আসিলেও তাহাদের সন্ধ্যা কাটিয়া যাইত। কাটিত না শুধু তারাশঙ্করের। সারা দিনের পরিশ্রমের পর অবিনাশের সাহচর্যে সন্ধ্যা কাটান যায় না। মারামারি আর করে নাই বটে, কিন্তু নেহাত শান্তিতেও দিন অতিবাহিত হইতে দেয় না। আশ পাশের সহিত কলহ তাহার লাগিয়াই আছে। বাড়ী থাকিলে এর মধুর রেশ মাঝে মাঝে তারাশঙ্করকে শুনিতে হয়। অভিযোগ যা আসে সেগুলি সে যথাসাধ্য এড়াইয়া যায়। এই গোঁয়ার অনুচরটি পাছে তাহার সামনে আরও কিছু দুঃসাহসিকতা করিয়া বসে, এই ভয়ে সে বাড়ীতে থাকিবার মেয়াদ যথাসাধ্য কমাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাটা সে কিছুতেই সে বাড়ীতে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। তাই সুবোধবাবুর মজলিসে তাহার উপস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটে না বলিলেও চলে।

সেদিনও এই মজলিসের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া তারাশঙ্কর যখন সুবোধবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন চিরাচরিত প্রথার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে বাড়ীর দরজার সামনে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘর বন্ধ। এমন কি আলো পর্যন্ত জ্বলে না। হয়ত সে একটু ইতস্তত: করিতেছিল। এম সময় দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল সুবোধবাবুর ছোট ছেলে অমলের পশ্চাতে প্রমীলা। অমলকে মাঝে রাখিয়া প্রমীলাই কথা কহিল, মক্কেলের এক জরুরী তার পেয়ে দুপুরের গাড়ীতেই বরিশালের দিকে রওনা হয়ে গেছেন মুখুজ্জে মশাই। ফিরতে হয় ত দু চার দিন দেরী হতে পারে তাঁর। এমন একটু ফুরসৎ পেলেন না যে আপনাকে একটা খবর দিয়ে যান। কিন্তু অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছে আপনাকে—প্রমীলা থামে।

—বলুন, কি অনুরোধ তাঁর। তারাশঙ্কর প্রশ্ন করে একটু আগ্রহের সহিত।

—মুখুজ্জে মশায়ের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আপনার অনুপস্থিতির অজুহাত অকস্মাৎ যেন দেখা না দেয়।

তারাশঙ্কর স্বভাবতঃই লাজুক মানুষ। লজ্জিত কণ্ঠেই কহিল, না, না তা হবে কেন। আসব বই কি। নিশ্চয়ই আসব।

প্রমীলা আবার বলিল, দিদি আর আমি, দুজনেই মেয়ে মানুষ। পুরুষ বলতে বাড়ীতে আর কেউ নেই। চাকর আর এই ছোট ছেলের ভরসা। এমন কিছুই নয়। তাই মুখুজ্জে মশাই আপনার ওপর অনেকখানি ভরসা রেখেই রওনা হয়েছেন। দিদিও এই কথাই বলছিলেন।

তারাশঙ্কর এতক্ষণ নত দৃষ্টিতে কথা কহিতেছিল। এখনও সেই ভাবেই বলিল, এ ভরসার মর্যাদা রাখবার চেষ্টা আমি যথাসাধ্য করব। দিদিকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলবেন।

প্রমীলা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, দিদিরও বিশ্বাস তাই। তবুও তিনি বলে পাঠালেন, অসুবিধে যদি না হয়, সময় হ'লে এক একবার এসে এখানকার খোঁজ-খবর নিয়ে যাবেন।

তারাশঙ্কর মুখ তুলিল। প্রমীলার দিকে তাকাইয়া কহিল, আপনার দিদি আমার বৌদি হ'ন। তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলবেন, আমার আসার কোন ব্যতিক্রম হ'বে না। যেমন নিয়মিত ভাবে আসি তেমনই আসব। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে, যতটুকু আপনাদের কাজে আসতে পারি, সেই চেষ্টাই করব। সুবোধবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত, এ দায়িত্ব আমি সানন্দেই গ্রহণ করলুম। প্রমীলা ঘাড় নাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিল, দিদিকে এ কথা অমি বলব। শুনে খুবই নিশ্চিন্ত হবেন তিনি। কিন্তু আপনকে এ ভাবে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে গল্প করছি শুনলে, দিদি সত্যি রাগ করবেন। আপনি ঘরের ভেতর এসে বসুন, চাকরটাকে পাঠিয়ে দি জানালাগুলো খুলে দিক। অবার সেটাও হয়েছে তেমনি, একেবারে ফাঁকিবাজ। বাবু নেই ত তারও টিকি দেখবার জো নেই।

তারশঙ্কর সায় দিয়া বলিল, এ নিয়ম সর্বত্রই। যতক্ষণ জোয়াল কাঁধে থাকে ততক্ষণ কাজি, জোয়াল সরে গেলেই পাজি।

প্রমীলা হাসে। তারপরই বলে, আপনার অসুবিধে হবে খুব। কিন্তু সেটুকু কষ্ট না করা ছাড়া উপায় কিছু নেই। পরের উপকার করতে গেলে নিজের অপকার সইতে হয়।

—তা সইব। এ আর এমনই বা কি। আর তা ছাড়া বাড়ীতে আমার করবারও ত কিছু নেই।

প্রমীলা সে কথায় কান দিল না। অমলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কাকাবাবুকে ঘরে নিয়ে

বসাও অমল, আমি হিরুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি। ঘরখানা পরিষ্কার করে দিয়ে যাক সে। বলিতে বলিতে সে বাড়ীর ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রমীলা ফিরিল চা এবং জলখাবার লইয়া। তারাশঙ্কর অমলের সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। প্রমীলাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, বলে গেলেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন হীরুকে। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এলেন চা। এ পর্যন্ত না হয় বরদাস্ত করা গেল কোনমতে। কিন্তু তার সঙ্গে উপাদান যা নিয়ে এসেছেন, সেইটাই দেখছি মুখ্য। তার কাছে চা-টা গৌণ।

প্রমীলা চা এবং জলখাবার নামাইয়া রাখিয়া কহিল, আপনার মত এ বাড়ীতে আমিও একজন অতিথি। কোনটা মুখ্য আর কোনটা গৌণ সে খবর আমার জানা নেই। বলেন ত দিদিকে না হয় একবার জিজ্ঞাসা করে আসি। বলিয়া সে ডিসগুলি নামাইয়া রাখিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারাশঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, থাক এর মধ্যে দিদিকে এনে কাজ নেই। তাঁরা গুরুজন। তাঁদের অসম্মান না করাই উচিত। আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সব। বলিয়া জলখাবারের থালাখানি টানিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিল।

প্রমীলা দাঁড়াইয়াছিল। অমলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, কাকাবাবুর সঙ্গে গল্প কর অমল। দিদি বোধ হয় ডাকছেন আমায়, দেখে আসি। বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে দিন রাত হইল অনেক। স্বাভাবিক সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তারাশঙ্কর উঠিতে পারিল না। প্রমীলা 'আসি' বলিয়া সেই যে গিয়াছে, এখনও তাহার দেখা নাই। অথচ কোন কথা না বলিয়া চলিয়া যাওয়াটাও ভদ্রতা বিরুদ্ধ বলিয়া তারাশঙ্কর যাইতেও পারে নাই। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া যাইবার জন্য যখন সে সত্য সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই সময় প্রমীলাকে দ্বার প্রান্তে দেখা গেল। তারাশঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, রাত হয়ে গেল অনেক। দিদি বললেন, রাতের খাওয়াটা এইখানে সেরে গেলে তিনি খুশি হবেন।

তারাশঙ্কর বলিল, দিদির স্নেহ অপরিসীম। কিন্তু তারই সুযোগ নিয়ে অহেতুক উৎপাত করাটাও অন্যায়। তার ওপর আমার চাকর ব্যাটা হয়েছে হাঁদা গঙ্গারাম। আর একটু রাত হলে হয় ত পুলিশেই খবর দিয়ে বসবে। অতদূর গড়াতে দেওয়া হবে না। বরঞ্চ যতটুকু পারি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরি।

প্রমীলা সহাস্যে কহিল, চাকরটি আপনার লোক ভাল। প্রভুর মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি সজাগ। এর পর আর অনুরোধ করা যায় না। দিদিকে এই কথাই বলি গিয়ে।

—তাই বলুন। আরও বলবেন, বয়সে তিনি আমার ছোট হলেও মান্যে বড়। খাওয়াতে যখন চেয়েছেন তখন খাব নিশ্চয়ই এবং আনন্দ করেই খাব। তবে আজ নয়, আর একদিন। সুবোধবাবু ফিরে আসুন।

প্রমীলা ঘাড় নাড়িল, বেশ দিদিকে বলব আমি।

—বলবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

—নমস্কার। প্রমীলা দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, দিদির কথা মনে থাকবে ত? সুবিধে পেলেই এদিকে আসবেন।

—আসব। নিশ্চয়ই আসব। বলিতে বলিতে তারাশঙ্কর রাস্তার উপর নামিয়া পড়িল।

পরদিন। সন্ধ্যার একটু আগেই তারাশঙ্কর সুবোধবাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরের ঘর আজ আর অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। পূর্ব দিনের মতই সেখানে আলো জ্বলিতেছিল আজও। বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল অমল। তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে বসাইয়া বলিল, চলে যাবেন না, মাসীমা বসতে বলে দিলেন।

তারাশঙ্কর সহাস্য মুখে প্রশ্ন করিল, কিন্তু আমি যে এসেছি, তুমি জানলে কি করে অমল।

অমল বলিল, বারে, আমি জানব কেন। আমি ত খেলা করছিলুম ঘরে। মাসীমা ছাদ থেকে ছুটে নেমে এসে বললেন, তোমার কাকাবাবু আসছেন অমল, তাকে ঘরে নিয়ে বসাও লক্ষ্মী ছেলেটি আমার।

শুনিয়া তারাশঙ্কর চমৎকৃত হইল। মন আপনা হইতেই খুশিতে ভরিয়া উঠিল। প্রমীলার দৃষ্টি যে সজাগ এবং সেই জাগ্রত দৃষ্টির একটা অংশও যে তাহার আগমন আশায় অপেক্ষা করিয়া আছে, এইটাই তাহাকে আনন্দ দিল। তারাশঙ্করের প্রশ্ন তখনও শেষ হয় নাই, বালককে কি একটা জিজ্ঞাসা করিতেছিল, এমন সময়ে ঘরের বাহিরে কি একটা শব্দ শুনিয়া বালক চকিত হইয়া বলিল, আমায় ডাকছেন। আপনি বসুন, আমি শুনে আসছি। বলিতে বলিতে সে চঞ্চল পদে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর অমল ফিরিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করিয়া আনিল বাড়ীর চাকর হীরুকে। হীরু চা এবং জলখাবার সাজাইয়া দিল টেবিলের উপর। প্রতিবাদ নিষ্ফল জানিয়া তারাশঙ্কর প্রতিবাদ করিল না। শুধু চেয়ারখানি টেবিলের দিকে আর একটু টানিয়া লইয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে অমলের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। শিশু এবং বালকদের সহিত গল্প করিবার একটা পদ্ধতি আছে। যারা এ পদ্ধতির সহিত পরিচিত তারা পারগ, যারা নয়, তারা অপারাগ। তারাশঙ্কর এই শেষোক্ত দলের। সুতরাং সে সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

প্রমীলার আজ দেখা নাই। অথচ এ মেয়েটিকেই তারাশঙ্কর খুঁজিয়া ফিরিতেছিল মনে মনে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন তাহার দেখা পাওয়া গেল না, তখন বেশ খানিকটা ক্ষুণ্ণ মনেই সে উঠিয়া পড়িল।

অমল যে কখন নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়াছিল, তারাশঙ্কর টের পায় নাই। এখন সে পাশের দরজা দিয়া আসিয়া বলিল, মাসীমা আসছেন এক্ষুনি। আপনি আর একটু বসুন। কথাগুলি বালক এক নিশ্বাসে এমনিভাবে বলিল যেন মুখস্থ করিয়া আসিয়াছে।

তারাশঙ্কর ফিরিল। দেখিল অমলের পিছনেই প্রমীলা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখাচোখি হইতেই সে দু'পা আগাইয়া আসিয়া তারাশঙ্করকে নমস্কার করিয়া হাসিমুখে কহিল, ওখান থেকে সময় করে উঠতে পারিনি একটুও। অমলের মুখে শুনলুম আপনি চলে যাচ্ছেন। শুনে দেখা করতে এলুম। এ আমাদেরই লজ্জার কথা। একজন মানুষকে একা একা এতক্ষণ বসিয়ে রাখা উচিত হয়নি। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে আপনার এভাবে মুখ বুজে চুপচাপ বসে থাকতে।

তারাশঙ্করের মুখে হাসি দেখা দিল। বলল, মিথ্যে বলিব না। অসুবিধে যে একদম হয়নি তা নয়। তবে সেটুকু মানিয়ে নিতে হবে, অন্ততঃ এ কটা দিনের জন্যে।

প্রমীলা বলিল, দিদি এই কথা বলেই রাগ করছিলেন।

—দিদিকে রাগ করতে বারণ করবেন। এ এমন কিছু অসহনীয় নয়।

প্রমীলা স্মিতমুখে বলিল, দিদিকে বলব যে এরকম সহা আপনার অভ্যাস আছে। কিন্তু এত সকালে অবিনাশকে কেন পাঠিয়েছিলেন বলুন ত ?

প্রশ্নের মধ্যে পোঁচা নাই। অত্যন্ত সরল প্রশ্ন। তবুও তারাশঙ্কর বিব্রত বোধ করিল। তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে বাধিয়া গেল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র অবিনাশই দিতে পারে। তবে আমার যেটুকু জানা আছে সেইটাই বলি। সকালে বাজারে যাচ্ছিল অবিনাশ। বললুম, সময় যদি পাও ফেরবার পথে সুবোধ বাবুর বাড়ীটাও একবার ঘুরে এস। তবুও খবর একটা পাব, যদি কিছুর প্রয়োজন থাকে। কিন্তু ও কাজ করল উল্টো। দুটি কাজের একটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অপরটাকে গৌণ করে বসল। সুতরাং বাড়ী যখন ফিরল তখন শূন্যগর্ভ বাজারের থলি, শূন্যই রয়ে গেল। প্রশ্ন করে উত্তর পেলুম, দোষ সম্পূর্ণ আমার। একটা লোক দিয়ে হাজার রকম কাজ একসঙ্গে হয় না।

প্রমীলা গালে হাত দিয়া গভীর বিস্ময়ের সুরে কহিল, দেখুন, কাণ্ডকারখানা একবার। সকালটা তা হলে উপবাসেই গিয়েছে বলুন ?

তারাশঙ্কর বলিল, একে উপবাস আমি বলি না। বেশী পরিশ্রম বাঁচিয়ে যতখানি সাধ্য তার সে করে দিয়েছে।

প্রমীলা তেমনি বিস্ময়ের ভঙ্গীতেই বলিল, পরিশ্রম বাঁচিয়ে যা করে দিয়েছে সে, তা ত বুঝতেই পাচ্ছি। একে ত এখান থেকেই গেছে সে বেলা করে, তার ওপর বাজার করে নিয়ে যায় নি। কি দিয়ে যে খেয়ে গেছেন, ভগবানই জানেন। প্রমীলা গভীর দৃষ্টি তারাশঙ্করের মুখের উপর মেলিয়া থামিল। তারপর আবার বলিল, অবিনাশের মুখে যা শুনলুম তাতে বুঝলুম, সেই ত আপনার 'কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড' অর্থাৎ একাধারে চাকর বামুন দুই। এমন লোককে এভাবে ছেড়ে দেন কেন ?

তারাশঙ্কর একটুখানি হাসে। বলে, ছেড়ে দেওয়া না দেওয়া আমার ওপর নির্ভর করে না। এ তার খুশি। বাজার সে করে, ইচ্ছা করে অথবা অনুগ্রহ করে, এ আমি জানি না। তবে এক্ষেত্রে ভাবলুম সেই বাজারে যখন যাচ্ছে, তখন এ বাড়ীর খবরটাও নিয়ে আসুক একবার যদি কিছু প্রয়োজন থাকে।

প্রমীলা কহিল, বিলক্ষণ! প্রয়োজন যদি থাকত, কাল রাতেই জানতে পারতেন সে কথা। আর মুখুজ্জে মশাই যখন বলে গেছেন, তখন অহেতুক লজ্জা করে গোপন করতে যাব কেন। আর গোপন করলেই চলবে কি ক'রে, যখন দ্বিতীয় কোন অভিভাবক এখানে নেই। তাই বলছিলুম অনর্থক সাত সকালে ওকে আর পাঠাবেন না এখানে। তাতে আপনার সুবিধের চাইতে অসুবিধেই হবে বেশী। খাওয়া হবে না, অপিসেরও দেরী হবে মিছিমিছি। আজ দেরী হয়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই।

তারাশঙ্কর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হ'লই বা দেরী একটু। আর এর জন্যে সব দোষটা অবিনাশের নয়। আমারও আছে। আমার হুকুমেই সে এসেছিল এখানে।

প্রমীলা বলিল, এমন হুকুম আর দেবেন না।

—কেন? তারাশঙ্কর প্রশ্ন করিল আশ্চর্যে।

—নিজের অনিষ্ট করে পরের ইষ্ট করতে যাওয়াটা বোকামি।

তারাশঙ্কর হাসিয়া উঠিল, ঠিক তাই। অথচ এমন বোকা লোকও আছে।

প্রমীলা গম্ভীর মুখে বলিল, তা আছে। সেইজন্যে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে এত বড় বোকামি আর করবেন না।

তারাশঙ্কর কহিল, নিশ্চিন্ত থাকুন। যদি কোন দিন করি আপনাকে ডাক দেব আমায় সাবধান করে দেবার জন্যে।

—তাই দেবেন। কিন্তু আর দেরী করবেন না। যা প্রভুভক্ত ভৃত্য আপনার, হয় ত থানায় খবর দিয়ে বসে আছে এতক্ষণ।

তারাশঙ্কর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার প্রাণ খোলা হাসিতে ঘরের দরজা জানলা-গুলিতে পর্যন্ত কাঁপন ধরিল। বলিল, কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে। কিন্তু এত বড় সুযোগ তাকে দেব না। তার আগেই বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হব আমি! আচ্ছা, আসি তা হলে।

—আসুন।

তারাশঙ্কর পথে নামিয়া পড়িল। আর প্রমীলা সেইদিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! তার অনেকক্ষণ পর আপন মনে দরজা বন্ধ করিয়া বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া আসিল।

দিন দুয়েক পর। অপিসের বড় সাহেব সরকারী খেতাব পাইয়াছে বলিয়া সেদিন সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেল। সুবোধ বাবুর বাড়ীর খবরাখবর করা এখন তারাশঙ্করের নিত্যনৈমিত্তের ব্যাপার। আজও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। বাহিরের ঘরে উদ্‌গ্রীব মুখে দাঁড়াইয়াছিল প্রমীলা। তারাশঙ্করকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া কহিল, বাঁচলুম। কি মুস্কিলেই না পড়েছি। হীরুকে পাঠিয়েছি আপনার বাড়ীতে খবরটা দিতে। শুনেছেন নিশ্চয় তার কাছে? তারাশঙ্কর বিস্মিত হইল। মাথা নাড়িয়া কহিল, না ত। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন ত?

প্রমীলা কহিল, কাল রাত থেকে খোকনের জ্বর। আজ দুপুরের পর একেবারে বেহুঁশ। ডাক্তার চৌধুরীকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু এমন পোড়া দেশ যে ওষুধ মেলা দায়। চাকরটা ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে ফিরে এল। উপায় না দেখে ওকেই পাঠালাম আপনাকে খবর দিতে।

তারাশঙ্কর সায় দিয়া বলিল, মুস্কিলের কথাই বটে। খবরটা সকালের দিকে পেলে এতখানি অসুবিধেয় পড়তে হত না আপনাদের।

—তা জানি। কিন্তু তখন ভাবতে পারি নি যে জ্বরটা এতখানি বাঁকা পথ নেবে। তাই অসময়ে খবর দিয়ে বিরক্ত করিনি।

—ভাল করেন নি। এতে বিরক্তির কিছু ছিল না। বরং অশান্তি ভোগ করতেন না এতখানি। ব্যবস্থা পত্রখানা দিন। চেষ্টা করে দেখি একবার। ব্যবস্থাপত্র প্রমীলার কাছেই ছিল। বাহির করিয়া দিতে বিলম্ব হইল না। তারাশঙ্করের প্রসারিত হাতের উপর সেখানা তুলিয়া দিয়া কহিল, আশ্চর্য! ওষুধ পাওয়া যায় না এ কেমন কথা।

তারাশঙ্কর ব্যবস্থা পত্রখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া কহিল, ওষুধটা নতুন। হয়ত সব দোকানে এসে পৌছায়নি এখনও। যেখানে পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে, আমি জানি। নিশ্চিন্ত থাকুন, ওষুধ আমি নিয়ে আসছি এক্ষুনি। বলিয়া ব্যবস্থা-পত্র খানা পকেটে ফেলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই প্রমীলা বলিল, অপিস থেকে ফিরতে না ফিরতে এভাবে আপনাকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েছি শুনলে দিদি রাগ করবেন।

দিদির কাছে কৈফিয়ৎ আমি দেব। রোগের চেয়ে বিশ্রাম কখনও বড় হ'তে পারে না।

ঘণ্টাখানেক পর তারাশঙ্কর যখন ওষুধ লইয়া ফিরিল, তখনও প্রমীলা দরজার নিকট দাঁড়াইয়া। তারাশঙ্করকে দেখিয়া তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং কৃতজ্ঞতায় দুটি চোখ ভরিয়া গেল। ডাগর চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর মেলিয়া ধরিয়া মিনতি ভরা কণ্ঠে কহিল, মস্ত উপকার করলেন আপনি।

তারাশঙ্কর বাধা দিয়া কহিল, তা করলুম। কিন্তু উপস্থিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যদি না করতে পারেন, ক্ষতি নেই। ধীরে সুস্থে আর একদিন না হয় করবেন। আপাততঃ খোকাকে ওষুধটা খাইয়ে আসুন। আমি না হয় ঘরে গিয়ে বসছি ততক্ষণ।

প্রমীলা দ্বিরুক্তি করিল না। তারাশঙ্করকে ঘরের মধ্যে বসিতে দিয়া ওষুধ লইয়া বাড়ীর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারাশঙ্কর তাহার নিয়মিত স্থানটিই অধিকার করিয়া বসিল। আজ অমল নাই। সুতরাং গল্প করিবার সঙ্গীও নাই। প্রমীলার সহিত গল্প করিবার মধুর লোভ ভিতরে ভিতরে যতখানিই দুর্দমনীয় হইয়া উঠুক না কেন, এ তাহাকে সংবরণ করিতে হইল। রুগ্ন বালকের পাশে যে মেয়েটি স্থান করিয়া লইয়াছে, গল্প করিবার লোভে তাহাকে সেখান হইতে টানিয়া আনা কোনমতেই শোভনীয় হইবে না। সুতরাং তারাশঙ্কর যেমন বসিয়াছিল, তেমনিই বসিয়া রহিল। এ কয়দিনের মেলা মেশায় এ পরিবারের সহিত সঙ্কোচ তাহার অনেকখানি ঘুঁচিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ প্রমীলার দিক দিয়া যে সঙ্কোচ ছিল তাহা যে ক্রমশঃই অন্তর্হিত হইতেছে এ কথা ভাবিয়া সে অনেকখানি আরাম বোধ করিল। আজকের ঘটনায় প্রমাণিত হইল প্রমীলা কতখানিই না নিঃশঙ্ক তাহার উপর। তারাশঙ্কর একটু নড়িয়া বসিল।

পরদিন।

সকাল বেলাই হীরু আসিয়া খবর দিয়া গেল, খোকা বাবু ভাল আছেন। মাসীমা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে সকাল বেলা তাড়াহুড়া করিয়া ওদিকে যাইবার তেমন কোন প্রয়োজন নাই। অপিস ফিরৎ যাইলেই চলিবে। মাসীমা সব ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবেন।

তারাশঙ্কর বুঝিল, প্রমীলার দৃষ্টি সজাগ। সকাল বেলা ওবাড়ী যাইলে পাছে অপিসের বিলম্ব হয়, খাওয়া দাওয়ার বিভ্রাট ঘটে, সেইজন্য আগে ভাগেই চাকর পাঠাইয়া খবর দিয়াছে। একটা অজানিত আনন্দ তাহার অন্তরকে স্পর্শ করিয়া গেল।

সে দিন সকাল থেকেই তারাশঙ্করের শরীরটা ভাল ছিল না। এক দিকে অফিসের কাজের অত্যধিক চাপ অপর দিকে অমলকে দেখিয়া রাত করিয়া বাড়ী ফেরা, দুইটাই শরীরের উপর বেশ একটা প্রতিক্রিয়া সুর করিয়া দিয়াছিল। এ অবস্থায় ঠাণ্ডা লাগা বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ গত রাতের ঠাণ্ডাটা যে বিলক্ষণ লাগিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অফিস হইতেই তারাশঙ্কর ফিরিয়াছিল ক্লান্ত হইয়া। সুবোধ বাবুর বাড়ীতে যাইয়া কখন যে সে চেয়ারে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়া ছিল এ সে জানিতে পারে নাই। ঘুম ভাঙ্গিল প্রমীলার ডাকে।

প্রমীলা বলিল, এসে দেখি ঘুমুচ্ছেন অকাতরে। একবার ভাবলুম, ডাকব না। ঘুম যখন ভাঙবে, উঠবেন। কিন্তু একটু একটু করে রাত হয়ে গেল অনেক। কিন্তু এর পর আর সাহস হ'ল না।

তারাশঙ্করের আলস্য তখনও ভাঙে নাই। একটা হাই তুলিয়া কহিল,—কারণ ?

—কারণ আপনার কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ডটিকে ভয় বেশী। যদি পুলিসে খবর দিয়ে বসে সে।

তারাশঙ্কর হাসিয়া উঠিল। বলিল, শুধু আমিই একা নয়, দেখছি, আপনিও তাকে ভয় করেন বিলক্ষণ।

প্রমীলা হাসি মুখে উত্তর দেয়, করি। আর সেই ভয়েই ত ডেকে দিতে হ'ল আপনাকে। তা না হ'লে ডাকতুম না ত কক্ষণ।

—তখন জব্দ হ'তেন আপনারাই। সারা রাত ভুগতে হ'ত এই আনাড়ী লোকটিকে নিয়ে।

প্রমীলা মাথা নাড়ে। বলে, মনে হয়, না। সারা রাত কেটে যেত এমনি ভাবেই চেয়ারে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে। বিরক্ত করবার সুযোগ পেতেন কখন। কিন্তু বলিহারি আপনার ঘুমকে। ডাকছি কি এখন! ডেকে ডেকে গলা ধরে গেল তবুও সাড়া নেই। রাত্রে করেন কি?

তারাশঙ্কর লজ্জা পাইয়া বলে, রাত্রে ঘুমুই ঠিকই, তবে আজকের ঘুমটা ঠিক স্বাভাবিক ঘুম নয়। ক্লান্তির অবসাদ কখন যে নিঃশব্দে চোখ দুটির উপর ভর করে বসেছিল জানতে পারিনি। তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম অসময়ে। প্রমীলা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিল, বাড়ী না ফিরলে যদি উপায় থাকত, বলতাম আজকের রাতটুকু এইখানেই থেকে যান। এত রাতে বাইরে বেরিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাজ নেই।

তারাশঙ্কর বলিল, পথ সামান্য। এ টুকু যেতে বিশেষ কষ্ট হবে না আমার। সে জন্যে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই আপনার।

প্রমীলা বলিল, হীরুকে পাঁঠিয়েছি গাড়ী ডাকতে। যদি পায়, কষ্ট হবে না বিশেষ। কিন্তু যা দেশ, পাওয়াই মুস্কিল।

প্রমীলার আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হইল। গাড়ী পাওয়া গেল না। অগত্যা তারাশঙ্করকে উঠিতে হইল এবং সেই শীতের রাতে আড়ষ্ট শরীরের উপর আরও এক পশলা ঠাণ্ডা লাগাইয়া অনেক রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিল।

ফল হইল এই যে সকাল হইতেই তারাশঙ্করের শরীরটা বিকল হইয়া পড়িল। অপিস না যাইলে নয়, তাই তাহাকে যাইতে হইল। কিন্তু সকাল সকাল সে উঠিয়া পড়িল। ফিরিবার পথে সুবোধবাবুর বাড়ীর পথটা তাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল অত্যন্ত তীব্রভাবে। তাই এই পথ ঘুরিয়া তাহাকে আসিতে হইল।

আজও দরজা খুলিয়া দিল প্রমীলা। হীরু বাড়ী নেই। দু ঘণ্টার ছুটি নিয়ে সে গেছে কোথায়। সুতরাং দিদি পাঠিয়ে দিলেন অতিথি অভ্যর্থনার ভার দিয়ে।

তারাশঙ্কর খুশি হইল। খুশি মুখে বলিল, এমন অভ্যর্থনা সকলের ভাগ্যে জোটে না। হীরুকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রমীলা আরক্ত হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া কহিল, অভিনন্দনটা তাকেই জানাবেন। এলে, আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব তাকে।

—তাই দেবেন। আমি তাকে বুঝিয়ে দেব ছুটি নেওয়ার উপকারিতা।

—সে বুঝবে। এমন অভিনন্দন পেলে সে সারা বছর ছুটি নিয়ে বসে থাকবে, চাকরীতে আর যোগ দেবে না। বলিয়া সে একটা সহাস্য কটাক্ষ, তারাশঙ্করের দিকে প্রেরণ করিল।

তারাশঙ্কর হাসিল। বলিল, আহা বেচারী। এমন দুর্মতি তার যেন কখনও না হয়, এ কথাটাও তাকে আমি বুঝিয়ে বলব।

—বেশ ত, ঘন ঘন অভিনন্দনের লোভে আখেরে যাতে সে দুঃখ না পায় এ উপদেশটাও তাকে দেবেন। কিন্তু আপনাকে আসল কথাটাই বলা হয়নি এখনও। মুখুজ্জে মশাই 'তার' করেছেন। ফিরছেন কাল বিকেলে।

তারাশঙ্কর উল্লসিত হইয়া কহিল বাঁচলেন এবার। অনেক দুর্ভোগই ভোগ করতে হচ্ছিল আপনাদের, যার সমাধান পরের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

প্রমীলা ভাল মানুষের মত কহিল, সেই কথাই হচ্ছিল দিদির সঙ্গে। বলছিলুম, রেহাই পেলেন আপনি। পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কি মুস্কিলেই না পড়েছিলেন এ ক'দিন।

তারাশঙ্কর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আমি ভগবান নই। তবে বোঝা যে ভাগ্যবানের আর কটা দিনের জন্য হলেও আমিই যে তার বাহন, এই কথা ভেবে ভারী খুশি হচ্ছি মনে মনে।

প্রমীলা মুখ ফিরাইয়া লইল। অপরের নিকট ধরা পড়িতে সে চায় না। সেই ভাবে থাকিয়াই সে বলিল, আপনার চা পাঠিয়ে দিই, বসুন একটু।

তারাশঙ্কর আপনার আসনে বসিয়া কহিল, তাই দিন। একটু কড়া করেই দেবেন। শরীরটা বিশেষ ভাল ঠেকছে না।

প্রমীলা ফিরিয়া দাঁড়াইল। উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করিল, আবার ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন বুঝি? জ্বর টর কিছু হয়নি ত?

—জ্বর? মনে হয় না। হলেও সামান্য। তবে জ্বরের চাইতে ঠাণ্ডার প্রকোপটাই বেশী।

—না হওয়াই ভাল। হলে এই বিদেশে বিভুঁইয়ে কি হ'বে বলুন ত? একা মানুষ। দেখবে শুনবে কে? ঐ ত কথাইও হাণ্ডের ছিরি। হয় ত ফেলেই পালাবে শেষ পর্যন্ত।

অবিনাশ সম্বন্ধে এতখানি বীতশ্রদ্ধ তারাশঙ্কর নয়। তবুও বলে, বিচিত্র নয়। তবে তার ওপর বিশেষ ভরসা আমি রাখি না। যদি প্রয়োজন হয়, খবর দেব এখানে। তারপর যা করবার করবেন আপনারা।

প্রমীলা নত কণ্ঠে বলে, করব। ঈশ্বর না করুন, তেমন প্রয়োজন যদি কোনদিন হয়, আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। একটু থামিয়া আবার বলিল, এই সন্দেহ আমার হয়েছিল আপনাকে দেখে। আজ আর ঠাণ্ডা লাগিয়ে কাজ নেই। সকাল সকাল বাড়ী ফিরে যান। চা আমি নিয়ে আসছি এখুনি।

প্রমীলার সন্দেহ অমূলক নয়। তারাশঙ্কর সত্য সত্যই জ্বরে পড়িল। পরদিন সারা সকালটা তাহার কাটিল জ্বরের ঘোরে। বিকালের দিকে জ্বরের তীব্রতা কমিল বটে, কিন্তু বিছানা ছাড়িয়া উঠিবার প্রবৃত্তি হইল না। এমন কি সুবোধবাবুর বাড়ীর জন্য মনে মনে অনেকখানি উৎসুক থাকিলেও, সুবোধবাবু ফিরিলেন কি না এ খবরটুকুও লইতে পারিল না। সুতরাং বাসনার গতিবেগকে সাময়িকভাবে সংযত করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল। মনকে প্রবোধ দিল যে পরের দিন যাইয়া সে খবর লইয়া আসিবে। কিন্তু অদৃষ্টবাদ সাধিল। সে দিনও জ্বর ছাড়িল না। বরং তাপমান যন্ত্র সে দিন সকাল হইতে আরও বেশী সক্রিয় হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া তারাশঙ্কর হাল ছাড়িয়া শয্যাশ্রয় করিয়া রহিল।

জ্বরটা তারাশঙ্করকে বড় বেশী কাবু করিয়া ফেলিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া এই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় হীরু আসিয়া দেখা দিল। একখানা চিঠি তারাশঙ্করের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, মাসীমা বলে দিলেন এর উত্তর নিয়ে যেতে।

তারাশঙ্কর ব্যগ্র হাতে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। মাত্র দু ছত্রের চিঠি। সে রাত্রে জ্বর লইয়া তারাশঙ্কর বাড়ী ফিরিয়াছে, তারপর দু দিন দেখা নাই। এ জন্যে সবাই চিন্তিত। শেষ ছত্রে হীরুর

হাতে একটি সংবাদ পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে। সই করিয়াছে প্রমীলা। মুক্তার মত সাজান লেখাগুলি ছাড়া লেখার মধ্যে আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। তবুও পড়িতে পড়িতে তারাশঙ্করের মন অশান্ত হইয়া উঠিল। দুই দিন যায় নাই বলিয়া প্রমীলা ব্যস্ত, তাহার জন্য চিন্তিত। ইহার বড় সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে। সে উঠিয়া বসিল। হীরুকে বলিল, তোমার মাসীমাকে বল, শরীরটা ভাল নয় বলেই এ কদিন যেতে পারিনি আমি। একটু সুস্থ হ'লেই দেখা করে আসব। তিনি যেন কিছু মনে না করেন।

তারাশঙ্করের দিনটা কাটিল কেমন যেন এক স্বপ্নের ভিতর দিয়া। প্রমীলা তাহার জন্য চিন্তিত। এইটাই তাহাকে বড় আনন্দ দিতেছিল। তাহার অসুস্থতার জন্য এই বিদেশে যে কেহ উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হইতে পারে, জীবনে ইহা এক নূতন অনুভূতি। ইহাকেই সে বারবার নানাভাবে উপলব্ধি করিতে করিতে রাতটুকু কাটাইয়া দিল।

দুর্বল শরীরের ঘুম একটু বেলা করিয়াই ভাঙিল। চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। অথচ করিবারও কিছু নাই। সুতরাং তারাশঙ্কর শুইয়াছিল। এমন সময় অবিনাশ আসিয়া খবর দিয়া গেল, উকীল বাবু আসছেন। সঙ্গে আছেন মাসীমা।

অপ্রত্যাশিত সংবাদ। সঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিবার পূর্বেই দেখিল, সত্য সত্যই সুবোধ বাবুর পিছনে প্রমীলা আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতেছে। কি যে করিবে তারাশঙ্কর ভাবিয়া উঠিবার পূর্বেই সুবোধ বাবু খাটের উপর আসিয়া বসিলেন। সহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, আছ কেমন?

তারাশঙ্কর ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল, ভাল। তবে অসুখের চেয়ে দুর্বলতাই বেশী।

সুবোধবাবু বলিলেন, ফিরে এসেই খবর পেলুম ছোট গিন্নীর মুখে, খবর পেলুম, তুমি নাকি জ্বর নিয়েই ফিরেছ আমাদের বাড়ী থেকে। এ কথা তিনিই বুঝিয়ে দিলেন আমায়, যে মানুষ নিত্য এসে খবরা-খবর নিয়ে জান আমাদের, তিনি যখন একেবারেই আসছেন না, তখন অসুখটা সামান্য নাও হতে পারে। কালই আসছিলুম কিন্তু এমনি একটা কাজে জড়িয়ে গেলুম যে ছোট গিন্নীর খুব কম ক'রেও একশো বার তাগাদা সত্ত্বেও, একটিবার যে এসে খবরটা নিয়ে যাব, এমন সময় করে উঠতে পারলুম না। কিন্তু আজ আর ছাড়ান পেলুম না। সকাল না হতেই নিজেই সাজগোছ করে উপস্থিত। রাতে ঘুমিয়েছেন কি না উনিই জানেন। তাগাদা দিয়ে বললেন, অমলের অসুখে ভদ্রলোক করেছেন অনেক। বেশী রাত করে বাড়ী ফিরে ঠাণ্ডা লাগিয়ে নিজে অসুখে পড়েছেন। অতএব আমাদেরও কর্তব্য তাঁর একটা খবর নেওয়া।

জিজ্ঞাসা করলুম, এই আমাদের মধ্যে তুমিও পড় নাকি?

উত্তর হ'ল, 'না' যদি বলি, বেইমানী করা হ'বে। দিদির বার্তা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেতে হয়েছে তাঁর কাছে।

বুঝলুম, ওজর চলবে না। সুতরাং প্রস্তুত হয়েই বেরিয়ে পড়লুম এক সঙ্গে। কি বল ছোট গিন্নী, ঠিক ঠিক বলেছি ত সব। বাদ পড়েনি ত কিছু? বলিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে প্রমীলার দিকে তাকাইলেন।

প্রমীলা এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। ভ্রু কুঁচকাইয়া বলিল, আঃ! মুখুজ্জে মশাই!

মুখুজ্জে মশাই হাসি মুখে চুপ করিয়া গেলেন।

তারাশঙ্কর কথা কহিল, এ আমার অভাবিত সৌভাগ্য। এ সৌভাগ্য লাভ করতে হ'লে যদি

আমাকে মাঝে মাঝে এ রকম অসুখে ভুগতে হয়, আমি একটুও দুঃখিত হব না। বলিয়া সুবোধ বাবুর দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া প্রমীলার দিকে তাকাইয়াই আবার সে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। বলিল, ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমার অক্ষমতার ঋণ বাড়িয়ে তুলবেন না। আপনাদের অভ্যর্থনা করে নেবার মত যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু আমি অসুস্থ—অন্ততঃ তার খাতিরেও সব ক্রটী মার্জনা করে নিজেকে মানিয়ে নিন এখানে।

প্রমীলা আকণ্ঠ আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, মেয়েমানুষের বসা দাঁড়া নিয়ে ব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। নিজেকে আমিই ঠিক মানিয়ে নিয়েছি।

সুবোধ বাবু বলিলেন, তুমি বসলে তারাশঙ্কর বাবু যদি খুশি হ'ন প্রমীলা, তাকে খুশি করাই তোমার উচিত। বিশেষতঃ তুমি যখন অতিথি তখন ব্যস্ত হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

অগত্যা প্রমীলাকে বসিতে হইল। সুবোধ বাবুর দিকে তাকাইয়া বলিল, মানুষকে খুঁচিয়ে উত্যক্ত করাই আপনাদের স্বভাব। এ স্বভাব যাবে কবে?

—মরলে ছোট গিন্নী, মরলে। তার আগে নয়।

প্রমীলা সে কথায় কান না দিয়ে বলে, বাড়ীতে এ ভিজে বেড়ালটি। দিদির সামনে মুখ দিয়ে রা'টুকু বেরয় না। যত উপদ্রব কি আমার বেলায়?

সুবোধ বাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, একে উপদ্রব বলে না ছোট গিন্নী, বলে ভালবাসার নিদর্শন।

প্রমীলা আরক্তিম হইয়া কহিল, মুখে আগল দিন মুখুজ্জে মশাই।

—এই যে দিই। কথায় আছে, ল্যাংড়া আম টক হ'তে সময় লাগে সাত বছর। আমাদের বিয়ে সাত ছেড়ে চোদ্দ বছর হয়ে গেছে। সুতরাং টকে ত' গেছেই, এবার ঝাঁঝতে সুরু করেছে। এ সময় যদি টুকটুকে পিয়ারা-ফুলির সন্ধান পাই, ল্যাংড়ার ওপর আর কি মোহ থাকে?

—বাড়ী গিয়ে দিদিকে এই কথাই বলব।

—বোলো। তবে আর একটু বোলো যে বড়র প্রতি যেটুকু অবিচার সে শুধু ছোটর মান বাড়াতে গিয়ে করে ফেলেছেন মুখুজ্জে মশাই।

প্রমীলা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা বলব না। বলব মরা গাঙ্গে জোয়ার এসেছে। এ জোয়ারের টান রোধ না করলে হাবুডুবু খেয়ে সারা হবেন ভদ্রলোক।

—বৃথা সন্দেহ ছোট গিন্নী। নতুন জোয়ার বলে তুমি ভয় পাচ্ছ। কিন্তু অয়ি তিলোত্তমে! মা ভৈঃ! একটু বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু মাঝি পাকা। নৌকো বানচাল হতে দেব না কিছুতেই। প্রতাপ আর শৈবলিনীর কথা জান ত? তুমি যদি শৈ হও, তবে এস, আর একবার দেখিয়ে দি, এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার পাশে সাঁতার দিতে দিতে এ জোয়ারে উজান বাইতে পারি কিনা।

প্রমীলা বিপন্ন বোধ করিল। তাহাদের শালী ভগ্নীপতির মধ্যে এ ধরণের ঠাট্টা তামাসা লাগিয়াই থাকিত। কিন্তু সে দমিত না। বরং শাণিত উত্তর দিয়া সুবোধ বাবুকে প্রায়ই কোণঠাসা করিয়া ফেলিত। কিন্তু আজ তারাশঙ্করের সামনে সে সকল উত্তরের খেই হারাইয়া ফেলিতেছিল। উপযুক্ত উত্তর মুখে যোগাইতে ছিল না বলিয়া এক সময়ে সে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, আর একটু সামাল দিন মুখুজ্জে মশাই। আপনার জঠরাগ্নি ক্রমশঃই যে সক্রিয় হয়ে উঠছে তার প্রমাণ পাচ্ছি। তাকে নিষ্ক্রিয় না করলে অগ্ন্যুৎপাত করে আশে পাশে সকলকে দগ্ধে মারবেন। চুপ করে বসুন ত একটু। তারপর তারাশঙ্করের দিকে ফিরিয়া বলিল, অবিনাশকে ত দেখছি না কোথায় বলুন ত সে?

তারাশঙ্কর বলিল, রান্নাঘরে হয়ত পাঁচন সেদ্ধ করতে ব্যস্ত। জ্বালিয়ে মারল আমায়। যেমন রান্না! এক একদিন কান্না পেয়ে যায় খেতে! ডেকে দেব তাকে ?

—থাক। আমি খুঁজে নিতে পারব। বলিয়া সুবোধ বাবুর দিকে একটা কটাক্ষ হানিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। শুধু পিছন হইতে সুবোধবাবুর সুউচ্চ সরল হাসি তাহার দু'কানের ভিতর ধাক্কা মারিতে লাগিল।

নীচে রান্না ঘর। অবিনাশ চা করিতে ব্যস্ত। প্রমীলা ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিল, কি হচ্ছে অবিনাশ ?

অবিনাশ হাসিল। হাসিলেই তাহার মাড়ি শুদ্ধ বড় বড় দাঁতগুলি অত্যন্ত বেমানান ভাবে বাহির হইয়া পড়িত। মুক্ত দন্ত হইয়াই সে কহিল, চা করছি মাসীমা। বাবু নাম দিয়েছেন পাঁচন সেদ্ধ। যত ভাল করেই করি না কেন, বাবুর মন পাবার যো নেই। গাদা গাদা চা দিই, পুরো আধ ঘণ্টা ধরে সেদ্ধ করি, তবুও মনের মত আর হয় না। এক চুমুক খেয়েছেন কি না খেয়েছেন, অমনি কাপ শুদ্ধ চা দেবেন উল্টে ফেলে। আর সেই সঙ্গে করবেন আমার মুণ্ডুপাত। হোটেলের মত চা কেমন করে হবে বলুন ত ? যে চা করে তার মাইনে কত। দশ টাকায় কি চা করা, ভাত রান্না, বাজার করা সব হয় ? আপনিই বলুন না মাসীমা ?

মাসীমা বলিবে কি। চায়ের দিকে তাকাইয়া তাহার সর্বশরীর রি রি করিয়া উঠিল। বাস্তবিক চায়ের দুর্দশা দেখিয়া তাহার নিজেরই দুঃখ হইতেছিল। এ চা মানুষে মুখে দেয় কি করিয়া। চায়ের বর্ণ মসীকেও হার মানাইতেছে। চেহারা দেখিলে স্পর্শ করা দূরে থাক, মন আপনিই বিরূপ হইয়া উঠে।

প্রমীলা ঘরের ভিতর আর একটু সরিয়া আসিল। কহিল, বেশী চা দিলেই কি ভাল চা হয় অবিনাশ ? কেমন করে চা করতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি, শিখে নাও। বলিয়া অবিনাশকে সরাইয়া নিজেই চায়ের আয়োজনে লাগিয়া গেল।

এক পাশে এক তাল ময়দা মাখা পড়িয়াছিল। অবিনাশকে প্রশ্ন করিয়া প্রমীলা জানিতে পারিল, অসুখের ক'দিন এক রকম বিনা পথ্যেই বাবুর দিন কাটিয়াছে। আজ সকাল হইতেই ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় অবিনাশের উপর খাবার করিবার হুকুম হইয়াছে। সব প্রস্তুত। শুধু ভাজিয়া দিতে বিলম্ব যা।

ময়দা পরখ করিয়া প্রমীলার বাকরোধ হইয়া গেল। রবারের তাল দিয়া রোগীর পথ্য হইবে কি করিয়া। মুহূর্ত তরে সে সংযম হারাইতে বসিয়াছিল। কিন্তু পরের চাকরের উপর বিরক্তি প্রকাশ শোভা পায় না বলিয়া সে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি অবিনাশ। তুমি বরং এই টাকা নিয়ে যাও বাজার থেকে ভাল মিষ্টি নিয়ে এস। বলিয়া নিজের কাছ হইতে কয়েকটা টাকা অবিনাশের হাতে তুলিয়া দিল। মুক্তি পাইয়া অবিনাশও হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। আর প্রমীলা তারাশঙ্করের রান্নাঘরে বসিয়া তাহারই পথ্য প্রস্তুত করিতে করিতে সহসা মনের মধ্যে এক অভিনব চেতনার সন্ধান পাইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। খাবার জিনিষ লইয়া যে-মানুষের উপর দিনের পর দিন এরূপ অত্যাচার চলিয়া আসিতেছে আজ তাহার প্রতি করুণায় মন ভরিয়া উঠিল।

আধ ঘণ্টা পর চা, মিষ্টি এবং জলখাবারের থালা সাজাইয়া প্রমীলা এ ঘরে আসিয়া দেখা দিল। এবং বিস্মিত সুবোধবাবু এবং ততোধিক বিস্মিত তারাশঙ্করের সামনে সেগুলি ধরিয়া দিয়া ভগ্নীপতিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, নিন গিলুন। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবেন না, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, সেদিকে হুস আছে ? সকাল

বেলা মুখে ত জল দিয়ে বেরুন নি, তাই না জঠরের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, এবার সুস্থির হ'ন। তারাশঙ্করের দিকে ফিরিয়া কহিল, রোগী মানুষের পথ্য তেমনটি হয়ত প্রস্তুত করতে পারি নি। ত্রুটি মার্জনা করবেন।

তারাশঙ্কর ঘামিয়া উঠিল। অপ্রতিভ মুখে কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সুবোধবাবুর কণ্ঠস্বরে বাধা পড়িল। তিনি বলিল, তাই করবেন। আহা উপাদেয় জিনিষ। তোমার নাম অন্নপূর্ণাই হওয়া উচিত ছিল প্রমীলা। এমনটিতে তোমায় যেমন মানায়, তেমন আর কিছুতে নয়। মাইকেলের মানস কন্যা প্রমীলা যেন গেছো মেয়ে। কোমর বেঁধে, লাঠি ঘুরিয়ে তার আস্ফালন, আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে? সে প্রমীলা অপেক্ষা এ প্রমীলা অন্নপূর্ণা, যার বাম হাতে চা পাত্র, লুচির থালা ডান করে, অনেক ভাল কি বল হে তারাশঙ্কর? প্রমীলা ধমক দিল, আপনি মুখ বন্ধ করবেন মুখুজ্জে মশাই।

সুবোধবাবু কহিলেন, রাগ কর কেন ছোট গিন্নী। মুখবন্ধ করলে যদি খুশি হও, তাই করলুম। বলিয়া একগাল লুচি সমেত মুখ টিপিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রমীলা হাসিয়া কহিল দোহাই আপনাকে। আহার বন্ধ করতে বলিনি আমি। বলেছি কথা বন্ধ করতে। ও ভাবে সঙ সেজে বসে থাকলে লোকে বলবে কি?

এতক্ষণে তারাশঙ্কর কথা কহিল, আপনি আমার অতিথি! দয়া করে এখানে এসে আমায় ধন্য করেছেন। কোথায় আপনাকে সম্বর্দ্ধনা জানাব আমি, না, ফল দাঁড়িয়েছে উল্টো। এসে পর্যন্ত আমাদের জন্যে আপনি নিজেই ব্যস্ত। এমন কি রান্না করে পর্যন্ত খাইয়ে গেলেন। এতে যতখানিই আনন্দ পাই না কেন, নিজের দৈন্যকেও ত অস্বীকাকার করতে পাচ্ছি না; এ সত্যিই লজ্জার কথা।

প্রমীলা সহজ ভাবেই কহিল, এ লজ্জা আর একদিন স্খালন করবেন। তাতেই আমি সন্তুষ্ট হ'ব।

—তাই করব। এ বাউণ্ডেলের বাড়ী। আপনাদের যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করবার ব্যবস্থা এখানে নেই। তবুও কথা দিচ্ছি অপটু হাতে যতখানি সাধ্য অতিথি সেবার ত্রুটি করব না। সে দিন আসা চাই কিন্তু।

—আসব। আপনি ডাকলে নিশ্চয়ই আসব। আর বাউণ্ডেলের বাড়ীর আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য হব।

বেলা বাড়িতে ছিল! সুতরাং সুবোধ বাবু উঠিয়া পড়িলেন। অগত্যা উঠিতে হইল প্রমীলাকেও। তারাশঙ্করকে আরও কয়েকটা দিন বিশ্রাম লইবার জন্য বার বার নির্দ্দেশ দিয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথ চলিতে চলিতে প্রথমে কথা কহিল প্রমীলা। বলিল, তারাশঙ্করবাবুর খাওয়ার কষ্ট দেখলে সত্যিই দুঃখ হয় মুখুজ্জে মশাই।

সুবোধবাবু পথ চলিতে চলিতে অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, তাই নাকি?

প্রমীলা বলিল, সত্যি। আমি নিজের চোখে দেখেছি বলেই বলছি। পুরুষ মানুষ, শুনেছি উপায়ও করেন যথেষ্ট। কিন্তু এক হতভাগা চাকরের হাতে পড়ে, বেচারী না খেয়ে মারা যাবেন দেখছি।

সুবোধবাবু একটু কৌতুক অনুভব করিলেন। পরিহাস করিয়া কহিলেন, মুস্কিলের কথাইত। তবে তুমি যদি ওর এই ভারটা নাও, তা হলে ভদ্রলোক দুটি খেয়ে বাঁচতে পারেন। তারাশঙ্কর লোক ভাল। এ প্রস্তাবে হয়ত রাজিও হতে পারে।

প্রমীলা পরিহাস গায়ে না মাখিয়াই বলিয়া চলিল, শঙ্করবাবুকে অবিনাশের কথা জিজ্ঞেস করাতে

বললেন, পাঁচন সেদ্ধ করছেন। ভাবলুম, হবেও বা। অসুখের জন্যে পাঁচন সেদ্ধই করছে। নীচে গিয়ে দেখি চা করছে অবিনাশ। মাগো মা, কি চায়ের ছিরি। কালির রংও ঢের পদে আছে। একপো জলে এক পাউণ্ড চা দিয়ে ফুটিয়ে ফুটিয়ে গাঢ় করে এনেছে বললে, এত যত্ন করে করে আমি চা তৈরী করি মাসীমা তবুও বাবুর মন পাই না। বলেন, পাঁচন সেদ্ধ। এক পাশে ময়দা মাখা রয়েছে, যেন রবারের তাল। আমি জোর করে বলতে পারি মুখুজ্জে মশাই এইভাবে যদি রোগী মানুষের সেবা হয় সুস্থ হওয়া দূরে থাক, রোগ সারবে না কিছুতেই।

সুবোধবাবু সরল প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু প্রমীলার কণ্ঠস্বর এবং কথা বলিবার ভঙ্গীমা তাহাকে পর্যন্ত চমকিত করিয়া তুলিল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রমীলার ঈষদুত্তেজিত মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তাই ত! কি করা যায় বল দেখি।

এ প্রশ্নের মর্ম বুঝিবার মত মনের অবস্থা এখন প্রমীলার নয়। সে সেইভাবেই বলিতে লাগিল, এ দুদিনেই যেভাবে কাহিল হয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক, তাতে আহার এবং সেবার দুয়েরই প্রয়োজন। আমার মতে আত্মীয়দের কাছে তাঁর ফিরে যাওয়াই উচিত মুখুজ্জে মশাই।

—আমিও তাই বলি। কিন্তু এতক্ষণ যখন একত্রে রইলে তখন ও পরামর্শটা দিয়ে এলেই পারতে।

প্রমীলা আশ্চর্য হইয়া কহিল, পরামর্শ দেব আমি? আমার কথা শুনবে কে মুখুজ্জে মশাই?

সুবোধবাবু হাসিয়া বলিলেন, তোমার হুকুম তামিল করতে একা মুখুজ্জে মশাই ধরাতলে অবতীর্ণ হননি ছোট গিন্নী। চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাবেন দেবি যে ভক্তের সংখ্যা অনেক।

প্রমীলা বলিল, আপনি আমায় স্নেহ করেন, তাই প্রশ্রয় দেন সময় সময়। কিন্তু সবাই ত আপনি নন। তাঁরা দেবেন কেন?

—তোমার কেনর জবাব আমার জানা নেই। ও মন রাজ্যের ব্যাপার। তবে এইটুকু বলতে পারি যে তারাশঙ্কর ছেলে ভাল। তোমায় শ্রদ্ধাও করে যথেষ্ট। মনে হয় সে তোমার মর্যাদা বোঝে। তাই কোন আঘাতই সে তোমায় ইচ্ছে করে দেবে না।

প্রমীলার সারা মুখ চোখ অকারণে আরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল, একজন আর একজনকে শ্রদ্ধা করে কি করে না, আঘাত দিতে পারে কি পারে না, এসব তত্ত্ব তলিয়ে বোঝবার মত বড় মনোবিজ্ঞানী আমি নই মুখুজ্জে মশায়। তবে বলছেন যখন এবার দেখা হলে শঙ্কর বাবুকে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেব

—তাই দিও। সুফল কিছু পাবে।

এরপর আর কোন জবাব প্রমীলার দিক হইতে আসিল না। সে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। দুজনেই পথ চলিতে লাগিল, তবে কথা আর তেমন জমিল না।

কয়েক দিনের মধ্যেই তারাশঙ্কর রোগমুক্ত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু একটি মাত্র চিন্তা অক্ষুণ্ন তাহার চিত্তকে আলোড়িত করিতে লাগিল। জীবনাদর্শ লইয়া সে গোলে পড়িল। একজন তাহাকে প্রতি মুহূর্তেই কানে কানে বলিয়া দিতেছে, জীবনের গতি পরিবর্তন কর। এ পথ তোমার পথ নয়। যে বলিতেছে সে প্রমীলা। কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারী চুপি চুপি বলিতেছে সে, এ তোমার পথ নয়।

মাত্র একটি দিন। ঐ একটি দিনেই প্রমীলা তাহার জীবনে জট পাকাইয়া দিয়া গিয়াছে। সেইদিন হইতেই তারাশঙ্কর বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, যে জীবনের স্বাদ প্রমীলা দিয়া গিয়াছে, লোভ তাহাতেই তাহার বেশী, আশক্তিও বেশী।

প্রমীলাকে তাহার ভাল লাগে। তাহার সরল মাধুর্য মনকে নাড়া দিয়া যায়। একদিনের তরে এ গৃহে তাহার আবির্ভাব হয়েছিল অন্নপূর্ণার মূর্তিতে। এ মূর্তি তাহাকে লুব্ধ করিয়াছে, অন্তরের সকল সংযমকে বাঁধন হারা করিয়া দিয়াছে। এতদিন যাহা সে বোঝে নাই, আজ তাহা বুঝিয়াছে। অমৃতের যে স্বাদ পাইয়াছে, তাহাকে সে ভুলিতে চাহে না। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়াই উপভোগ করিতে চায়। তারাশঙ্কর মনে মনে স্বপ্নের সোনালী জাল বুনিতে বসিল। কয়েকদিন আগেকার কথা তাহার মনে পড়িল। প্রমীলা বলিয়াছিল, মাঝামাঝি পথ, পথ নয়। যারা সন্ন্যাসী হতে চান, তারা সংসার বৈরাগী হয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নিন। যারা তা চান না, তারা পুরা দস্তুর সংসার করুন স্ত্রী পুত্র পরিবৃত হয়ে। এতে সংসারের কল্যাণ হবে। না গৃহী, না সন্ন্যাসী এদের দ্বারা সমাজের কল্যাণ হয় না।

সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু সেদিন ইহার উত্তর সে পাশ কাটাইয়া গেলেও আজ এটাকেই আশ্রয় করিয়া ভাগ্যটাকে একবার যাচাই করিয়া দেখিবার জন্য মনে মনে সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তারাশঙ্কর সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

সেদিনও ছিল ছুটির দিন। দুদিন সে সুবোধবাবুর বাড়ী যায় নাই। অফিসের কাজের চাপ যতখানিই হউক না কেন, আসল প্রতিবন্ধক হইয়াছিল তাহার মন। এই দুদিন ধরিয়া সমানে সে মনের সহিত যুঝিয়া আসিতেছিল। অবশেষে যে বিদেহী দেবতাটি অলক্ষে থাকিয়া তাহার অন্তরটিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তুলিতেছিল জয় তাহারই হইল। তারাশঙ্কর সুবোধ বাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

সুবোধ বাবু বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। মহাখুশীভরে তারাশঙ্করকে অভ্যর্থনা করিলেন, এস তারাশঙ্কর, তোমারই প্রতীক্ষা করছিলুম। একা একা হাঁপিয়ে উঠেছি। দুদিন আসনি। প্রমীলা ভেবেই অস্থির। বলে, বাউণ্ডেলে লোক, হয়ত অসুখ করেই বসে আছেন। তাই যাবার সময় বার বার করে বলে গেছে তোমার খবরটা নিতে। তোমায় দেখাশুনা করবার কেউ নেই। তাই সে ভারটা দিয়ে গেছে আমার ওপর। তুমি না এলে, এখুনি আমায় ছুটতে হ'ত তোমার কাছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলত ?

তারাশঙ্করের বুকের ভিতরটা এক অজানিত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কোন অর্থই তাহার বোধগম্য না হওয়াতে সে শুধু সুবোধ বাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সুবোধবাবু বলিলেন, আসল ব্যাপারটা এখনও বলা হয় নি তারাশঙ্কর। হঠাৎ প্রমীলার দাদু এসে উপস্থিত। শ্বশুর মহাশয়ের অসুখ। মেয়েদের দেখতে চান তিনি। সুতরাং দু'বোনই চলে গেলেন আজ সকালে। সঙ্গে গেল ছেলেরাও। কাল এলে দেখা হ'ত। প্রমীলা সত্যিই তোমায় শ্রদ্ধা করে। যাবার সময় পর্য্যন্ত বলে গেছে, শঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা হল না মুখুজ্জে মশাই। সে আপন ভোলা লোক, হয়ত অসুখ করেই বসেছেন। তাঁর খবরটা নিয়ে জানাবেন আমায়। তারপর চুপি চুপি বলে গেল, ছোট গিন্নী সামনে নেই বলে তার অসম্মানটা করে বসবেন না যেন। তা হলে সত্যিই রাগ করব কিন্তু।

তারাশঙ্কর শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, আপনার শালী ভাগ্যটা ভাল মুখুজ্জে মশাই। আজ এই প্রথম তারাশঙ্কর সুবোধ বাবুকে মুখুজ্জে মশাই বলিয়া সম্বোধন করিল।

সুবোধ বাবু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আমারটা হয়ত ভাল, কিন্তু তারটা নয়। ঈশ্বরের কি ইচ্ছা জানি না, এমন যে অমূল্য রত্ন সৃষ্টি করেছেন তিনি, কাহারও ভোগে না লাগাবার জন্য। প্রমীলা বালবিধবা।

মুহূর্ত মধ্যে ঘরের ভিতর যেন অশনিপাত হইয়া গেল। মানুষ যে এমন ভীষণভাবে চমকাইয়া

উঠিতে পারে এ অভিজ্ঞতা সুবোধ বাবুর ছিল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া তারাশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তারাশঙ্করের চোখ দুটি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। মুখের শেষ রক্ত বিন্দুটি কোন এক অদৃশ্য শক্তি যেন ধীরে ধীরে শুষিয়া লইতেছিল। মনের সহিত মস্তিষ্কের যে কোন যোগাযোগ আছে তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছিল না। কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থাকিয়া অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল, প্রমীলা বিধবা?

সুবোধ বাবু সায় দিয়া বলিতে লাগিলেন, অল্প বয়সেই প্রমীলা বিধবা হয়। তার কোষ্ঠীতে ছিল অল্প বয়সে মৃত্যু যোগ। মেয়ে পর গোত্রে গেলে, এ ফাঁড়া হয়ত খণ্ডাতে পারে, জ্যোতির্বিদদের এই বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে শ্বাশুরী ঠাকুরানী খুব কম বয়সেই তার বিবাহ দেন। কিন্তু ফলাফল বিপরীত। মেয়ে বাঁচল বটে, কিন্তু জামাই গেল মেয়ের পরমায়ু নিয়ে। ঘরের মেয়ে ফিরে এল ঘরে। বাপ বিচক্ষণ লোক। মেয়ের দুর্ভাগ্যে ভেঙে পড়লেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। বুক বেঁধে লেগে গেলেন, মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলবার জন্যে। তাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, লেখাপড়া শিখে নিজেকে নিয়ে থাকবার সুযোগ দিয়েছেন, আর দিয়েছেন সংসারের সর্বময় কর্তৃত্ব। সুবোধ বাবু থামিলেন। হঠাৎ তারাশঙ্করের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তোমাকে ত আজ সত্য সত্যই ভাল দেখাচ্ছে না শঙ্কর। অসুখ বিসুখ করল নাকি আবার? প্রমীলার কথাই ঠিক হ'ল দেখছি!

যে প্রচণ্ড আঘাত তারাশঙ্করের অন্তরটা কুচি কুচি করিয়া দিতেছিল তাহার বেগ কিছুতেই সে সহিতে পারিতেছিল না। তাই অত্যন্ত ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, শরীরটা খুবই অসুস্থ সুবোধ বাবু। দুদিন আসতে পারিনি বলেই দেখা করতে এসেছিলুম আজ। এখন বুঝছি, এসে ভাল করিনি। বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন অথচ এসেই এভাবে চলে যাওয়াটাও আমার পক্ষে খুবই অশোভনীয়। কিন্তু মাপ করবেন, আজ আমাকে যেতেই হবে। বলিতে বলিতে বিস্মিত সুবোধ বাবুকে কিছু বলিতে দিবার পূর্বেই সে অত্যন্ত চঞ্চল পদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়াই তারাশঙ্করের মনে হইল তাহার দৃষ্টিশক্তি যেন ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। কাহারা যেন পৃথিবীর বুক হইতে আলোর সব কয়টি রংই শোষণ করিয়া লইয়াছে। দেহের উত্তমাঙ্গের তুলনায় অধমাঙ্গটি অস্বাভাবিক ভাবে হাল্কা। যেন ভার বহিবার কোন সামর্থই আর তাহার নাই। মাথার ভিতর সহস্রাধিক ঝিঁ ঝিঁ পোকা কেমন এক বেসুরা আলাপ সুরু করিয়া দিল। তাহারই মাঝে স্নায়ু তন্ত্রীগুলির উপর হাতুড়ির ঘা দিয়া দিয়া এক অনুচ্চারিত কণ্ঠস্বর তাহাকে জানাইয়া দিতেছিল, প্রমীলা বিধবা, প্রমীলা বিধবা। তারাশঙ্কর সকল সহ্যের সীমা হারাইয়া ফেলিল্। তাহার পা দুটি কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখে একখানা রিক্সা দেখিতে পাইয়া কোন মতে তাহার উপর চাপিয়া বসিল।

পরদিন। তারাশঙ্করের ঘুম ভাঙিল অনেক দেরীতে। চোখ মেলিয়া তাকাইতেই দেখিল, অবিনাশ উদ্‌গ্রীব মুখে দাঁড়াইয়া আছে। প্রভুকে চাহিতে দেখিয়া সে সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, এখন কেমন বোধ হচ্ছে বাবু, শরীরটা ভাল ত?

প্রথমটা কিছু না বুঝিয়া তারাশঙ্কর ঘাড় নাড়িল। তারপর রাত্রির কথা স্মরণ হইতেই সে চুপ করিয়া গেল।

অবিনাশ বলিতে লাগিল, কাল কি দুর্ভাবনায় রাত কেটেছে বাবু। চোখের দুটি পাতা এক করতে পারিনি। অনেক রাত করে আপনি ফিরে এলেন রিক্সা করে। চুল উস্ক-খুস্ক, মুখ টসটসে চোখ দুটো

রাঙা। আমি ভয়েই মরি। রিক্সাওয়ালা বললে, সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত রাস্তাময় বাবু ঘুরিয়ে মেরেছেন আমায়। বাবু দারু পিয়েছে বলে প্রথমে ভয় পেয়েছিল। তারপর যখন বুঝতে পারল আপনি অসুস্থ, তখন অনেক কষ্টে আপনাকে বাড়ী ফিরিয়ে আনে। ব্যাটা এক টাকা বকশিষ নিয়ে তবে ছাড়ল। আমি ভাবছিলুম, ও বাড়ীতে একটা খবর দিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসি। এমন সময় আপনার ঘুম ভাঙল।

বিগত রাতের কথা তারাশঙ্করের মনে পড়িল। কিন্তু সেদিক থেকে জোর করিয়া মনকে ফিরাইয়া আনিয়া অবিনাশকে বলিল, আমি স্নান করব। জলের ব্যবস্থা কর। এখুনি আমাকে একবার অপিস বেরুতে হবে।

অপিসে আসিয়াই তারাশঙ্কর ওপরওয়ালার কাছে একখানা দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। শরীর ভাল নয়, স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে, বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন—এই অজুহাতে সে দীর্ঘ দিনের ছুটি প্রার্থনা করিয়া বসিল। তারপর চিঠিখানা যথাস্থানে পাঠাইয়া দিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে দুই করতলে মুখ ঢাকিল।

সমাপ্ত

শিক্ষাগুরু ধাঁধাঁয় পড়লেন তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে নিয়ে। তাকে পুতুল গড়তে বললে সে এমন পুতুল গড়ে, যে শিক্ষাগুরু অবাক হয়ে যান, মনে মনে ভাবেন, এ হাত ত মানুষের হাত নয়!

আবার, ছবি আঁকতে বললে ছাত্রটি এমন ছবি এঁকে বসে যে শিক্ষাগুরুর তাক্ লেগে যায়,—এ তুলির টান ত মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

ছাত্র গুরুর পায়ের কাছে বসে মিনতি করে বলে, গুরুদেব বলে দিন আমাকে আমি কোন্ পথে যাব?

গুরু হেসে বলেন, তুমি অসাধ্য সাধন করতে পেরেছ। দু'পথে একসঙ্গে কেউ চলতে পারে না, কিন্তু তুমি সমানে তোমার অপূর্ব্ব প্রতিভার লীলা দেখিয়ে চলেছ দুই বিভিন্ন পথে। জগতে তোমার মত প্রতিভা আর কার আছে?

শিষ্য সেদিন গুরুর চরণে প্রণাম করে দুই পথেই এগিয়ে চলেছিল।

আজও মাইকেল এঞ্জেলো শুধু অসামান্য ভাস্কর নন, অসামান্য চিত্রকরও বটেন।

একজন আর কয়েকজন

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

ইংরাজ শাসন ব্যবস্থার আওতায় তাদেরই সমর্থন এবং অর্থে পুষ্ট একদা যে উচ্চ মধ্যবিত্ত বৃত্তিজীবী সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল এই বাংলা দেশে ও বাংলা দেশের বাইরে নানা প্রবাসী বাঙালী কেন্দ্রে, উপেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে তাদেরই একজন। তাঁর সৃষ্ট গল্প সাহিত্যের চরিত্রগুলির শ্রেণীরূপ বিশ্লেষণ করলে এই সত্যই প্রকটিত হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের বৈঠকী মেজাজ, সফলতা ও প্রাচুর্য মিশ্রিত পরিবার এই হচ্ছে উপেন্দ্রনাথের জীবন পরিবেশ। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী তাই স্বভাবতঃ মসৃণ।

মিশ্রযুগের ভাবনা, জীবনবোধে নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস অথবা ফ্রাসটেশন এবং আধুনিক কালের কম্‌প্লেক্সিটি—উপেন্দ্র জীবন-দর্শনকে অবিশ্বাস কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, সংশয়-সংকটে দোদুল্যমান করে তোলেনি।

উপেন্দ্র-অন্তরঙ্গ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপেন্দ্র পরিচিতিতে যে কথা বলেন তা সর্বতোভাবে সত্য।

'বৈঠকী মেজাজের সদা হাসি-খুসি ভরা অন্তরময় যে আনন্দ পুরুষ বালিগঞ্জ প্লেসের দক্ষিণের ঘরটি আড্ডার-আসরে ভরিয়ে রেখেছিলেন, সেখানে তুমি-আমি এবং সবাই মিলে যত খুসি প্রাণভরে দক্ষিণের ঝিরঝিরে বাতাসকে উপভোগ করা যেতে পারে। কোনো ফন্দি-ফিকির সেখানকার আবহাওয়াকে স্বার্থবোধে মলিন করতে পারে না। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর দর-দালানের কর্তাদের যে বৈঠক সেই বৈঠকের শেষ বৈঠকটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বৈঠকী উপেন্দ্রনাথ।'

এই বৈঠকে উপেন্দ্রনাথের শিল্পবোধের মূলকথা হচ্ছে আনন্দম্। এই আনন্দকে গাল্পিক উপেন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য দিয়েছিলেন তাঁর কথা-সাহিত্যে। কবি উপেন্দ্রনাথের রোমান্টিক-মন আর গাল্পিক উপেন্দ্রনাথের স্বচ্ছ ঘরোয়া-জীবন—দুই মিলে কথা সাহিত্যে যে-যুক্তবেণীর সঙ্গম সৃষ্টি করেছে তা নির্ভেজাল, তা পরিচ্ছন্ন, তা স্বচ্ছ। উপেন্দ্রনাথের কথা-সাহিত্যে আশা-আনন্দ, আমোদ-আহ্লাদের দিকটা তাই বড়।

> 'বেসেছিনু ভালো এই সুন্দরী ধরণীরে
> আলোকে আকাশ ভরা উজ্জ্বল ভরণীরে।
> বেসেছিনু সুদূরের গ্রহ ও তারকায়
> বেসেছিনু মানুষেরে সুগভীর মমতায়।
> দূরে থাক অভিযোগ, দূরে থাক অভিমান,
> কি হইবে খতাইয়া দান আর প্রতিদান ॥'

উপেন্দ্র-কবিতার এই কয়েক ছত্র তাঁর সহৃদয় ভালোবাসাময় অন্তর-ব্যঞ্জনারই প্রতিধ্বনি।

প্রকৃতির কবি বস্তুর জগতে কথাকার। জীবন-ভাবনায়, আলাপ-আচরণে, পারিপার্শ্বিকতায়, মানুষের সঙ্গে মানুষের সঙ্গ স্থাপনায়, সমাজের সঙ্গে সামাজিকতায়, শিল্পে এবং ব্যক্তিগত জীবনে—উপেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বত্রই একই ভাবের দ্যোতনা।

কয়েকজনের মধ্যে একজন উপেন্দ্রনাথ তাই অনন্যসাধারণ।

জীবনে সংশয় নিশ্চয়ই এসেছে। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগের আঁচ উনবিংশ শতকের মনকে আধুনিককালের বিপর্যয়ে নিশ্চয়ই বিপর্যস্ত করেছে; কিন্তু তাই বলে অবিশ্বাস নেই। ভালোবাসার নরম মাটি থেকে বন্ধুর পথে বিচরণ করতে তাই বলে পথভ্রষ্ট কখনো হননি অনন্যসাধারণ একজন—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তাই আজকের যুগে যখন এককের স্বার্থকেন্দ্রিক ঘর, একান্নবর্তী পরিবার বন্ধনচ্যুত, এককের সঙ্কীর্ণ সংসার—তখনো তিনি একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের অভিভাবক।

সাহিত্যিক মনোজ বসু 'উপীনদা' বলতে বলেন, 'আমাদের একান্নবর্তী সাহিত্যিক যৌথ পরিবারের তিনি সার্বজনীন অগ্রজ। তিনি আমাদের জ্যেষ্ঠ। তিনি আমাদের অভিভাবক। তাঁর বিহনে আজ সবচেয়ে বড়ো দুঃখ, আমাদের আদেশ করবার কেউ নেই।'

গল্প-বলিয়ে উপেন্দ্রনাথ তাঁর গল্প বলার ঢংটিকে শুধুমাত্র বহিরাবরণে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর অন্তরসত্তাও সেখানে এক। জীবনে যেমন তিনি একজন, দু'জন বা সংখ্যাল্প দলের দলপতি ছিলেন না, সাহিত্য সৃষ্টিতেও তাঁর আদর্শ ছিল সর্বজনীনতা। সকলকে আনন্দ দিয়ে, আশা দিয়ে, ভরসা দিয়ে যে-জীবন বৃহত্তর, শিল্প-সৃষ্টিতেও সেই শিল্প-কর্মের দ্যোতনা। তিনি তাঁর সবচেয়ে বড়ো সমালোচক বিষ্ণু নাগের সঙ্গে তাই তর্ক তুলতেন।

বিষ্ণু নাগ বলতেন, 'তেল কিনতে মুদীর দোকানে গিয়ে রামায়ণ পাঠ যদি শুনি, তেল কেনাটাকেই আসল কাজ বলব।'

উপেন্দ্রনাথ পাল্টা জবাব দিতেন, 'কোনটা আসল আর কোনটা নকল, তা হচ্ছে কালের বিচার। তবে তেল কিনতে গিয়ে রামায়ণের গল্প যদি ক্ষণিক তেল কেনাতে বিরতি ঘটায়, তাহলে রামায়ণ পাঠ শোনাকে গৌণ বলে তাচ্ছিল্য করার কারণও দেখি না।'

তেল-নুন কেনা সংসারীর ধর্ম। তেল-নুন লাকড়ির ভাবনা থেকে রেহাই পেয়ে কোনো সাংসারিক-জীব যে শুধুমাত্র রামায়ণ-কাহিনী নিয়ে মেতে থাকতে পারেন, এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। উপেন্দ্রনাথ জীবনে যে সে ভাবনা ভাবেননি তা নয়, আর তাঁর সৃষ্ট কথা-সাহিত্যও যে এই ভাবনায় কখনো আত্ম-নিমগ্ন হয়নি তাও নয়। তবে এই তেল-নুনের সমস্যাই জীবনে এবং তাঁর সাহিত্যে শুধুমাত্র প্রাধান্য লাভ করেনি। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে মহান প্রেরণা কবি উপেন্দ্রনাথ প্রকৃতি এবং মানবী শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সেখানে যেমন অবিশ্বাসের ছায়া নেই, তেমনি গল্প-সাহিত্যিকের জীবন-কেন্দ্রের সবচেয়ে বড়ো প্রেরণাদাত্রী উপেন্দ্রজায়া শ্রীমতী বিভাবতী দেবীর উদার ব্যবহার এবং সহৃদয় সহানুভূতি সম্পন্ন চিত্ত-পরশ উপেন্দ্রনাথকে মধুর-মেজাজী কথাশিল্পী করে গড়ে তুলেছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজের বি-এ পড়া ছাত্র প্রায় সমবয়সী বন্ধুতুল্য সুরেনদাদার কলকাতার মেসের দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে দুটি অল্প বালিকাবয়সী মেয়েদের স্কুল থেকে প্রত্যাবর্তনের দৃশ্যে বিভোর হয়ে দেখতো—তাদেরই একজন এলেন বছর দেড়েকে পরে সেই নব-যুবকের 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারের' চির-সঙ্গিনী হয়ে। বসন্ত-জীবনে সার্থক এই রোমান্সের রংটি পরিণত অশতিপর বার্ধক্যেও বিমলীন হয়নি। সে জীবনের কবিতা—

আমারো নয়ন রয়েছে এখনো
তোমার স্বপনে মুগ্ধ
পাতা-ঢাকা ফুলে অলির মতন
হৃদয় আমার লুব্ধ।'

এ-জীবনেও বাঙ্ময়।

তাই সারা-জীবন ধরে উপেন্দ্রনাথ আনন্দ-সন্ধানী, প্রেম-সন্ধানী। পরিপূর্ণ জীবন ঘিরে, পরিপূর্ণ সাহিত্য ঘিরে তাঁর আনন্দ-পথলোকে বিচরণ। সংশয়, কলহ, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, কালরাত্রি তাঁর আনন্দময় সত্তাকে মলিন করতে পারেনি। তৎপরিবর্তে দেবী যোগিনী তাঁর জীবন-পথ, সৃষ্টি-পথের সম্মুখে অবস্থান করে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিলেন এবং অশুভ তিথি ও প্রতিকূল নক্ষত্র তাঁর যাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন ও রাত্রি যাতে সুস্মিতময়ী হয় তদ্বিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ স্মরণে

কালের স্রোতে একটি বছর পার হয়ে গেল—উপেন্দ্রনাথ আজ পরলোকে। 'স্মৃতিকথা'র উপেন্দ্রনাথ অগণিত সাহিত্যরসিকদের স্মৃতি-লোকে প্রোজ্জ্বল। বিগত দিনকে ঘিরে আমরা তাঁর সাহিত্য এবং সান্নিধ্যকে উপলব্ধি করি; আর আমাদের পাঠক-পাঠিকারা 'বিগত দিনের লেখকে'র সত্তাকে অনুভব করে থাকেন উপেন্দ্রপ্রিয় গল্প-ভারতীর পাতায় পাতায়।

তাঁর অন্তর্ধানের দিবসটিকে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসায়, বেদনায় এবং স্মৃতি-চারণায় ধারণ করি। কবি উপেন্দ্রনাথ, সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ, ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথ, সবার উপরে মানুষ উপেন্দ্রনাথকে—আজ আমরা অন্তরের গভীরে স্মরণকরি। মৃত্যুঞ্জয়ী—উপেন্দ্রনাথ।

অন্তিম-উৎসবে

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রভু, তোমার পথের পথিক করিবে কবে ?
কবে সুগভীর রাত হইবে প্রভাত, তব ভৈরব রবে !
যবে ক্লান্ত হইবে আশা,
আর শেষ হবে ভালবাসা,
আর এক হ'য়ে যাবে আলো আর ছায়া,
সুখ-দুখ, কাঁদা-হাসা ;
তখন গভীর উদাস স্বরে
বাজিবে না কি হে দূরে
কল-কল্লোলময় সঙ্গীত মহা সাগরের কলরবে !
যবে অন্ধ হইবে আঁখি,
আর বধির হইবে কান,
আর প্রাণের মাঝারে থাকিয়া থাকিয়া
কাঁপিয়া উঠিবে প্রাণ ;
তখন বন্ধ হইবে চলা,
শেষ হবে কথা বলা,
তখন বাজিবে পথের-শেষ হওয়া গান
অন্তিম-উৎসবে !

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—উপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে

'ওহে উপেন, দুটি কারণে তুমি আমাকে বিস্মিত করেছ।'

গুরুদেবের এ-কথায় সত্যিই বিস্মিত উপেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন, 'প্রথম বিস্ময়ের কারণ' তুমি কবিতা লেখ। আর দ্বিতীয় কারণ, শুধু কবিতা লেখা নয়, তুমি ভালো কবিতা লেখ।'

14, Lower Pozoungdoung Street, Rangoon
২২শে আগষ্ট, '১৩

প্রিয় উপীন,

এ মাসের যমুনা পাইয়া তোমার 'লক্ষ্মীলাভ' পড়িলাম। এ সম্বন্ধে আমার মত বিশ্বাস করিবে কিনা, তোমার কথাতেই প্রকাশ করিতেছি, "বাপের মুখে ছেলের সুখ্যাতি শুনে কাজ নাই—।" আমার যথার্থ মত, এমন মধুর গল্প অনেকদিন পড়ি নাই।......অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই, লোকের দোষ দেখানো, সংসারের দুঃখের দিক্‌টা তুলিয়া ধরা ইত্যাদি কিছু নেই—শুধু একটি সুন্দর ফুলের মত নির্ম্মল এবং পবিত্র !......আমাকে খুসী করা শক্ত, কিন্তু এমন পেলে আমি আর কিছু চাই না। আমার এত বড় সুখ্যাতিতে হয়ত তুমি একটু সঙ্কুচিত হবে এবং সবাই হয়ত আমার সঙ্গে একমতও হবে না, কিন্তু আমার চেয়ে ভাল সমজদার এখনকার কালে এক রবিবাবু ছাড়া আর কেউ নেই।......এমন গল্প অনেকদিন পড়িনি।...... ... ইতি —শরৎ

সাহিত্য-সাধনার আর একদিক

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পুষ্পের যেমন শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সুগন্ধে, জাতির পরিচয় ঠিক তেমনি তার সাহিত্যে। সাহিত্যের মধ্যে অন্বেষণ করলে যে কোনো জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, রুচি প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকে বলে, সাহিত্য জীবনের প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ সাহিত্য জীবনকে অনুকরণ ক'রে চলে। এটা সাহিত্যের খানিকটা দিকের কথা হ'তে পারে,—কিন্তু সব দিকের কথা নয়। সাহিত্য জীবনকে শুধু অনুকরণই করে না, নূতন ক'রে সৃষ্টিও করে, জাতিকে ভেঙে-চুরে পুনর্গঠিত করে। স্বপ্ন দেখিয়ে রূপায়িত করে। একথার প্রমাণ দিতে গেলে, বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে অনুসন্ধানের জন্য সাগর পারে না গিয়ে বাঙলা সাহিত্য থেকে আনন্দমঠকে দৃষ্টান্তস্বরূপ উপস্থাপিত করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র যখন আনন্দমঠ রচনা করেন, তখন সমগ্র ভারতবর্ষ ইংরাজের অভিভাবকত্বের আওতায় নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন। দু-চার জন দেশনেতা ভিন্ন ভারতবর্ষের জনতা তখন স্বপ্নও দেখ্‌ত না যে, অচির কালের মধ্যে সেই অভিভাবকের সুদৃঢ় কবল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করা সম্ভব হবে, এমন কি মুক্ত করা উচিত হবে, অথবা মুক্ত করবার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু দুর্দমনীয় মুক্তি কামনার যে দুর্মদ বীজ ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আনন্দমঠ ছড়িয়ে দিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই সারা বাংলা দেশে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল আনন্দমঠের রুধিরস্রাবী অভিনয়। সেই অভিনয়ের পরিণতি হচ্ছে আমাদের এই বর্তমান স্বাধীনতা। আনন্দমঠ আমাদিগকে জুগিয়েছিল স্বাধীনতা স্বপ্নের জাতীয় সঙ্গীত, আর স্বাধীনতা অর্জনের মৃত্যু বিজয়ী মন্ত্র, বন্দেমাতরম্।

আমি আজ একান্ত মনে কামনা করি, বহু দুঃখে বহু কষ্টে, বহু কারাবরণে আর বহু রক্তক্ষয়ের ফলে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, আমাদের সাহিত্য সাধনা যেন সেই স্বাধীনতার রক্ষণাবেক্ষণের সহায়ক হয়। সাম্প্রদায়িকতাকে বিনষ্ট ক'রে, প্রাদেশিকতাকে দলিত ক'রে, সকল প্রকার ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে একটি সব ভারতীয় সুর আমাদের সকলের কল্যাণে জাগ্রত করতে হবে।

পৃথিবীর মেরুদণ্ড একটি, মানুষের কিন্তু দুটি। একটি তার দেহের, অপরটি জীবনের। দেহের মেরুদণ্ডকে চলিত ভাষায় বলে শিরদাঁড়া, জীবনের মেরুদণ্ডের নাম চরিত্র।

উভয় মেরুদণ্ডের কাজ কিন্তু একই খাড়া রাখা। শিরদাঁড়া খাড়া রাখে দেহকে, চরিত্র জীবনকে।

দেহের মেরুদণ্ডের মত জীবনের মেরুদণ্ডেরও ব্যাধি আছে। দেহের মেরুদণ্ডে যখন ঘুণ ধরে, ক্ষয় রোগের কীটাণু যখন তাঁকে ঝাঁঝরা করে দেয়, তখন দেহ অবনত হয়ে পড়ে, তখন আর তার খাড়া হয়ে চলবার শক্তি থাকে না। মানুষের জীবনও অবনত হয়ে পড়ে যখন তার চরিত্রে ঘুণ ধরে, অপকর্ষের দুষ্ট কীটাণু তার চরিত্রকে সহস্র ছিদ্রে জীর্ণ করে দেয়। তখন শিথিল হয়ে যায় তার মনুষ্যত্ব, তার পৌরুষ, তখন তাকে পরিত্যাগ করতে থাকে তার বলিষ্ঠতা, সততা, সত্যপরায়ণতা, সৎসাহস।

বাঙ্গালীর কথায়—উপেন্দ্রনাথ

গল্প-ভারতী সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ "মাটির পথ" উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত

উপেন্দ্রনাথের উনঅশীতিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসব। সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও প্রধান অতিথি উপেন্দ্র-জায়া বিভাবতী দেবী।

॥ বাংলার চিত্রশিল্প ॥
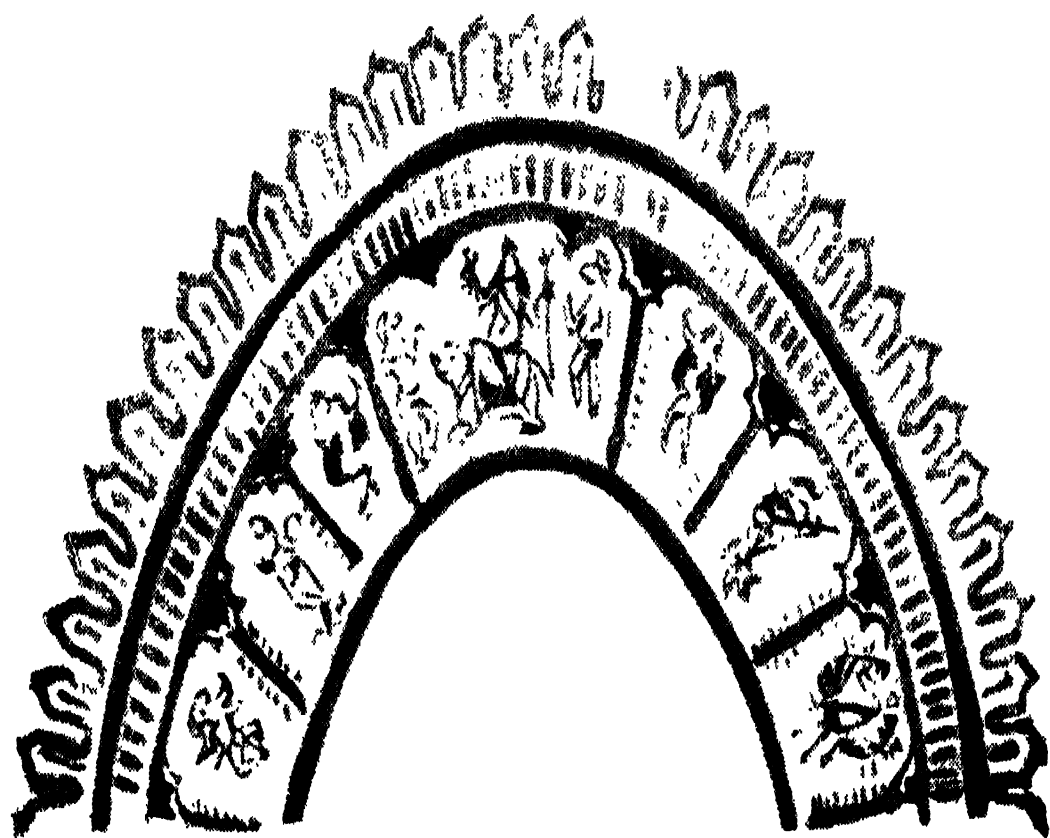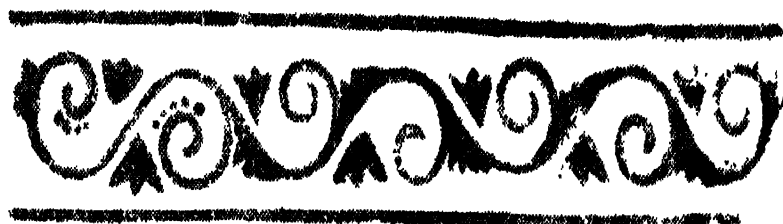
শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু

শ্রীকালিদাস নাগ

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র ও ছাত্রীরা মিলে যখন নন্দলাল চিত্রাবলীর এলবাম প্রকাশ করেন তখন তাঁর শিল্প নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলাম ; কিন্তু তাঁর অন্যান্য বিক্ষিপ্ত স্কেচগুলির সন্ধান না হলে তাঁর Style নিয়ে শেষ কথা বলা সম্ভব হবেনা। কলেজে পড়া ছেলে নন্দলাল যখন তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের সাকরেদী সুরু করেন তখন বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতা প্রবাসী ও মর্ডান রিভিউ পত্রিকায় Tagore School নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করছেন। (১৯০২—১৯০৮) নন্দলালের 'সতী' চিত্রখানি সবাইকে এমন মুগ্ধ করেছিল যে অবনীন্দ্র-বন্ধু Justice Woodroff তার সার্থক প্রতিলিপি প্রকাশ করেন জাপানের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা Kokka-তে। সে প্রতিলিপি আমি দেখেছি।

ইতিমধ্যে Lady Herringham এলেন অজন্তার চিত্রাবলীর কপি নিতে এবং নিবেদিতা তাঁর সেই কার্য্যোদ্ধারের জন্য শিল্পী নন্দলালকে পাঠালেন। সেই বৌদ্ধগুহার শিল্প তপস্যা সেরে যখন তিনি ফিরলেন তখন যেন নতুন মানুষ। বুদ্ধ জাতক ও মূর্ত্তি তিনি ত অনেক এঁকেছেন এবার জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে (১৯০৭—১৭) বসু বিজ্ঞান মন্দিরের জন্য রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ রেখায় ও রঙে জীবন্ত করে তুললেন।

এই সময় গুরুদেব ডেকে নিলেন তাঁর শান্তিনিকেতনে কলাভবন গড়ে তোলবার জন্য। সেখানে তাঁর সতীর্থ অসিত হালদার আগেই শিল্প চর্চ্চা সুরু করেন। সাঁওতালী গ্রামের ছেলে মেয়ে ও চালাঘরের নিপুণ চিত্র যেন পৌরাণিক যুগের রাজা রাণীদের পিছনে ফেলে স্বকীয় রেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভারতীয় শিল্পে গণতন্ত্রের যুগসন্ধিতে শঙ্খধ্বনি করলেন নন্দলাল বসু। তাঁর উপযুক্ত শিষ্য মুকুল দে ও রমেন চক্রবর্ত্তী। ১৯১৬—১৭ থেকে ১৯২৪—২৫ পর্য্যন্ত নন্দলাল শুধু ভারতে নয় আমাদের বিশ্বভারতী মিশনের সার্থক শিল্পীরূপে দেশ-বিদেশের শিল্প-বিকাশ দেখে আধুনিক ভারতীয় শিল্পে এক নব জাগরণের সূচনা করলেন।

কালীঘাটের পট থেকে সুরু করে রাজস্থানী রীতি ও জয়পুরের ভিত্তিচিত্র (Murals) তিনি আয়ত্ত করলেন। বোলপুরে চীনা-ভবনের দেওয়ালে তিনি আঁকলেন রাজস্থানী রীতি ও জয়পুরের ভিত্তি চিত্র এই দুই বিরাট শিল্পধারার মিলন সাধন করে।

নন্দলালের উপযুক্ত পুত্র বিশ্বরূপ বসু—এখন কলাভবনের অধ্যক্ষ পদে বসেছেন দেখে আমরা গভীর আনন্দ পেয়েছি। আশা করি তাঁর সাধনাও সার্থক হবে আর এক নূতন শিল্পশৈলী গঠন করে। বোলপুরের কলাভবন যেন বিশ্বভারতীর উপযুক্ত নব নব শিল্প ধারার প্রবাহ বইয়ে জনচিত্তকে উর্ব্বরা করে—এই আমাদের প্রার্থনা। সেদিন ৭ই পৌষের উৎসবে বন্ধু নন্দলাল বসুকে অভিনন্দন জানিয়ে এ সব কথা বলেছি। শিল্পের আদি গঙ্গা আমাদের এই বাংলা—এই বাংলার চিত্র-শিল্প কোন রূপসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে "অরূপ রতনের সন্ধান" দেয় তারই জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি।

আশীর্ব্বাদ

[পঞ্চাশ বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীর্ভাষণ।]

নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা,
জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা।
অঞ্জন সে কী মধুরাতে
লাগালো কে যে নয়নপাতে
সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা॥

এনেছে তব জন্মডালা অজর ফুলরাজি,
রূপের লীলা-লিখন ভরা পারিজাতের সাজি।
অপ্সরীর নৃত্যগুলি
তুলির মুখে এনেছ তুলি',
রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সুরে বাজি'॥

যে মায়াবিনী আলিম্পনা সবুজে নীলে লালে
কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে,
মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে
রঙিন উপহাসি যে হাসে
রং-জাগানো সোনার কাঠি সেই ছোঁয়ালো ভালে॥

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত,
তুমিও তা'রে ইশারা দাও আপন মনোমত।
বিধির সাথে কেমন ছলে
নীরবতর আলাপ চলে,
সৃষ্টি বুঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত॥

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়,
ধূপছায়ার চপল মায়া করেছ তুমি জয়।
তব আঁকন-পটের 'পরে
জানি গো চিরদিনের তরে
নটরাজের জটার রেখা জড়িত হ'য়ে রয়॥

চির-বালক ভুবন ছবি আঁকিয়া খেলা করে।
তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে।
তোমার সেই তরুণতাকে
বয়স দিয়ে কভু কি ঢাকে,
অসীম পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা 'পরে॥

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে,
নব বালক জন্ম নেবে নূতন আলোকেতে।
ভাবনা তা'র ভাষায় ডোবা,—
মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা
দেখাও তা'রে ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মানুষ নন্দলাল

শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের শিল্পকলার নবজাগরণের ইতিহাসে পথিকৃৎ এবং গুরু অবনীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর প্রধান উত্তর সাধক এবং শিষ্য নন্দলালের নাম আজ স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে তাঁর স্থান আজ সুনির্দিষ্ট। 'রূপের পাত্রে রূপাতীত রস' পরিবেশনে সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনি, রঙ এবং রেখার ইন্দ্রজালে ভারতবর্ষের মানুষের এবং প্রকৃতির অতীতের এবং বর্তমানের ঐশ্বর্যকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষীভূত ক'রে দেশে বিদেশে রসিকজনের চিত্তজয় করেছেন তিনি। দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন এবং আঁকছেন, অনেক শৈলীর অঙ্কনভঙ্গী, অনেক জাতীয় বিষয়বস্তু এবং উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন এবং দিয়েছেন। বলাবাহুল্য সে সব নিয়ে—তাঁর শিল্প কীর্তির গুণাগুণ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবার যোগ্যতা আমার নেই। তাঁর অনেক শিষ্য আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নানা শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছেন বা স্বাধীন ভাবে ছবি আঁকছেন এবং মূর্তি গড়ছেন; শিল্পী নন্দলাল বসুর রূপসাধনার, কলাভবনের আচার্য নন্দলাল বসুর শিক্ষাদান পদ্ধতির এবং ভারতীয় অলঙ্করণ শিল্পের নবজন্মদাতা নন্দলাল বসুর সৃষ্টি প্রেরনার ইতিহাস বর্ণনার ভার তাঁদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমি আজ 'মানুষ নন্দলাল বসুর' সম্বন্ধে কেবল দু'চার কথা ব'লব, যে কথা খুব কাছের মানুষ ছাড়া, কেউ জানে না, অথচ যা জানা দেশবাসীর প্রয়োজন। অনেকেই জানেন না শিল্প সাধনা নন্দলালের জীবন সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ভারত শিল্পের গৌরববৃদ্ধি তাঁর দিবারাত্রির স্বপ্ন, তাঁর আঁকা ছবিগুলি তাঁর ঐকান্তিক স্বদেশ প্রেমের এবং আন্তরিক প্রকৃতি প্রীতির আংশিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র। শিল্পের চেয়ে শিল্পী যে কত বড় তা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে না মিশলে জানা যায় না।

পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তাঁদের শিল্পী জীবনের কোনো যোগ নেই, পারিবারিক জীবনে অসংযম, সামাজিক জীবনে লোভ, ভয়, বন্ধুবিদ্বেষ প্রভৃতি তাঁদের মনুষ্যত্বকে কলুষিত করেছে, কামনার কালীদহে রূপের পদ্ম তুলতে নেমে অনেকেই পাঁকের মধ্যে তলিয়ে গেছেন, কেউ কেউ আবার সেই পঙ্কতিলক ললাটে ধারণ করতে গৌরব বোধ করেছেন। শিল্পী নন্দলাল বসু এর আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এমন একটি শুচিশুদ্ধ নির্লোভ নিরহঙ্কার জীবন আধুনিক কালে বিদগ্ধ সমাজে বেশী দেখা যায় না। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, অর্থাভাবে চিরদিন কষ্ট পেয়েছেন অথচ অর্থের জন্য আত্মসম্মান বিক্রয় করেননি কোনোদিন। বন্ধুরা, ছাত্রেরা উচ্চপদ এবং রাজসম্মান নিয়ে সরে গেছেন, তিনি নীরবে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে চলেছেন। পারিবারিক জীবনে তিনি একনিষ্ঠ স্বামী, স্নেহময় পিতা, সামাজিক জীবনে তিনি আদর্শগুরু, অকৃত্রিম বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ সদালাপী বয়স্য। সভায় তিনি সকলের পিছনে লুকিয়ে বসেন, যেখানে নিজের লোকের চক্ষে পড়বার বা সম্মান লাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা আছে সেখানে তিনি পারতপক্ষে যান না। আবার বিপদের দিনে প্রয়োজনের ক্ষণে তিনি সবার আগে আগে পথ দেখিয়ে চলেন। ছাত্রদের নিয়ে সভা সাজান তিনি, নাট্যমঞ্চ সাজান তিনি, কিন্তু তারপর আর তাঁর সাক্ষাৎ মেলে না। বিপন্ন বন্ধুকে, শিষ্যকে, পরলোকগত সতীর্থের বিপন্ন পরিবারকে অর্থ সাহায্য করেন, আশপাশের গ্রামের দরিদ্র সাঁওতাল, ডোম, বাউরি, প্রতিবেশীদের দাস দাসী তাঁর কাছে বিনামূল্যে ওষুধ নিয়ে যায়। নিজে যেখানে কারো সেবার দায়িত্ব নিতে পারেন না, সেখানে শিষ্য বা বন্ধুদের উৎসাহ দিয়ে কাজে লাগান, উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেন। ছাত্র বিহার ভূমিকম্পের সেবাকার্যে গিয়ে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে, এক কথায় একশ' টাকা পাঠিয়েছেন মণিঅর্ডারে, তখন তাঁর নিজের বেতন মাত্র দু'শ টাকা। দুর্ভিক্ষে বন্যায় মহামারীতে সর্বত্র কল্যাণের কাজে গুরুর আশীর্বাদ এবং উপদেশ শক্তি যুগিয়েছে ছাত্রকে। সাঁওতাল গ্রামে

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর
চিত্রাবলী

১৪, ২, ৬১ তারিখে অঙ্কিত
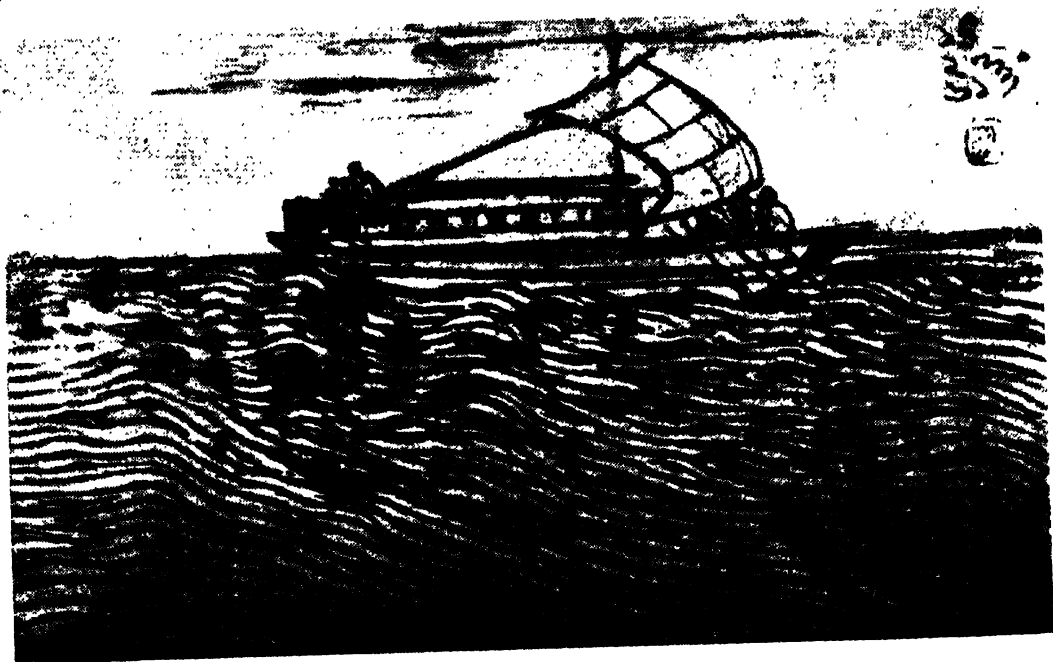
শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রাবলী

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত পুস্তক 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' হইতে গৃহীত

গল্প-ভারতীর "বাংলার চিত্র-শিল্প সংযোজন" সম্পর্কে আমাদের সহকারী সম্পাদক শ্রীকল্যাণ রায় সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ও তাঁর পুত্র শ্রীবিশ্বরূপ বসু—বিশ্বভারতীর কলাভবনের বর্তমান অধ্যক্ষ, উভয়েই এতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও শিল্পাচার্য গল্প-ভারতীতে প্রকাশের জন্যে তাঁর কয়েকখানি ছবি নির্বাচন করে দেন এবং একখানি ছবি সাগ্রহে এঁকেও দেন।

গল্প-ভারতীর প্রতি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর এই অনুরাগের জন্যে আমরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং তাঁকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রাবলী

গরীব দোগ্‌লা মাঝি মেনিঞ্জাইটিসে আক্রান্ত, ডাক্তারেরা হাল ছেড়েছেন। মাস্টার মশাই দুশ্চিন্তায় আকুল, দুটি ছাত্রকে পাঠালেন বায়োকেমিক ওষুধের বাক্স, পথ্য, স্টোভ, গরম জলের ব্যাগ প্রভৃতি সঙ্গে দিয়ে; তারা দু'দিন দু'রাত অক্লান্ত সেবায় এবং চিকিৎসায় বেচারাকে বাঁচিয়ে তুলল। বুধবারের মন্দিরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ধর্মব্যাখ্যা করছেন, আশ্রম বাসী স্ত্রী পুরুষ শিক্ষক ছাত্র নিঃশব্দে শুনছে তন্ময় হ'য়ে, হঠাৎ ঢং ঢং ক'রে বিপদ সূচক ঘণ্টা বেজে উঠল, কাছেই কোথায় আগুন লেগেছে নিশ্চয়। সকলেরই মন চঞ্চল, কিন্তু কেউ উঠতে সাহস করছেনা, পাছে উঠে গেলে মন্দিরের শান্তি ভঙ্গ হয়, গুরুদেবের প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। সবার আগে উঠে পড়লেন নন্দলাল, তাঁর দেখাদেখি শিক্ষক ও ছাত্রের দল ঘর খালি ক'রে বেরিয়ে পড়ল। ভুবন ডাঙায় আগুন লেগেছিল, তালপুকুর থেকে এবং বিভিন্ন কুয়া থেকে সারি দিয়ে ছেলে মেয়েরা দাঁড়াল, হাতে হাতে ভর্তি বালতি এবং কলসীতে জল যেতে লাগল অগ্নিনির্বাণের কাজে, খালি কলসী এবং বালতি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে হাতে ফিরে আসতে লাগল। মাস্টার মশাই তখন আগুনের কেন্দ্রস্থলে; কখনও চালায় উঠে জ্বলন্ত বাঁশ কাটছেন, খড় ছড়িয়ে ফেলছেন, কখনও আশপাশের বাড়ীর খড়ের চালে ভিজে কাঁথা কম্বল চাপাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আগুন নিভল, আমরা সবাই কৃতিত্বের গর্বে উচ্ছ্বসিত, মাস্টার মশাইকে আর দেখা গেলনা। আর একদিনের কথা চির জীবন আমার মনে থাকবে। মন্দিরে সেদিন শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই উপাসনা করছেন। মন্ত্র পাঠ এবং সঙ্গীতের পর ভাষণ আরম্ভ হওয়ার আগে যথারীতি শিশু বিভাগের ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মন্দিরের বাইরে কাঁটাল গাছে ছিল একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ী মৌমাছির চাক, একটি দুষ্টু ছেলে তাতে কখন এসে খেলার ছলে ঢিল মেরেছে। হঠাৎ শোনা গেল একটা আর্ত চীৎকার, দেখা গেল বন্ধ জানালার ফুটো দিয়ে আসা সূর্য কিরণ রেখার মতো একটা ক্রমস্ফীত কালোরেখা এসে পড়েছে কাঁটাল গাছ থেকে ছেলেটির উপর, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করছে। এদিনও সবার আগে উঠে ছুটে গেলেন আমাদের মাস্টারমশাই, নন্দলাল বাবু; আমরা অনেকেই তাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে পড়লুম মন্দির থেকে। নিমেষমধ্যে ছেলেটাকে পাঁজা কোলা করে বুকের উপর তুলে নিলেন তিনি, তারপর ছুটলেন আমাদের পুরাণো অতিথিশালা অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের সব চেয়ে প্রাচীন দোতলা বাড়ীটির দিকে। চোখের উপর দেখলুম মৌমাছির ঝাঁক নামল তাঁর উপর, ক্রুদ্ধ পতঙ্গের আস্তরণে তাঁর সাদা পাঞ্জাবীটা চোখের ওপর কালো কোটে পরিণত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে অতিথিশালার দ্বার পথে তিনি অদৃশ্য হলেন, তাঁর পিছনে গেলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আর্যনায়কম। আর কেউ কাছে যাবার আগেই অতিথিশালার অধ্যক্ষ নিচের তলার সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমাদের তখন শোচনীয় অবস্থা, প্রত্যেকের হাতে পায়ে মুখে নাকে ঝাঁকে ঝাঁকে জীবন্ত বুলেট এসে পড়ছে, জামার কাপড়ে ঢুকছে, যেখানে বসছে সেখান থেকে আর উঠছে না। বিষের জ্বালায় সর্বাঙ্গ জ্বলছে, নিজের যন্ত্রণায় অন্যের কথা মনে নেই কারও। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যে যেদিকে পারে ছুটেছে, কেউ লাফাচ্ছে, কেউ কাঁদছে। দোতলার জানালা দিয়ে মৌমাছির দল ঢুকছিল বলে সেগুলিও বন্ধ হয়ে গেছে। বহু আবেদন নিবেদনে এক বিদেশী অতিথি পিছন দিকের দরজা খুলে আমাদের কয়েকজনকে ঢুকতে দিলেন। দোতলায় গিয়ে দেখি অচৈতন্য ছেলেটিকে তোষক চাপা দিয়ে রেখে মাস্টার মশাই এবং আরিয়ামদা ঝাঁটা দিয়ে পিটিয়ে পরস্পরের গায়ের মৌমাছি মারছেন। অবস্থা আরও খানিকটা শান্ত হ'তে আরও অনেকে এলো। মাস্টার মশায়ের পা এবং মাথা থেকে মৌরির মতো বড়ো হুল ঠোঙা ভর্তি করে খুঁটে তোলা হ'ল। তারপর প্রবল জ্বর, দারুণ ব্যথা। জিজ্ঞেস করলুম, "আমরা তো পারলুম না, আপনি পারলেন কি ক'রে?" বললেন, "না পেরে যে উপায় ছিল না। খড়্গপুরে দেখেছি রাস্তা দিয়ে একজন ঘোড় সওয়ার যাচ্ছিল, একটা দুষ্টু ছেলে মৌচাকে ঢিল মেরে সরে পড়ল, মানুষটা ঘোড়াশুদ্ধ ছটফট করে মরে গেল মৌমাছির কামড়ে। ছেলেটাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে হবে এই কথাই কেবল মনে ছিল, নিজের কথা কি মনে ছিল তখন!" অপরকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছেন একথা কজন ভুলতে পারে? যাঁরা পারেন তাঁদের আদর্শই আজ দুর্ভাগা দেশের ঘনায়মান অন্ধকারে আমাদের ধ্রুবতারা।

শুধু ওদিনে নয়, প্রতিদিনের জীবনেও নিজেকে ভুলে থাকা নন্দলালের বৈশিষ্ট্য। বন-ভোজনে বা দেশ ভ্রমণে গিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে কাঠ কাটতে, জল তুলতে, বাসন মাজতে তাঁর আলস্য দেখা যেতনা, আহারে শয়নে কোনো বিশেষ ব্যবস্থা তাঁর জন্য হবার উপায় ছিল না। ৭ই পৌষের মেলায় উৎসব প্রাঙ্গণ সাজাতেনও তিনি, আবার আশ্রম পরিষ্করণের ভার নিতেন তিনি, মাথায় গামছা বেঁধে ঝুড়ি কোদাল আচড়া নিয়ে পথে পথে যখন তিনি ছাত্রদের নিয়ে ঘুরতেন জঞ্জাল সাফ ক'রে তখন কার সাধ্য বলবে তিনি আশ্রমের মধ্যমণি ভারত-বিখ্যাত শিল্পী। সমাজের সবার নিচের তলায় যারা বাস করে তাদের সমবেদনা তাঁর অকৃত্রিম, তাদের দুঃখের ভাগ নিতে, তাদের নিরানন্দ গৃহে আনন্দ বিতরণ করতে তিনি সতত উৎসুক। গরীব মানুষ সস্তায় কিনতে পারবে বলে তিনি এক সময়ে দু'চার পয়সা দামে পট এঁকে বিক্রি করেছেন, কার্ডে ছবি এঁকে বিক্রি করেছেন মেলার সময়। তাঁর বেশে বাসে, গৃহ-সজ্জায় তাঁর মত সর্বজনমান্য শিল্পীর উপযুক্ত আভিজাত্যের কোনো নিদর্শন আজও দেখা যায় না। মহাত্মাজীর আহ্বানে কংগ্রেসের অধিবেশনস্থল সাজাতে গিয়ে তিনি বাঁশের খড়ের তোরণ নির্মাণ প্রবর্তন করেছেন, গরুরগাড়ীকে অলঙ্কৃত করে সভাপতির রথ বানিয়েছেন। অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিস দিয়ে কি সুন্দর প্রসাধন হতে পারে তা তিনি শুধু মুখে ব'লে নয়—কাজে ক'রে দেখিয়েছেন। ছবির বিষয়বস্তু নির্বাচনে প্রথম জীবনে পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকা তাঁর প্রিয় ছিল, পরবর্তী জীবনে অর্জুন, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান প্রভৃতির সঙ্গে সাঁওতালদের ছবি, ছাগল, মোরগ, শালিখ, ফড়িংয়ের ছবি এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য তিনি অজস্র এঁকেছেন সমান আনন্দে, আজও এঁকে চলেছেন অনলস নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে। টিনের টবে ফুল গাছ রেখে, কাঁচের গ্লাসে ফুল সাজিয়ে, ধুতির ওপর কোট পরে আমরা যে রুচিহীনতার পরিচয় দিই তাতে তাঁর দৃষ্টি পীড়িত হয়। ভারতবর্ষের মানুষ উপকরণের দৈন্য সত্ত্বেও সৌন্দর্যের পূজা করতে জানত, আজ ভুলে যেতে বসেছে, তাই তার দারিদ্র্যে হীনতাবোধ এসেছে। মাস্টার মশাইএর ব্রত এই হীনতা থেকে দারিদ্র্যকে মুক্তি দেওয়া। ঘরের বাইরে দুটি ফুল গাছ, ঘরের মধ্যে সুবিন্যস্ত দুচারটি আসবাব এবং তৈজস পত্র, ঘরের দেয়ালে বা মেঝেয় একটু আলপনা এতেই গৃহকে সুন্দর করা যায়। লাউয়ের খোলা, নারকেলমালা, বেলের খোলা প্রভৃতি থেকে সুন্দর সুন্দর পাত্র করেছেন তিনি, প্রকৃতি থেকে নব নব রূপ আহরণ করে অলঙ্করণশিল্পকে আলপনা, বাতিক ও ফুলকারীকে নব জীবন দান করেছেন। প্রসাধনের এবং মেয়েদের বেশবাসের সুরুচিসম্মত আদর্শ স্থাপনের জন্য তিনি অনেক পরিশ্রম করেছেন। প্রাক্তন ছাত্রেরা শিক্ষা শেষ করে চাকরীর চেষ্টায় নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে একটি উপনিবেশ স্থাপন করে সংঘবদ্ধ চেষ্টায় দেশের কারুশিল্পের উন্নতিবিধান আর সেই সঙ্গে তাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করার সঙ্কল্প ছিল তাঁর, সেজন্য জনৈক ছাত্রের সহায়তায় জমি কিনে কারু সংঘ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু সম্পাদক স্থান ত্যাগ করায় ও অন্য সদস্যেরা বেশী দিন অল্প আয়ে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে একে একে অন্যত্র চাকরী নিয়ে চলে যেতে থাকায় বৎসর খানেক পরেই কারু সংঘ ভেঙে যায়।

গুরু অবনীন্দ্রনাথের মুখে শুনেছি, প্রথম পরিচয়ে তিনি নন্দলালকে কিছু ছবি এঁকে এনে দেখাতে ব'ললে, নন্দলাল এঁকে এনেছিলেন ক্ষুদিরামের ফাঁসিরদৃশ্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য ফাঁসি যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর নিজের হয়নি, সেজন্য যে কেউ স্বাধীনতাযুদ্ধে মৃত্যুপণ ক'রে এগিয়ে যেত তাকেই তিনি আপনজন ব'লে জ্ঞান করতেন। প্রথম যৌবনে ভগিনী নিবেদিতার স্নেহলাভ করেছিলেন তিনি, বিপ্লবী দলের অনেকের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। অল্প বয়সে গুরুজনেরা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, সংসারের দায়িত্ব পড়ে ছিল ঘাড়ে এবং সে দায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, সেই সঙ্গে সৌন্দর্যের সাধনা—তাঁর জীবনের ব্রতরূপে ছিল চোখের সামনে, তাই বোমা বন্দুক নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারেননি তিনি, কিন্তু বিবেকানন্দ এবং নিবেদিতা, অরবিন্দ এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা তার জীবনে ব্যর্থ হয়নি। দেশের অতীতকে, দেশের মানুষকে, মাটিকে তিনি সমস্ত-অন্তর দিয়ে ভালো বেসেছিলেন, বিদেশীর শাসন এবং শোষণ জ্বালা ধরিয়ে ছিল তাঁর দেহে মনে। সেইজন্যেই করতলগত সরকারী চাকরী তিনি উপেক্ষা করে পড়ে থেকেছেন অভাবের মধ্যে। বলতে বাধা নেই নিজেদের রঙ ময়লা হলেও ফরসা রঙের প্রতি আমাদের সকলেরই পক্ষপাত আছে, সচেতন বা অবচেতন মনে নিজেদের মালিন্যের জন্য একটু কুণ্ঠাবোধ আছে, এই প্রথম একটি মানুষকে

দেখলুম যে নিজের কালো রঙের জন্য গর্বিত, সাদা চামড়া দেখলে যার নাকি রক্ত গরম হয়ে ওঠে। পরিহাসচ্ছলে বলতেন, "ঈশ্বর তার রঙের বাক্স খানি উজাড় করে ফেলেছেন আমাদের গায়ে, ওদের ভাগ্যে কিছু জোটেনি তাই সাদাই রয়ে গেছে ওরা।" বলতেন "আমাদের দেশের মানুষ কালো, দেশের দেবতা কালো (কৃষ্ণ, কালি), দেশের মাটি কালো, কটা রঙ এখানে মানায় না।" মহাত্মাজী যখন স্বদেশের মুক্তিসাধনায় নূতন পথের সন্ধান দিলেন তখন মাস্টার মশায় সে পথের পথিক না হয়েও যারা পথে বেরিয়েছে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। বিদেশী বর্জন করেছেন এবং করিয়েছেন, সুতো কেটেছেন এবং কাটিয়েছেন, দেশী রঙে ছবি এঁকেছেন এবং আঁকিয়েছেন। বন্ধু এবং শিষ্য আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, তিনি দিনের পর দিন সত্যাগ্রহ শিবিরে গেছেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে, সোদপুর আশ্রমে গেছেন, আলিপুর জেলে গেছেন মিষ্টান্ন নিয়ে। মতিঝবাগানে নিষ্ঠুর অত্যাচার চলেছে মাষ্টার মশায় বড়ো বড়ো পোষ্টার এঁকে দিয়েছেন আমাদের সেগুলি লিনোতে কেটে হাতে ছেপে আমরা নগরে গ্রামে দেয়ালে দেয়ালে এঁটে এসেছি। কলকাতা কংগ্রেসের সময় তাঁর 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' প্রচারিত হয়েছিল দু' রঙে ছেপে, মানুষের মাথা দিয়ে গড়া তাতে দুদিক থেকে দু'জন মেয়ে পুরুষ হাত বাড়িয়ে একটা পতাকা তুলে ধরেছে আর মাঝখানে একটা শিশু পতকাদণ্ডটা ধরে আছে। আর একটা বিরাট পোষ্টার ছিল 'লাগ লাগ ভেল্‌কীলাগ'। ছবি মাঝখানে জন বুল দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে ডুগডুগি বাজাচ্ছে, আর এক হাতে চাবুক ঘোরাচ্ছে, ছবির উপরে নিচে দুটি করে এবং দুপাশে দু'টি মোট ছ'টি বৃত্তের মধ্যে ইংরেজের ভেদনীতির ছ'টি দৃশ্য : যথা হিন্দু সৈনিক পেশোয়ারীদের উপর গুলি চালাচ্ছে, মন্দিরের দরজায় গরুর মাথা রাখা, মসজিদের চূড়োয় শুয়ারের মাথা আটকানো, হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে ছুরি ও লাঠি মারছে ইত্যাদি। 'ইণ্ডিয়াজ ফষ্টার মাদার', নামক আর একটি পোষ্টারে মোটাসোটা এক ইংরেজ নার্স মুখ বেঁকিয়ে বলছে 'আনগ্রেটফুল বীষ্ট'। তার পায়ের কাছে একটা বেতের ঝুড়িতে রোগা ছেলে ভারতবর্ষ হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছে, কারণ তার মুখে ফীডিং বট্‌লের উল্টো দিকটা ধরিয়ে দিয়ে সামনের দিকে লম্বা নল লাগিয়ে চুষে খাচ্ছে তার ধাত্রী। সামনে তাকের ওপর আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেলগাড়ী এই রকম টুকি টাকি খেলনা সাজানো। আর একখানা পোষ্টারে মহাত্মাজী একটা দুর্গের উপরে দাঁড়িয়ে, হাত নেড়ে বলছেন ফিরে যেতে, দুর্গের নিচে সমুদ্র, তাতে ইংরেজ পিঠে পণ্যদ্রব্যের বোঝা বেঁধে সাঁতরে আসতে আসতে ডুবে মরবার উপক্রম করছে। এই রকম অনেক ছবিই তিনি এঁকে দিয়েছিলেন, আজ তাদের চিহ্নমাত্রও নেই, (যদি কারও কাছে কিছু থাকে তবে সন্ধান পেলে কৃতজ্ঞ থাকব) যাঁরা সে সব ছবি দেখেছেন তাঁদের শতকরা নিরানব্বইজন জানতেন না চিত্রকরের নাম, আজও অনেকে জানেননা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সঙ্গে শিল্পাচার্যের এই সহযোগিতার কথা। আজ স্বাধীন ভারতে মাস্টার মশাই দেশনেতাদের স্বীকৃতি পেয়েছেন, সম্মান পেয়েছেন। আজ তাঁর বহু শিষ্য, বহু ভক্ত। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম চিত্রশিল্পী এবং শিল্পাচার্য নন্দলাল কিন্তু আজও কালি এবং তুলি ছাড়েন নি, প্রতিদিন একখানি ছবি কালির আঁচড়ে না আঁকলে তাঁর তৃপ্তি হয় না। আজও তাঁর মনে ক্ষোভ আছে আধুনিক শিল্পীরা এমন কি তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও প্রতিভাবান কেউ কেউ ভারতবর্ষের অতীতের শিল্পৈশ্বর্যের মহিমা উপলব্ধি করল না, বিদেশীর কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করতে লজ্জাবোধ ক'রল না। বিদেশীর কাছে পাঠ নিতে তাঁর দ্বিধা কোনদিন ছিল না, জাপানী ছবির, ইয়োরোপের ছবির মাহাত্ম্য তিনি বোঝেন, সব দেশের ভালো ছবি দেখে তিনি আনন্দ পান, প্রয়োজন মতো তাঁদের শিক্ষা নিজের ছবিতে কাজে লাগান, কিন্তু ভারতীয় শিল্পী ভারতীয় পদ্ধতি ছেড়ে বিদেশী কোনো 'ইজ্‌ম্'এর দাসত্ব করবে এ তিনি আজও সমর্থন করতে পারেন না। তাঁর মত ভারতপথিক কবীরের মত, বন্ধুর মতো সবার সঙ্গে মিশবে সবার কথা মেনে নেবে, গুণ স্বীকার করবে, কিন্তু নিজের আসনে স্থির থাকবে। প্রৌঢ় বয়সে তিনি আমাদের মডেলিং ক্লাসে যোগ দিয়েছেন, অয়েল পেন্টিংএ হাত দিয়েছেন, তা থেকে যেটুকু জানবার জেনে নিয়ে নিঃশব্দে নিজের পথে ফিরে গেছেন। তাঁর মতে ছবিটা কোন্ ধারায় আঁকা হ'ল সেটা বড়ো কথা নয়, ছবিটা ছবি হ'ল কিনা সেইটেই আসল কথা। আজ এ কথাটা অনেক শিল্পীই ভুলতে বসেছেন ; তাই প্রবীণ শিল্পগুরুর এই অন্তরের কথাটা তাঁদের জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।
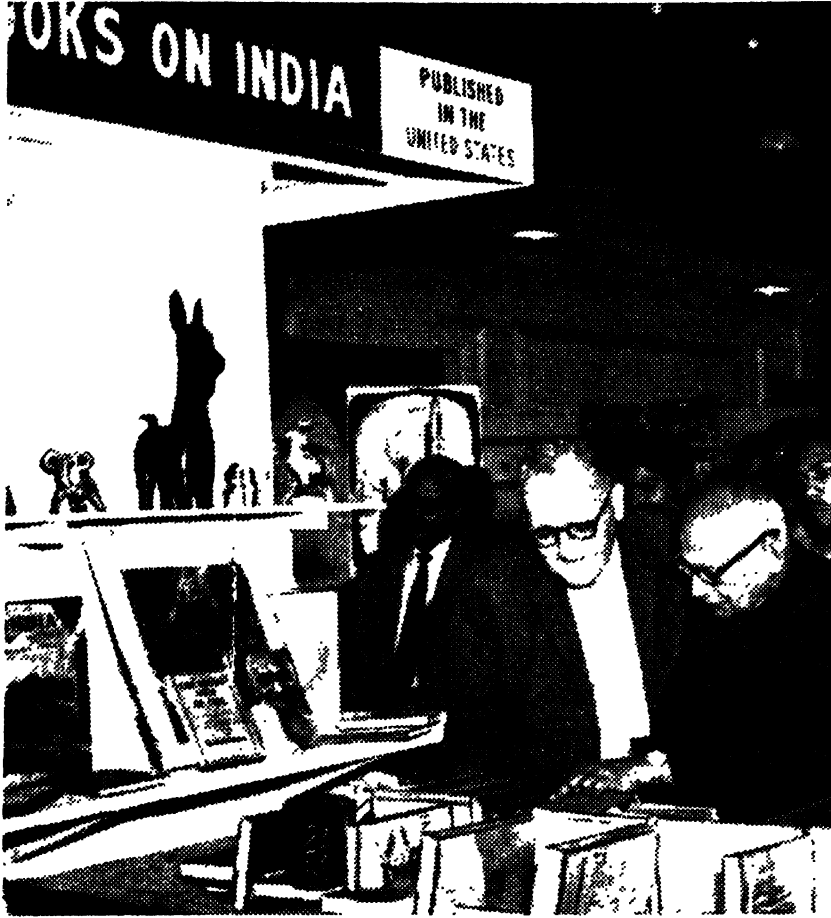
কলকাতায় আমেরিকান পুস্তক প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত আমেরিকান পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতি ডক্টর কালিদাস নাগ ও ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশ্যান সার্ভিসের আর্থার সি ব্যাটলেটকে দেখা যাচ্ছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্ঞান প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়েই সম্প্রতি কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে 'আমেরিকান গ্রন্থের মেলা' নামে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ৪ঠা থেকে ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন গল্প-ভারতী সম্পাদক ডক্টর কালিদাস নাগ।

প্রদর্শনীতে শিশুপাঠ্য বিষয় থেকে সুরু করে দুরূহ বিষয় পর্য্যন্ত প্রায় ৫ হাজার বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ প্রদর্শিত হয়েছিল। বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চ্চায় আমেরিকান জনসাধারণের সুতীব্র আগ্রহ আমেরিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে প্রদর্শণের ব্যবস্থা করা হয়।

বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তকাদি ছাড়াও সাময়িক পত্রিকা, আমেরিকান রঙীন চিত্রের প্রতিলিপি, যুক্তরাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আলোকচিত্র প্রভৃতি ও এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়।

আমেরিকায় ভারত সম্পর্কিত গ্রন্থাদি নামে বিশেষ একটি বিভাগে প্রায় দুইশত বই প্রদর্শিত হয়।

সবচেয়ে আকর্ষনীয় বিভাগ ছিল "আমেরিকায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।" এই বিভাগে আলোকচিত্র ও রেখাচিত্রের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে আমেরিকার শিল্পী ও ভাস্করদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তা সুন্দরভাবে বোঝানর চেষ্টা করা হয়েছে। এই সব বিষয় ছাড়াও আমেরিকার সাহিত্য, নাটক, লোক-সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সুন্দর ও মনোজ্ঞ আলোচনার ব্যবস্থাও ছিল অনুষ্ঠানকালীন বিভিন্ন দিনের সান্ধ্যবাসরে।

স্বামীজী ও নেতাজী

চিকাগো ধর্মমহাসভা সমাপ্তির পর ভাবাবিষ্ট স্বামীজী

-ভারতী, মাঘ '৬৭

চিকাগো ধর্মমহাসভায় মঞ্চোপরি উপবিষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ

জার্মানীতে নেতাজী

ব্রহ্মদেশের সীমান্তে নেতাজী

বিশ্ব
পুতুল
চিত্র

ট্যাক্স কালেক্টার : এই নিন্! আজ আপনার ট্যাক্স দেওয়ার শেষ তারিখ।

চিত্রশিল্পী : কিন্তু মুদির দেনাটা যে আজ না দিলেই নয়। —পঞ্চাশটা টাকা ধার দেবেন ?

দেশ বিদেশের ব্যঙ্গ চিত্র

মহাভারত শর্মা

কিছুকাল পূর্বে বিলাতের বিখ্যাত পাঞ্চ পত্রিকার সম্পাদক কলিকাতায় এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে মানুষের হাসির উৎস ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। হাসির গল্প এবং ছবির প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে; কিন্তু উহাদের যোগান আর পূর্বের মত নাই। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে হাস্য কৌতুকের পত্রিকা পরিচালনা করিতে রীতিমত অসুবিধা হইতেছে। তিনি অবশ্য মানুষের হাসির উৎস এইভাবে শুষ্ক হওয়ার কারণ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু এ ব্যাপার অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করিবার উপযুক্ত বিষয়। আমাদের দেশে এরূপ ঘটিলে অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করা যাইত। কিন্তু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনীদেশেও এরূপ ঘটিতেছে এবং তাহা নিশ্চয়ই অন্য কারণে।

মানুষ এখন অতিরিক্ত রাজনীতি-সচেতন। তার প্রতিটি কার্যকারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে দেশের রাজনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যহ তার চিন্তা ভাবনা রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই সকল ঘটনা তাহাকে আনন্দিত করেনা; ভীত সন্ত্রস্তকরে। প্রতিদিনের পত্রিকা প্রভাতবেলায় মোটা সরু ছোট বড় নানা হরফে পৃথিবীর সকল দেশের রাজনীতির সংবাদ এবং রাজনৈতিক ঘটনার এমন সব বিবরণ বহন করিয়া আনে যাহা চিত্তকে শান্ত না করিয়া উদ্বেলিত করিয়া তোলে। চিত্ত আনন্দিত না করিয়া অশান্ত করিয়া দেয়। রাজনীতিব চিন্তায় কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে; কিন্তু রাজনীতি মহা উৎসাহে সকলের কথাই ভাবে এবং সর্বদা সকলকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। রাজনীতির এই মাত্রাতিরিক্ত প্রভাব মানুষের হাসির উৎস শুষ্ক করিয়া দিতেছে।

মানুষ মনে মনে অভব্য অসভ্য থাকিলেও বাহ্যতঃ অতিরিক্ত সভ্য হইয়াছে। প্রাণখোলা উচ্চ হাসি এখন আর কাহারও মুখে তেমন দেখা যায় না। কৌতুকের কথা যতই গাঢ় হউক না কেন শ্রোতার ওষ্ঠাধর ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া ক্ষীণ হাসির রেখা চকিতে মিলাইয়া যায়। আসর মাতানো হাসির উচ্চরোল অভব্যতার নিদর্শন মনে করিয়া সকলে সতর্ক থাকেন। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইংরাজলেখক হ্যাজলিট বলিয়াছিলেন যে প্রাণখোলা হাসির জন্য এবং সার্থক রসিকতার জন্য কিছু অভব্যতা এবং গ্রাম্যতা (barbarism and rusticism) প্রয়োজন। সেই অভব্যতা এবং গ্রাম্যতা এখন অভদ্রতা বা অসভ্যতা মনে করিয়া সকলে উহা সযত্নে পরিহার করেন। আমাদের অতিরিক্ত ভদ্রতা নির্মমভাবে মনের উদ্বেলিত আনন্দ ও হাসির নির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছে।

তথাপি হাসির জন্য মানুষ ব্যাকুল। ফরাসী দার্শনিক বের্গস বলিয়াছেন, হাসিতে প্রাণের আনন্দ উথলিয়া উঠে। দুঃখেও হাসি পায়—কিন্তু কেহ সেই হাসির প্রত্যাশী নন। আমরা সকলেই সুন্দর হাসি কামনা করি। ব্যষ্টি ও সমষ্টির বাক্যে ও কর্মে, সাহিত্যে ও চিত্রে যে মার্জিত আনন্দময় হাসি—তাহাই প্রেয়।

বহুর প্রয়োজনে এই মার্জিত আনন্দময় হাসির সার্থক প্রকাশ গল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধে যেমন পাওয়া গিয়াছে তেমন পাওয়া গিয়াছে চিত্রের মাধ্যমে। মানব মনের এই বাঞ্ছিত প্রয়োজন সার্থক করিবার জন্য এ সবের প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া চিত্র, যাহা প্রচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং চিরকাল ব্যবহৃত হইবে। প্রাচীন কালের অর্ধসভ্য মানুষ গুহাগাত্রে সামান্য রেখার স্পষ্ট চিত্র আঁকিয়া ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত করিয়া নিশ্চয় আনন্দের হাসি হাসিয়াছিল। তার পক্ষে একথা কল্পনা করাও সম্ভব ছিল না যে দূর ভবিষ্যতের সুসভ্য মানুষ তার আঁকা ঐ ছবি আদি কার্টুন নামে অভিহিত করিবে। কার্টুনের আদিপর্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিশেষজ্ঞরা এ কথাই বলেন, যে কোন বিশেষ ভাব অথবা ঘটনা—ছোট ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করাই কার্টুন আঁকা; এবং এই ধরণের চিত্র মানুষ প্রাচীন কালে গুহাগাত্রে অংকিত এবং বর্তমানে পত্রিকার পাতায় পাতায় আঁকিতেছে। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, সকল ছোট ছবিই কার্টুন নয়; আর সকল কার্টুনই হাসির উদ্রেক করে না। কার্টুন মানুষকে হাসায়, মানুষের মনে নতুন ভাবনার সঞ্চার করে, গভীর সমবেদনা সৃষ্টি করে। একটি বড় সাহিত্যিক রচনায় যাহা হয় না, একটি বুদ্ধিদীপ্ত কার্টুনে তাহা অপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তৃত হয়।

কার্টুন শব্দটি হাল আমলের। এ শ্রেণীর ছবির নাম পূর্বে ছিল ক্যারিকেচার। কিন্তু চিত্রাঙ্কনে যে ললিতকলা প্রকাশ পায় কার্টুন অপেক্ষা ক্যারিকেচারে তাহার পরিমাণ একটু বেশী। কার্টুন ললিতকলার অন্ত্যজ আত্মীয়। কোন মানুষ বা ঘটনার মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া উহার মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক ভাব ফুটাইয়া তুলিবার দিকেই কার্টুনের অধিক নজর। গভীর সংবেদনার যে কার্টুন তাহার মধ্যেও ব্যঙ্গ থাকে।

কিছুকাল পূর্বে শঙ্করস্ উইক্‌লিতে মুদ্রাস্ফীতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিপদ সম্পর্কে একটি কার্টুন প্রকাশিত হয়। একখানা কাঠের সঙ্গে হাত পা বাধা অবস্থায় একটি লোকের সমস্ত শরীর ক্রমবর্ধমান জলে প্রায় ডুবিয়া যাইতেছে—লোকটি কোন প্রকারে নাক উঁচু করিয়া বাঁচিবার চেষ্টায় ব্যস্ত। ঐ কাষ্ঠখণ্ড তাহার নির্দিষ্ট আয়ের এবং ক্রমবর্ধমান জলরাশি মুদ্রাস্ফীতির প্রতীক। মুদ্রাস্ফীতির জন্য দায়ী পক্ষ ব্যঙ্গের লক্ষ্য, আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতীক হাত পা বাঁধা লোকটি সংবেদনার পাত্র।

গভীর বিদ্বেষ বা ঘৃণা প্রকাশের জন্যও এ শ্রেণীর ছবি বিশেষ উপযোগী। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ তাঁর আমলে গিলারী নামে এক কার্টুনিষ্টের আঁকা ছবির নিন্দা করেন। গিলারী তার উত্তর দেয়, জর্জের নামে নানাপ্রকার কার্টুনের মাধ্যমে। রাজার শিষ্টতা (Royal Affability) নামে একখানা কার্টুনে রাজা তাঁর বেঁটে মোটা বৌকে বগলদাবা করিয়া এক গ্রাম্য শূকর পালককে বলিতেছে, হে হে বন্ধু, তুমি কেমন আছ? তুমি যাচ্ছ কোথায়? তোমার নাম কি? তোমার বাড়ী কোথায়? হে হে।

কার্টুন আঁকিয়া শাসকসম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে শ্রীঘর বাস করিবার সৌভাগ্য হয় ডুমেয়ার নামে এক ফরাসী কার্টুনিষ্টের। ফ্রান্সে তৃতীয় নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর প্যারিসে বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগে দরিদ্র শ্রেণী ধনিকের দ্বারা অত্যাচারিত হইবে এমন আশঙ্কা দেখা দেয়। ডুমেয়ার তখন আঁকিলেন, অস্থিচর্মসার ক'টি লোকের উপরে বসিয়া স্ফীতোদর অপর ক'টি লোক ভূরিভোজনে ব্যস্ত। এই ছবি আঁকার ফলে তিনি জেলে যান।

বিশ্ব ব্যঙ্গ চিত্র এই পর্যায়ে এখন হইতে গল্পভারতীতে নিয়মিত দেশবিদেশের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করা হইবে। সকলপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন প্রকাশের দ্বারা গল্পভারতী রসিক এবং রসজ্ঞ পাঠকবর্গের প্রীতি এবং সন্তোষ বিধান করিতে পারিবে এই ভরসায় নূতন এই বিভাগটির প্রবর্তন করা হইল।
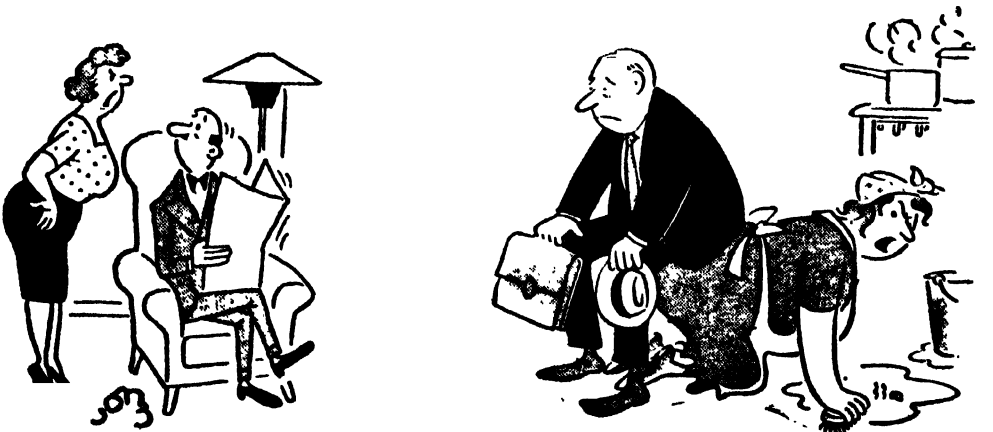
তুমি দেখছি, হাঁ—না করে কিছু বলতেই পারো না!

আরে বলবে তো!!

অতি সাধারণ জীবন যাত্রা !

জোন্স শোন। দুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি স্যুটকেশটা গুছিয়ে দাও।

বেশী কিছু নয়। জামা-কাপড়, ডিনার-জ্যাকেট, ওয়েষ্টকোট, গরমকোট—এই আর কি !

হ্যাঁ, দেখো একটা সার্জের স্যুট, আর একটা আলাদা স্যুটও দিও।

যদি গলফ্ খেলতে হয়, তাই একটা নিকারবোকার স্যুট আর একটা সাদা ফ্লানেলের টেনিস স্যুটও দিও—যদি টেনিস খেলি।

মাছ ধরতেও পারি; কাজেই একটা টুইডের স্যুট, আর রাইডিং-স্যুটটাও দিও।

একটা মোটা ওভারকোট দিও। আর যদি বৃষ্টি হয়, ওয়াটার প্রুফটাও।

কিছু গরম কাপড়-চোপড়—যদি ঠাণ্ডা পড়ে, আর কিছু পাতলা জামা কাপড়—যদি গরম পড়ে।

আর দেখো ; যা সব সময় দরকার—এই ধরো, জুতো, বুট জুতো, টুপি, টাই, সার্ট, মোজা, কলার, সেভিং—সেট, টিফিন-কেরিয়ার—এসব তো দেবেই !

এইসব স্যুটকেশে ভর্তি করে ট্যাক্সিতে তুলে দাও কেমন
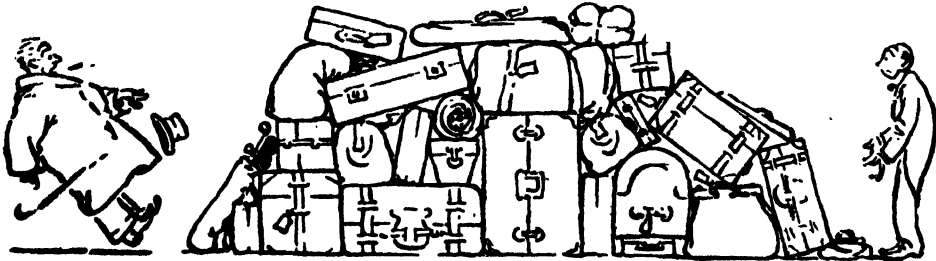
Punch

ডাক্তার—আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো কাটতে হবে।

রোগী—কি ? আমার এপেণ্ডিক্স !!

ডাক্তার—না, না, আপনার মদ্যপানের পরিমাণ।

বাংলার প্রখ্যাত কার্টুন শিল্পী বিনয় বসুর একখানি বিখ্যাত চিত্র।
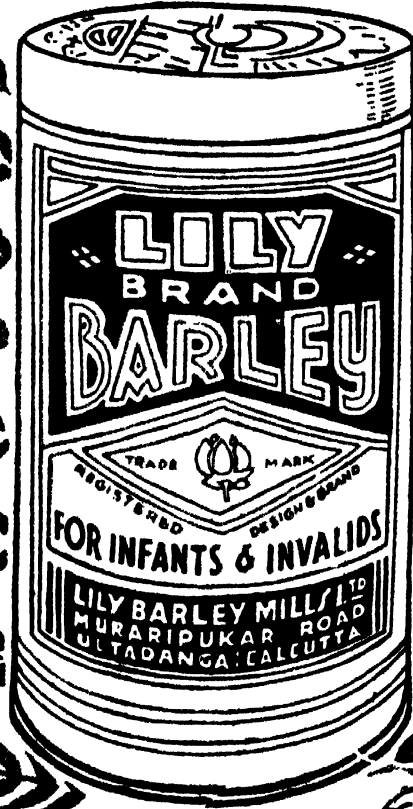
উৎকৃষ্ট
বার্লি
বলিতেই
লিলি
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
REGISTERED DESIGN & BRAND
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LTD
MURARIPUKAR ROAD
ULTADANGA CALCUTTA
সম্পূর্ন বিশুদ্ধ, টাট্‌কা
ও স্বাস্থ্যপ্রদ
সকল বয়সে ও ঋতুতে সমান উপযোগী
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪

PHONE : 55-3294
GALPA-BHARATI Bengali Monthly Regd. No. C3643 Price Re · February 1961

Cover Printed by Commercial Art Printers (Pvt.) Ltd, 43A, Nimtolla Street, Cal-6. Phone : 55-3751